সভ্যতার আগে

কৃষির আবিষ্কার থেকে ইতিহাসের সূচনা পর্যন্ত কাহিনী

শচীন্দ্রনাথ বসু



ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ★

জানুয়ারী ১৯৮০

শচীন্দ্রনাথ বসু

প্রকাশক

ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড

২৫৭-বি, বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০ ০১২

মুদ্রক

শ্রীতপন ধর চৌধুরী

গ্রাফিক আর্ট প্রেস

৩০-ডি, ডায়মণ্ড হারবার রোড

কলিকাতা-৭০০ ০৮০

চিত্রশিল্পী

শচীন্দ্রনাথ বসু

প্রচ্ছদ

গ্রাফিক ডিজাইনার্স

দাম

সুলভ ৩০·০০

লাইব্রেরী ৩৫·০০

লেখকের ভূমিকা

সভ্যতা বলতে কি বোঝায় তার জবাবটা সহজ নয়। শিক্ষা সংস্কৃতি, আচার আচরণ ইত্যাদির থেকে প্রায় অজ্ঞাতসারে আমরা কে সভ্য কে অসভ্য তার বিচার করি, কিন্তু এই বিচারে স্বীয় পরিবেশের প্রভাব পড়ে বলে তা অনেকটা আপেক্ষিক। যে আদিবাসী সমাজ ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে অন্ধসংস্কারের যান্ত্রিক নিয়মে নিয়ন্ত্রিত এবং বহির্জগৎ সম্বন্ধে অজ্ঞ ও উদাসীন তাকে যখন হেয় জ্ঞান করে তারা যারা পর্বতপ্রমাণ মারণাস্ত্র পুঁজি করে চলে তখন কে বেশী সভ্য তা নিয়ে ঈষৎ সন্দেহ জাগতে পারে। কিন্তু এ বইয়ের প্রসঙ্গে আমাদের এই দুরূহ প্রশ্নের মধ্যে যাওয়ার দরকার নেই, কারণ এখানে সভ্যতা প্রায় পারিভাষিক একটি সুবিধাজনক শব্দ মাত্র, তার কোনও নীতিগত তাৎপর্য নেই। এই বিশেষ ঐতিহাসিক অর্থে সভ্যতার সূচনা খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ সহস্রকের মাঝামাঝি লিখিত পাঠ ও স্থায়ী নাগরিক জীবন দিয়ে, সাধারণত তা প্রাগিতিহাস ইতিহাসের সন্ধি স্থল বলেও বিবেচিত। অবশ্য কালের মানচিত্রে এই সীমা সরল রেখা নয়, স্থান ভেদে অনেক আগে পরে ইতিহাসের দলিল সৃষ্টি হয়েছে।

বর্তমান বইয়ের বিষয় প্রধানত প্রাগিতিহাসের অন্তিম অধ্যায়টি, অর্থাৎ নৃবিজ্ঞানীদের নবপ্রস্তর ও ধাতু যুগ, যদিও শেষের দিকে ইতিহাসের উষায় আদিতম সভ্যতাগুলির আভাস দেওয়া হয়েছে। কৃষি ও পশুপালন থেকে আরম্ভ করে এর মধ্যে ঘটেছে গোটা পনেরো আবিষ্কার ও উদ্ভাবন, পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে 'আবিষ্কার ও নিষ্কৃতি' খণ্ডে নবপ্রস্তর যুগ এবং 'ইতিহাসের দরজায়' খণ্ডে ধাতু যুগ ও আদি সভ্য যুগের আলোচনা হয়েছে, কিন্তু এখানেও কোনও অনড় বিভাগীয় রেখা নেই।

নবপ্রস্তর পর্যায়ের আগে পুরাপ্রস্তর যুগে মানুষ সভ্যতার থেকে অনেকটা দূরে ছিল, সেই সুদীর্ঘ প্রাগিতিহাস আমাদের এক ভিন্ন গ্রন্থের বিষয়। তারও আগে বিশ্বের সৃষ্টি থেকে জীব কুলের ক্রমবিকাশের কাহিনী আছে 'মানুষের আগে' বইতে। প্রায় ২০ বছর আগে প্রকাশিত আমার বই 'প্রাগিতিহাসের মানুষ' বিশ্ব ও প্রাণ সৃষ্টি থেকে আরম্ভ করে সভ্যতার সূচনা পর্যন্ত ইতিবৃত্ত ; বইখানি সমাদর

পেয়েছিল, তা ছাড়া সাম্প্রতিক কালে পুরাতত্ত্বে দ্রুত আবিষ্কার ঘটছে এবং তার সঙ্গে এ সম্বন্ধে দেশে দেশে সাধারণের কৌতূহল বাড়ছে, তাই সে বইয়ের তিনটি অংশ এখন পৃথক, পরিমার্জিত ও পরিবর্তিত গ্রন্থ রূপে দেখা দিচ্ছে। এগুলিতে গত দুই দশকে উদঘাটিত নতুন তথ্য ছাড়া আছে বিভিন্ন বিষয়ের আরও বিস্তারিত আলোচনা। 'সভ্যতার আগে' প্রাক্তন পুস্তকটির তৃতীয় অংশের পরিবর্ধিত ও সম্মার্জিত সংস্করণ। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে তিনটি বই মিলে এক ধারাবাহিক কাহিনী হলেও তারা প্রত্যেকে স্বসম্পূর্ণ রূপে রচিত, আলাদা পড়লেও উপভোগের ব্যাঘাত হবে না।

ভাষা সম্বন্ধে দু এক কথা বলা দরকার। বাংলা বানান বহুরূপী, সরল বানান গ্রহণ করে সে ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য আনতে চেষ্টা করেছি। বিদেশী স্থান ও ব্যক্তির নাম ও অন্যান্য শব্দের তদ্দেশীয় উচ্চারণের দিকে যথাসম্ভব লক্ষ্য রাখা ও সাধারণত যুক্তাক্ষর বর্জন করা হয়েছে; পরিবর্তে প্রথম উল্লেখে হসন্ত ব্যবহার করেছি, ভুল উচ্চারণের আশঙ্কা না থাকলে (যেমন স্বল্পপরিচিত শব্দে) পরে হসন্ত বর্জিত হয়েছে। ক্ষেত্র বিশেষে রোমীয় হরফে শব্দটি আছে। জ-র উচ্চারণ ইংরেজি z-এর মত বুঝতে হবে। পারিভাষিক শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ বইয়ের শেষে সন্নিবিষ্ট হল।

পরিশেষে ঋণস্বীকৃতি। ফরাসী ছাড়া অনেকগুলি বিদেশী নামের উচ্চারণ জানিয়ে আমার পরম উপকার করেছেন বম্বে থেকে ভাবা পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রের ভাষাবিৎ শ্রী সুমিত গুহঠাকুরতা, বার বার পত্রাঘাতেও তাঁকে বিরক্ত করতে পারি নি। কিন্তু উচ্চারণে ভুল ভ্রান্তি থাকলে সম্ভবত আমিই দায়ী, কারণ কিছু কিছু অন্যত্র থেকে সংগৃহীত। 'পৌরাণিকা' গ্রন্থের রচয়িতা শ্রীঅমল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের থেকে পেয়েছি কতগুলি ফসলের বাংলা নাম, তাঁর কাছেও আমি কৃতজ্ঞ।

জানুয়ারি ১৯৮৩

"Will they not produce corn, and wine, and clothes, and shoes, and build houses for themselves ?...They will feed on barley and wheat, baking the wheat and kneading the flour, making noble puddings and loaves......And they and their children will feast, drinking the wine which they have made, wearing garlands on their heads, and having the praises of the gods on their lips."

Plato

লেখকের অন্যান্য বই

বিজ্ঞান

প্রাগিতিহাসের মানুষ (রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত)

বিশ্ব বিচিত্র

মানুষের আগে

ভ্রমণ

সব হারানোর দেশে

দেশান্তরী

রম্য রচনা

মিহি ও মোটা

গল্প ও উপন্যাস

নতুন ঠিকানা

সাত সমুদ্র

সীতার স্বয়ংবর

মায়াপুরী

শনিবারের সন্ধ্যায়

কয়েকটি ঋতু

জীবনী

Jagadis Chandra Bose

প্রথম পর্ব

আবিষ্কার ও নিষ্কৃতি

১। আগের কথা

কথায় বলে মানুষ চেনা দায়। নৃবিজ্ঞানীদেরও তা এক মস্ত সমস্যা, কবে কোথায় মানুষের জন্ম কোন বনমানুষ ও হমিনিডের বংশ পরম্পরায় তার ধরায় আগমন তা নিয়ে আজ তাঁদের তর্ক বিতর্কের অন্ত নেই। তবে অধিকাংশের মতে তার জন্ম ক্ষেত্র আফ্রিকা, জন্ম তারিখটা নতুন আবিষ্কারের সঙ্গে ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছে—প্রায় ৩৫ লক্ষ বছর প্রাচীন অস্থিকে মানুষেরই দেহাংশ বলে দাবি করা হয়েছে, যদিও অন্যরা বলেন তা অস্ট্রালোপিথেকাস জাতীয় অমানুষের। সমস্যার বড় কারণ ফসিলের স্বল্পতা। সবচেয়ে প্রাচীন যাকে বিশেষজ্ঞরা নিঃসন্দেহে মানুষ বলে জানেন তার নাম হোমো ইরেক্টাস, আজ থেকে অন্তত ১৫ লক্ষ বছর আগে তার আবির্ভাব। যাই হক, বিশ্বের বয়স যদি হয় ১৫০০ কোটি বছর, পৃথিবীর সৃষ্টি আজ থেকে ৪৬০ কোটি বছর আগে এবং প্রাণের আবির্ভাব তার ১০০ কোটি বছরের মধ্যে, তো তার তুলনায় মানুষের অস্তিত্ব নিমেষ মাত্র।

হাজার দশেক বছর আগে পর্যন্ত দীর্ঘ পুরাপ্রস্তর ও হ্রস্ব মধ্যপ্রস্তর যুগে মানুষ বেশী দূর এগোতে পারে নি। জন্মাবধি প্রাণীমাত্রেরই প্রধান চিন্তা অন্ন চিন্তা, খাদ্য সংগ্রহের নিরন্তর সংগ্রামে এই বহু লক্ষ বছর মানুষ বিশ্রাম পায় নি মোটেই, পাথরের অস্ত্র বানিয়ে পশু শিকার ও ফল মূলের সন্ধানে প্রত্যহ বল কৌশলের পরীক্ষা দিতে হয়েছে। মাত্র কয়েক হাজার বছর আগে পর্যন্ত যে মানুষের চিত্রটি মনে জাগে সে নিয়ত সন্ধানী যাযাবর, নিয়ত সংগ্রামী ভাগ্যের সঙ্গে। আহারের পরেই আশ্রয়, সে ক্ষেত্রে শেষের দিকে সে আর প্রাকৃতিক গুহা গহ্বরের উপর নির্ভর করে থাকে নি, কিন্তু মাটির নিচে বা উপরে অস্থায়ী আস্তানা যা বানিয়েছে তাকে ঠিক ঘর বলা চলে না। প্রধানত শীত নিবারণে যখন সে পরিধান ধারণ করল তখন শুধু পশুর চামড়া বা গাছের বাকল দিয়ে গা জড়িয়েছে। একমাত্র আগুন জ্বালতে শিখেই অনেকটা সহজ হয়েছে মানুষের জীবন, সাড়ে সাত লাখ বছর দূর অতীতের

তমসাবৃত গহ্বরে সেই জ্বলন্ত নিশানার লোহিতাভ কম্প্র আলো আমরা দেখতে পাই। এই গুরুতর আবিষ্কারটি হোমো ইরেকটাসের, তখন কাঁচা মাংসের বদলে তা ঝলসে খেয়েছে সে, কঠিন শীতে গা গরম করতে পেরেছে।

দীর্ঘ কাল পরে তার দিন ফুরাল, প্রায় লক্ষ বছর আগে দেখা দিয়েছে আরও মেধাবী নেআন্ডার্টাল মানব, য়োরোপীয় তুষার যুগের নিদারুণ শীতে টিকে থাকাই যার এক মস্ত কীর্তি। সে যে প্রিয় জনের শব দেহ সযত্নে কবর দিয়েছে এই আবিষ্কারে মানুষের আধ্যাত্মিক প্রগতিরও পরিচয় পাই আমরা। তার পর মাত্র সে দিন হাজার চল্লিশ বছর আগে এল ক্রোমানীয় মানব, ওরফে আজকের খাঁটি হোমো সেপিয়েন্স। আফ্রিকা, এশিয়া ও য়োরোপের সীমা ছাড়িয়ে তখন মানুষ পা দিল অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকা মহাদেশের নির্জন ভূমিতে। তুষার যুগের বরফ যখন গলতে আরম্ভ করেছে তখন য়োরোপে এবং অন্য কোথাও কোথাও পুরাপ্রস্তর যুগের শেষে এসেছে মধ্যপ্রস্তর যুগ, সে সময়ে শিকার আরও সহজ হয়েছে ধনুর্বাণ ও সূক্ষ্ম শিলা খণ্ডের তৈরি বিবিধ অস্ত্রের উদভাবনে।

আদি কাল থেকেই মানুষের ভাবের জগৎ তার ধ্যান ধারণাও স্বভাবত গড়ে উঠেছে নিরন্তর জীবন সংগ্রামের প্রভাবে, প্রতিকূল প্রকৃতির আওতায় নিজের ঠাঁই বজায় রাখতে তার মনে উঁকি দিয়েছে ভাল মন্দ নানা অদৃশ্য অলৌকিক শক্তি—তার থেকে যাদু ও আচার অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু আহার অন্বেষণ ও জীবন ধারণের অব্যবহিত সমস্যা বহু কাল তার মন জুড়ে থাকলেও কোনও মতে বেঁচে থাকতেই যে মানুষ পৃথিবীতে আসে নি তার ইঙ্গিতও মাঝে মাঝে দেখা যায়, বিশেষ করে খাঁটি মানুষের স্পষ্ট আবির্ভাবের সঙ্গে, যেমন প্রায় অজ্ঞাতসারে মহান চিত্র সৃষ্টিতে। পুরাপ্রস্তর যুগের এই শেষ পর্বে এবং মধ্যপ্রস্তর যুগে মানুষের বাঁচার আনন্দ লীলায়িত হয়েছে দেহ সজ্জায়, প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্তুর আকাঙ্ক্ষায়, অথবা প্রয়োজনের বস্তুতে সৌন্দর্যের ছোঁয়ায়। এই সন্ধি ক্ষণে মানুষকে দেখলে মনে হয় যেন অনেক সম্ভাবনা আছে তার মধ্যে, শুধু সুযোগের অপেক্ষা। সেই সুযোগ এর পর দেখতে দেখতে এসে গেল। হাজার দশ বছর আগে আরম্ভ হয়ে এই নবপ্রস্তর বিপ্লব কি ভাবে দ্রুত সভ্যতার বনিয়াদ গড়ে তুলেছে তাই আমাদের কাহিনী।

২। সংগ্রাহক থেকে উৎপাদক

অন্যান্য প্রাণীর মত মানুষেরও বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধির সঙ্গে খাদ্যের প্রাপ্তি ও পর্যাপ্তির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক চির দিন লক্ষিত হয়েছে। কৃষি আবিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত এ সমস্যার কোন স্থায়ী সমাধান হয় নি, দিন আনি দিন খাই করে ক্রমাগত অন্ন চিন্তায় এই ধরায় তার অস্তিত্বের ৯৯ শতাংশের বেশী কাল কেটেছে মানুষের। এর মধ্যে প্রকৃতি যখন সদয় হয়েছে তখন অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত মনে সে অন্য দিকে দৃষ্টি দিয়েছে, যেমন জলে অপর্যাপ্ত মাছ, স্থলে সহজলভ্য শিকার পেয়ে য়োরোপে মাদলেনীয় সমাজের সংগ্রাহক মানুষ বসন ভূষণ প্রসাধনে দেহ সাজিয়েছে, নানা ধারায় নানা উপাদানে আশ্চর্য শিল্প সৃষ্টি করেছে। কিন্তু প্রকৃতি চির দিনই খেয়ালী, অবস্থার বদলে একদা তারাও নিখোঁজ হয়ে গেল—হয়তো ভাগ্যে পাওয়া ভক্ষ্য ফুরিয়ে গিয়েছিল, যাদুকরের তুকতাক বশীকরণে শিকার বাড়ানো সম্ভব হল না।

ইতিহাসের অন্তহীন পথে মানুষের মিছিল নবপ্রস্তর যুগের চৌকাঠ পার হল তখন যখন খাদ্য সংগ্রহের উপর পূর্ণ নির্ভরতা ত্যাগ করে সে উৎপাদন শুরু করল। অবশ্য শিকার ও সংগ্রহ আরও অনেক দিন পাশাপাশি চলেছে, কিন্তু আবহমান কাল যে ছিল ভাগ্যের পুতুল সে এ বার খাদ্যস্রষ্টা রূপে হঠাৎ প্রকৃতির উপর অনেকখানি কর্তৃত্ব লাভ করলে। মানুষ যদি খাদ্য সংগ্রাহক থেকে উৎপাদক না হতে পারত তা হলে আজও পৃথিবীতে প্রায় বিরল প্রাণীর পর্যায়ে বেঁচে থাকত, জগতের বিভিন্ন সংগ্রাহক আদিবাসীদের সংখ্যার দিকে তাকালেই তা বোঝা যায়। এক স্থূল হিসাব অনুসারে আজ যদি আমাদের শিকার ও স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ খাদ্যে ফিরে যেতে হয় তবে দেড় হাজারে এক জনেরও কম বাঁচবে। আর এক হিসাবে উৎপাদনের আগে খাদ্যসন্ধানীদের পেট ভরাতে জনপ্রতি দরকার ছিল প্রায় ২৬০০ হেক্‌টেআর, আর আদি কালের চাষবাসী গ্রামে মাত্র ১০ হেকটেআরের মত (এক হেকটেআর প্রায় আড়াই একার)।

খেতভরা ফসলের মত পালিত পশুও আহার্য যুগিয়েছে। সুতরাং আশ্চর্য নয়

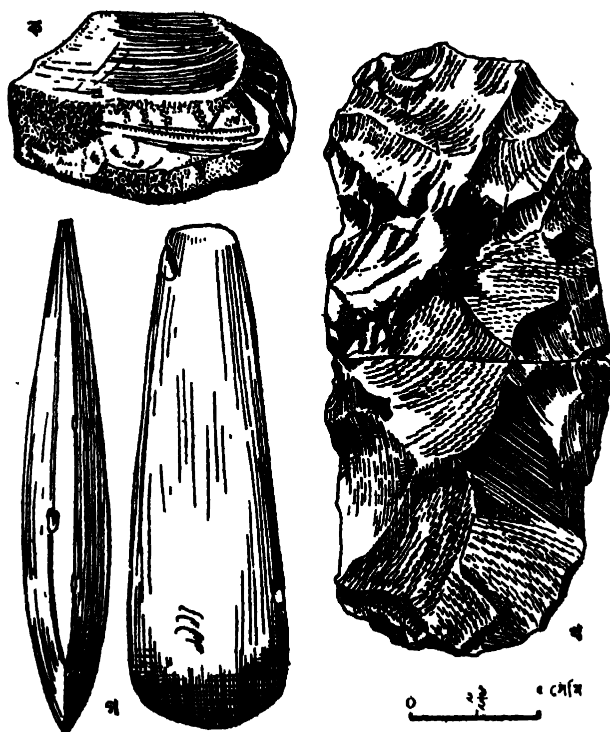
যে এই বিপ্লবে মান্ধাতা আমলের ঢিমে তেতালা গরুর গাড়িটায় হঠাৎ কে যেন জুতে দিল পক্ষীরাজ ঘোড়া, দেখতে দেখতে মানুষের সংখ্যা ও আয়ু বেড়ে চলল. ঘরে ঘরে পরিবার হল স্ফীত ; কঙ্কাল ও কবরে তার সাক্ষ্য থেকে এক নৃবিজ্ঞানীর গণনায় কৃষি বিপ্লবের পর অল্প সময়ে পৃথিবীতে মানুষ প্রায় ১৫ গুণ বেড়েছে। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে এই গ্রহের গায়ে যে প্রাণীটি ছিল বিরল, শুধু বুদ্ধিতে নয় সংখ্যার জোরেও সে পেল প্রাধান্য।

কিন্তু কেবল অন্ন সমস্যার সমাধানে নয়, উদ্ভিদ ও পশু বশ করে মাত্র নয়, আরও নানা ক্ষেত্রে বহুবিধ মৌলিক আবিষ্কারের দরজাগুলি খুলে গেল একের পর এক, ফলে বৃহত্তর জটিলতর সমাজের প্রয়োজনে শাসন ব্যবস্থা, বাণিজ্য, দেশে দেশে যোগাযোগ ইত্যাদি গড়ে উঠে ভিত স্থাপন করল সভ্য যুগের। বহু লক্ষ বছরের আঁধার পটভূমির সামনে মাত্র হাজার পাঁচেক বছরের মধ্যে মানুষ একের পর এক জ্বেলেছে উজ্জ্বল আবিষ্কারের আলো—কৃষি, পশুপালন, মৃৎপাত্র বস্ত্র, স্থাপত্য. ধাতু শিল্প, চাকা, কুমোরের চাক, যান বাহনে পশুর নিয়োগ. নৌকার পাল, সেচ, হাল, সৌর বর্ষপঞ্জী, সীলমোহর, লিপি। বস্তুত বলা চলে নবপ্রস্তর ও ধাতুপ্রস্তর যুগের তুলনায় পরবর্তী বহু শতাব্দীর দান নগণ্য, খ্রীষ্টপূর্ব ঐতিহাসিক যুগে এমন কি আধুনিক সভ্য যুগেও ১৬শ শতকে গ্যালিলিওর কাল কি তারও পরে শিল্প-বিপ্লব পর্যন্ত এত দ্রুত বা গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার আর দেখা যায় নি। সুতরাং নব নব বিদ্যা ও ক্ষমতা অর্জনের ফলে পৃথিবীতে মানুষের আধিপত্য দৃঢ় হল।

*

নবপ্রস্তর নামটির তাৎপর্য কি? নামটি এসেছে নতুন এক ধরনের পাথুরে কুড়াল থেকে, নতুনত্ব ধার দেওয়ার পদ্ধতিতে। মানুষের তৈরি একেবারে প্রথম উপকরণ সম্ভবত কুড়াল জাতীয় বস্তু, পুরাপ্রস্তর যুগে অবশ্য তার গায়ে হাতল ছিল না এবং তার মুখ তৈরি হত পাথরের গায়ে ঘা মেরে পাত খসিয়ে। মধ্যপ্রস্তর যুগে কুড়ালের সঙ্গে হাতল যুক্ত হল, আর নবপ্রস্তর যুগে চলতি হল ঘষে ধার দেওয়ার কৌশল। তখন সূক্ষ্ম-দানাযুক্ত পাথরের পাত বা নুড়ির এক দিক ঘষে তীক্ষ্ণ করে তার সঙ্গে কাঠের লাঠি বা হরিণের শিং জুড়ে তৈরি হয়েছে কুড়াল কিংবা বাইস। পাথরের ফলায় এই প্রখরতা আনবার বিশিষ্ট প্রথা অনুসারে প্রথমে পাত খসিয়ে রুক্ষ মাথাটি বানিয়ে পরে আর একটি ভিজে পাথরের গায়ে ঘষে পালিশ ও

ধার আনা হত। এর ফলে কুড়ালের কার্যকারিতা অনেক বাড়ল, কয়েক ঘাতেই তা আর ভোঁতা হয়ে যায় না, সহজে টুকরে খসে না—কঠিন, সহনশীল যন্ত্র তা তখন। গাছ কাটতে, কেটে কাঠের খণ্ডে বিভিন্ন রূপ দিতে এই কুড়াল ও বাইসের মত সম্বল ছিল বলেই পরে ঘর বাড়ি, তক্তার নৌকা, চাকা, লাঙল ইত্যাদি বানানো সম্ভব হয়েছে।



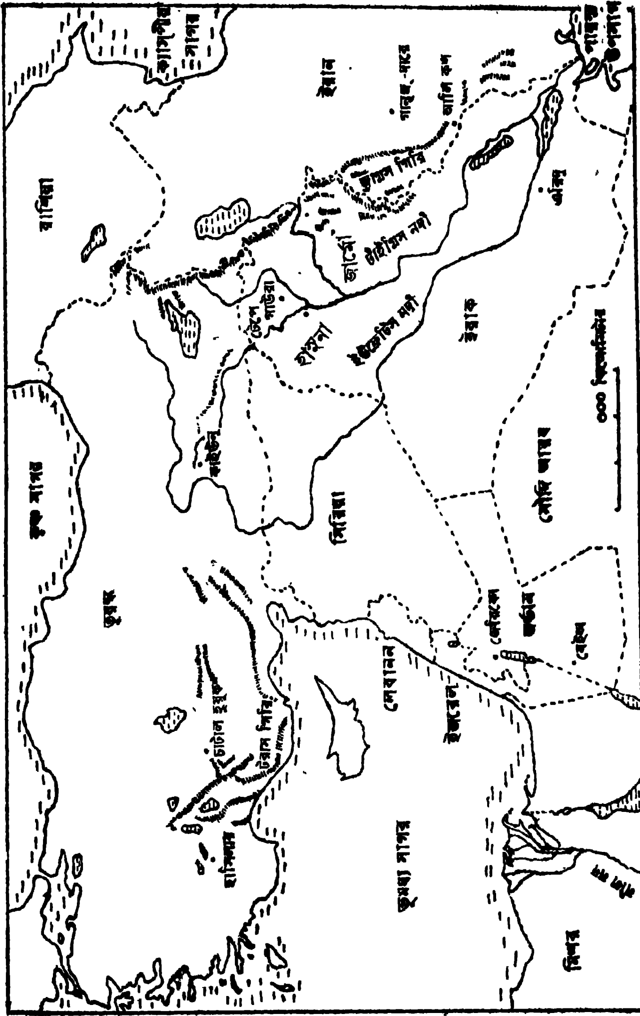
চিত্র ১। ক—কুড়ালের মাথা ঘষে পালিশ করবার পাথর। খ—কুড়াল বানাবার উদ্দেশ্যে পাথর থেকে পাত খসাতে গিয়ে এই খণ্ডটি ভেঙে গিয়েছে। গ—পালিশ করা কুড়ালের মাথা।

সে যুগের জীবন নিয়ে এ যুগে পরীক্ষা হয়েছে কোনও কোনও দেশে। ১৯৬৩ সালে রাশিয়াতে সাইবেরিয়ার দুরধিগম অঞ্চলে গিয়ে এক দল ছাত্র 'প্রস্তর

যুগে' বাস করছিল। তারা দুটি কাঠি ঘষে আগুন জ্বেলেছে, পাথর থেকে হাতিয়ার বানিয়ে বন্য পশু শিকার করেছে। পাথুরে কুড়াল দিয়ে ৪0 সেনটিমিটার মোটা এক পাইন গাছ কেটে ফেলতে লাগল আধ ঘণ্টা, ১0 জনে মিলে চাষের জন্য জঙ্গল সাফ করতে চার দিন। ঐ সব আদিকালীন যন্ত্র দিয়েই তারা গাছের গুঁড়ি থেকে বাস ঘর, শালতি, ভেলা ইত্যাদিও বানিয়েছে। ডেনমার্কে এক পরীক্ষায় এক শো'রও বেশী বার্চ গাছ কাটা হয়েছে একটি মাত্র কুড়াল দিয়ে যার গায়ে ৪000 বছরে ধার পড়ে নি। বন পরিষ্কার করতে এই সব হাতিয়ার এত দরকার হয়ে পড়েছিল সে কালে যে ক্রমে কোথাও কোথাও তা নিয়ে বেশ শিল্প ও বাণিজ্য গড়ে উঠেছিল, নানা জায়গায় খনির থেকে চকমকি তোলা হত। কোথাকার পাথর কোথায় গিয়েছে তা দেখে সে দিনের বাণিজ্য পথ ও যোগাযোগ সম্বন্ধে জানা যায়।

ঘষা কুড়াল নবপ্রস্তর যুগের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলেও তাকে সম্পূর্ণ এই যুগের দান বলে দাবি করা চলে না। উত্তর য়োরোপের বনে মধ্যপ্রস্তর মানুষ কোথাও কোথাও কৃষি বা পশুপালনের আগেই কাঠ কাটতে ঘষা পাথরের ফলা হাতলের সঙ্গে জুড়েছে। তবু এই যন্ত্রটির সম্মানেই এই যুগের নামকরণ এবং সম্পূর্ণ যথার্থ না হলেও তা টিকে গিয়েছে। সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য অনুসারে নাম দিতে গেলে বলা উচিত কৃষি ও পশুপালন যুগ, কিন্তু তার পরেও বোধহয় মৃৎপাত্র যুগ বেশী উপযুক্ত নবপ্রস্তর নামটির তুলনায়।

লিপির আবিষ্কার ও লিখিত পাঠের ব্যবহার থেকে প্রকৃত ইতিহাসের সূচনা এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকার সংগম স্থলে মধ্যপ্রাচ্যে, সেই একই অর্ধশুষ্ক ক্ষেত্র নবপ্রস্তর বিপ্লবের জন্ম ভূমি। দক্ষিণ ইরান থেকে পার্বত্য অঞ্চলের এক বঙ্কিম-চন্দ্রাকার উর্বর অর্ধবৃত্ত (fertile crescent) ইরাক ও সিরিয়ার উত্তরাংশ ঘিরে নেমে এসেছে মিশরে নীল নদের উপত্যকা পর্যন্ত। জনহীন বিশাল আরব্য মরু প্রান্তরের উত্তর উপান্তে এই অর্ধবৃত্তে ইরাকের জাগ্রস ও তুরস্কের টরাস গিরিমালার সংলগ্ন পাদপর্বতে তখন মানুষের বাস ছিল, আর ছিল পাহাড়ের ঢালু গায়ে স্থানে স্থানে বুনো গম ও যবের প্রাচুর্য—সেখানে এখনও ফলে এই বন্য তৃণ। এদের নিয়েই চাষ শুরু হয় আজ থেকে প্রায় ১0,000 বছর আগে। উত্তর-পূর্ব ইরাকে জাগ্রসের নিম্নাংশে জলবায়ু কয়েক হাজার বছর আগেও প্রায় আজকের মতই ছিল—বৃষ্টি সাধারণত কৃষির পক্ষে যথেষ্ট, কিন্তু এত বেশী নয় এবং মাটি এত গভীর নয় যে সবটা



চিত্র ২। নবপ্রস্তর বিপ্লবের জন্ম ক্ষেত্র মধ্যপ্রাচ্য ও কয়েকটি প্রসিদ্ধ ঘাঁটি।

জমি ঘন বনে ছেয়ে যাবে। শুধু মাঠের শস্য নয়, ছাগল ভেড়া গরু শুয়োর একই ক্ষেত্রে উপস্থিত রেখে প্রকৃতি যেন এই বিপ্লবের পথ তৈরি করে রেখেছিল। তার শ্যামল আঁচলে তখনও মানুষের হাত পড়ে নি, পাহাড়ের গায়ে ঢেউখেলানো উর্বর প্রান্তরে এখানে ওখানে ছোট ছোট খণ্ডে বুনো শস্যের মেলা কাঁচা সবুজ আর

সোনালি নকশা বুনেছে, দূরে দূরে দু চারটি গাছ, মাঝে মাঝে বিচরণরত পশু, জঙ্গল নেই যে চাষের জন্য কেটে সাফ করতে হবে। কিছুটা পশ্চিমে ইরাকের বুক চিরে মোটামুটি উত্তর দক্ষিণে বয়ে গিয়েছে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদী, তাদের উপত্যকায় পলির প্রান্তর। জোড়া নদীর মধ্যবর্তী এই উর্বর ফালিটুকু বাইবেল-বর্ণিত প্রাবাদিক ইডেন কানন, অন্য নাম মেসোপটেমিয়া (গ্রীসীয় ভাষায় দুই নদীর অন্তর্বেদি দেশ), এই স্রোতস্বিনীদের কাছাকাছি বহু জনপদ গড়ে উঠে ইতিহাসের প্রাথমিক শহর সৃষ্টি হয়েছে।

পশ্চিম এশিয়ার উর্বর অর্ধবৃত্তে প্রত্নবিজ্ঞানীরা আজ থেকে অন্তত ৯০০০ বছর অতীতে কৃষির ইঙ্গিত পেয়েছেন। সেখানে একদা যাযাবর মানুষের দল দেখল পার্বত্য প্রান্তরে প্রাকৃতিক শস্য তৃণের সম্ভার, তাদের দানাগুলি পুষ্টিতে ভরা, সংগ্রহের অপেক্ষা শুধু, দেখে নিশ্চয় লোভ জেগেছিল ঘর বাঁধতে। তার পর ঠিক কি করে তারা এই সংগ্রহ থেকে উৎপাদনে উত্তীর্ণ হল, উদ্ভিদ প্রজননের রহস্য শিখল তা হয়তো কোনও দিনই নিশ্চিত জানা যাবে না। এই আবিষ্কার প্রধানত আকস্মিক, না মানুষেরই তীক্ষ্ণ নজর বা বুদ্ধির ফল তা নিয়ে জল্পনার অভাব হয় নি, কিন্তু সম্ভাব্য কাহিনী গড়ে তুলতে এ সম্বন্ধে ধরা ছোঁয়ার যোগ্য চিহ্ন কি উদ্ধার হয়েছে তা আগে পরীক্ষা করে দেখা দরকার।

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের রবার্ট ব্রেইডউড উত্তর-পূর্ব ইরাকের জার্মো গ্রামের মাটি খুঁড়ে অর্ধদগ্ধ গম ও যব পেয়েছেন, তাদের তেজস্ক্রিয় কারবন মেপে জানা যায় দানাগুলি ৯০০০ বছর প্রাচীন। রান্নার সময়ে ঘরের নিচু খড়ের চালে হয়তো আগুন লেগে সে কালে কুটিরটি প্রায়ই পুড়ে গিয়েছে তখন কখনও কখনও মেঝেতে রাখা বা পাত্রে জমানো শস্য এমন ভাবে ঢাকা পড়েছে যে অক্সিজেনের সংস্পর্শ বাঁচিয়ে তপ্ত হয়েছে তা, ফলে ছাই না হয়ে আধপোড়া হয়ে থেকেছে, হাজার হাজার বছরেও পচে নষ্ট হয় নি। তা ছাড়া হয়তো মেঝেতে যে সব শস্যের দানা পড়েছে, মাঝে মাঝে ঝাঁট দিয়ে মেয়েরা তা অন্যান্য জঞ্জালের সঙ্গে রান্নার শেষে চুলায় ফেলেছে, সেখানে ধিকি ধিকি জ্বলন্ত ছাইয়ে দানাগুলির উপরটা পুড়ে গিয়েছে। সে কালের দানার শক্ত খোসাও এ কালের পুরাবিজ্ঞানীর সহায় হয়েছে। গরম করলে এই আবরণ ঢিলে হত, কখনও বা অযত্নে কাজটা বেশী দূর গড়িয়ে দানা কালো হয়ে গিয়েছে, রাঁধুনী তা বর্জন করেছে তখন। জার্মো গ্রামের

সঙ্গে পরে আমাদের আরও বিস্তৃত পরিচয় হবে।

আসল বস্তুর বদলে তাদের ছাপও কখনও কোথাও থেকে গিয়েছে। বাড়ি বানাতে মাটির সঙ্গে খড় মিশিয়েছে জার্মোর মত গ্রামবাসীরা, তার সঙ্গে কিছু কিছু বীজের পরিষ্কার ছাপ গেঁথে গিয়েছে সেই মাটিতে। প্রাথমিক রুক্ষ মৃৎপাত্র গড়তেও প্রায়ই কাদার সঙ্গে খড় মেশানো হত, তা আঠার কাজ করেছে এবং পাত্রটি বানিয়ে রোদে শুকাবার সময়ে ফাটল দেখা দিত না, আগুনে পোড়াবার পর সেই শক্ত মাটিতে পোড়া গমের ছাপও বহু সহস্র বছরের মত পাকা হয়ে গিয়েছে। আরও পরোক্ষ নজির রেখে গিয়েছে এই সব তৃণের ডাঁটার ও পাতার সংলগ্ন সিলিকা, মিহি গুঁড়ো কাচের মত এই বস্তুটি উদ্ভিদের ঐ সব অংশে জমে (ঘাসের পাতার পাশে ঘষা লেগে তাই আঙুল কাটতে পারে)। উদ্ভিদ পচে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার অনেক কাল পরেও এই অক্ষয় কাচের সূক্ষ্ম চিকন কাঠামোটি অণুবীক্ষণে পরীক্ষা করে গাছটিকে চেনা যায়, একদা তার কোন অংশে তা জমেছিল তাও জানা যায়। এই সিলিকা আরও এক দিকে অনুসন্ধানীদের পথ দেখিয়েছে, তার ঘষায় পাথর পর্যন্ত ক্ষয়ে চকচকে হয়ে ওঠে, চকমকির ফলা বা অন্য কোনও ধারালো শিলা যন্ত্রে সেই চিহ্ন দেখলে তাঁরা বুঝতে পারেন সেগুলি দিয়ে শস্য কাটা হয়েছে, মাংস বা চামড়া নয়।

সে কালের মানুষের ঘরে গম, গমের ছাপ বা কাস্তে পেয়ে না হয় বোঝা গেল তারা এই শস্য কেটে এনে খেয়েছে, কিন্তু তা যে তারা চাষ করেছে তার প্রমাণ কি ? বুনো গমের দুটি জাত ছিল এমার ও আইনকর্ন, তারা এখনও সেখানে বর্তমান, আজকের সভ্য গম তাদেরই বংশধর। বন্য ও এই কৃষিজাত গমের আয়তন, আকৃতি ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের ছোট খাটো পার্থক্য তাদের চিনিয়েছে। তা ছাড়া আর একটি প্রভেদ কৃষির জন্ম প্রসঙ্গে অতীব গুরুতর ; বন্য গম পাকলে তাদের শস্যাধার-গুলি শিষ থেকে সহজে খসে পড়ে, সেটা প্রজাতির (species) বিস্তৃতির অনুকূল, বাতাসে চতুর্দিকে ছড়িয়ে তারা নতুন চারার জন্ম দেবে। পক্ষান্তরে এই শিথিল দানা গমখাদক মানুষের পক্ষে প্রতিকূল, শস্য সংগ্রহ করতে গিয়ে তারা দেখে অধিকাংশ ঝরে গিয়েছে, অবশিষ্ট যা আছে তাও কাস্তে ছোঁয়ালেই খসে পড়ছে। কিন্তু মানুষ ও উদ্ভিদ দুইয়েরই সুবিধার ব্যবস্থা রেখেছিল প্রকৃতি, অধিকাংশ বন্য প্রজাতির মধ্যে বংশকণিকার (gene) পার্থক্য হেতু কিছু প্রকার ভেদ দেখা যায়,

গমেরও ছিল। বিস্তীর্ণ ঢিলে দানার শস্য তৃণের সঙ্গে এমন কিছু কিছু ছিল বংশগত বৈশিষ্ট্য অনুসারে যাদের দানার বোঁটা শিষের সঙ্গে শক্ত হয়ে জোড়া ; তাই তাদের বংশধর অল্প ও বিস্তার কম, কিন্তু মানুষের পক্ষে এই গম সংগ্রহ করা অনেক সহজ। কৃষিজাত গম এদেরই বংশজাত—সেটা কি করে সম্ভব হল ?

চির কাল মেয়েরাই মাঠ বন থেকে বীজ বাদাম মূল ইত্যাদি আহার্য সংগ্রহ করেছে, সে দিনও অবশ্য যা পেয়েছে তা দিয়েই ডালা ভরেছে তারা, কিন্তু উপরোক্ত কারণে দ্বিতীয় দলীয় অল্পসংখ্যক চারার অনুপাতে তার ফসল সংগৃহীত হয়েছে বেশী। ঋতুর শেষ দিকে প্রথম দলের গম যখন প্রায় সব ঝরে গিয়েছে তখন দূরে দূরে খুঁজে অনুসন্ধানীরা যা ঘরে আনত তার প্রায় সবটাই শক্ত বোঁটার গম। গ্রামের কাছাকাছি শস্যের কিছু কিছু ঝরে পড়েছে সহজ বৃদ্ধির উপযুক্ত ঘাসবিহীন খোলা মাটিতে—পায়ে চলার পথ, আঁস্তাকুড়, পায়খানা, ভেঙে-পড়া মাটির বাড়ি ইত্যাদি। সুতরাং পরবর্তী ঋতুতে এই সব বীজ অঙ্কুরিত হয়ে যখন চারা গজিয়েছে তখন দূরাঞ্চলের স্বাভাবিক ক্ষেত্রের তুলনায় তাদের মধ্যে শক্ত বোঁটার জাতটা অনেক বেশী দেখা গেল। আগে যারা কাস্তে হাতে পাহাড়ে চড়ে দেখেছে সারি সারি নেড়া গাছ, সোনার ফসল সব উড়ে গিয়েছে, এখন ঘরের কাছে আকাঙ্ক্ষিত বস্তুটি দেখে তারা নিশ্চয় অবাক হয়েছে। আগে ব্যর্থ সংগ্রাহকরা তাদের দেব দেবীর কাছে প্রার্থনা করেছে এমন গম যা পালিয়ে যায় না, সেই জিনিসটি পেয়ে প্রার্থনা ও আরাধনার পরিপূরণে তা দেবতার বর বলেই জেনেছে।

গমের এই আংশিক বশীকরণ বা পালন ঘটল মানুষের অজানতে, সুতরাং তাকে ঠিক কৃষি বলা যায় না। পশ্চিম এশিয়ার নানা জায়গায় ৯000 বছর আগেই এই আংশিক আয়ত্ত দেখা গিয়েছে, যদিও গম-সংগ্রাহকদের যে সব ঘাঁটিতে বারিপাত, মাটি ও অন্যান্য অবস্থা অনুকূল ছিল না অথবা গ্রামটি যেখানে বেশী দিন টেকে নি সেখানে তা সম্ভব হয় নি।

আংশিক থেকে পূর্ণ আয়ত্ত অর্থাৎ খাঁটি কৃষিতে উত্তরণের গুরুতর পদক্ষেপটি কি করে ঘটল তা নিয়ে নানা রকম জল্পনা সম্ভব। বীজ থেকে সবুজ উদ্ভিদ যে নতুন করে দেখা দেয় তা মানুষ হয়তো আগেই অস্পষ্ট সন্দেহ করেছে, যেমন জমানো গম বৃষ্টিতে ভিজে গেলে তার থেকে অঙ্কুর উদ্‌গম হয় দেখে। কিন্তু এই সন্দেহের প্রত্যক্ষ পরীক্ষা করে লব্ধ জ্ঞান কাজে লাগানো হয় নি। বরং সহজে

সংগ্রহযোগ্য গম যখন ঘরের কাছেই বেড়ে গেল তখন গ্রামবাসীদের মনে দেব দেবীর প্রতি ভক্তিই সম্ভবত বেড়েছে, উর্বরতার প্রতীক যে জননী দেবীর মূর্তি গড়েছে মানুষ পুরাপ্রস্তর কাল থেকে তার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা পূজা উৎসর্গ এবং ওঝা পুরুতদের বুদ্ধি নেওয়া ইত্যাদিতে ব্যস্ত হয়েছে তারা। সুতরাং মনে হয় সম্পূর্ণ কৃষিতে পৌঁছাতে আবার কিছু আকস্মিক অবস্থা সংযোগ দরকার হয়েছিল। হয়তো সমাজের দৃষ্টিতে শস্য ছিল পবিত্র বস্তু, লোকে পূজার ভূমিতে তা ছড়িয়ে উৎসর্গ করেছে আরাধ্য দেব দেবীকে। তার পর একদা সবিস্ময়ে দেখেছে নতুন চারার উদগম, তা দেবতার দান বলে ভাবলেও উদ্ভিদের পুনর্জন্ম রহস্যটা ধরা পড়েছে। অথবা কেউ লক্ষ্য করেছে যে লাঠি পিটিয়ে শিষ থেকে দানা ছাড়াবার জায়গার আশেপাশে আবার তা দেখা দেয়। কিংবা ছাড়ানো গম বয়ে আনতে আনতে কোনও ঘরনীর হাত থেকে ঝুড়িটা অতর্কিতে পড়েছে জঞ্জাল স্তূপের এক ধারে, নয়তো সে নিকৃষ্ট দানাগুলি বেছে ছুঁড়ে ফেলেছে সে দিকে, আবর্জনার থেকে সার পেয়ে পরে সেখানে ঘন হয়ে শস্য তৃণ গজিয়েছে ; তা লক্ষ্য করে তার সন্ধানী মনে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার অঙ্কুর উঁকি দিল, এ বার হয়তো সবটা জুড়ে অথবা অল্প একটু খুঁড়ে মাটিতেই বীজ বুনে দিল সে, যথাকালে আবার একই ফল পাওয়া গেল। ঋতুচক্র স্পষ্ট হল, তার তালে তালে প্রকৃতির পুনর্জন্ম ধরা পড়ল, জননী নারী জননী বসুন্ধরার রহস্য উনমোচন করল, দুইয়ের মধ্যে স্থাপিত হল এক সূক্ষ্ম মিতালি। এই ধরনের ঘটনা এতই স্বাভাবিক যে তার থেকে বিভিন্ন স্থানে কৃষির সূচনা হয়ে থাকতে পারে একাধিক বার।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক বিচিন্তা অনুসারে উপরোক্ত কোনও রকম আকস্মিক আবিষ্কার থেকে স্বাধীন স্বেচ্ছাকৃত কৃষির শুরু। আগে জল্পনা হয়েছে পাহাড়ের গায়ে শস্য সঞ্চয় করতে গিয়ে কোনও বুদ্ধিমতী আবিষ্কার করল বিরল জাতের গম যা কাটতে গেলে শিষটি ঝরে পড়ে না, তখন ডালা ভরে তা এনে বুনল নিজ গ্রামের কাছে। কিন্তু এখন অনেক প্রত্নবিৎ মনে করেন অসাধারণ বুদ্ধির খেলার বদলে উপরোক্ত কোনও রকম আকস্মিক সূচনাই বেশী সম্ভব, যখন সহজে সংগ্রহ-যোগ্য গম আপনা হতেই ঘরের কাছে এসে গিয়েছিল। অবশ্য বহুর মধ্যে একটি দুটি বিরল প্রতিভা সব সমাজেই দেখা যায়, অসম্ভব নয় যে নানা ইঙ্গিত থেকে

তেমন কোনও সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তির অন্তর্দৃষ্টিতে রহস্যটি ধরা পড়েছে, জমি তৈরি করে তখন সে গম বুনেছে।

হয়তো কিছু সামাজিক কারন চাষের সাহায্যে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রেরণা যুগিয়েছে, যেমন বর্ধিষ্ণু জনসংখ্যা অথবা প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের থেকে শস্যের বিনিময়ে মাংস বা চকমকি আদায়ের তাগিদ। ১০০ শতাব্দী আগে তখনকার গ্রামগুলি দূরে দূরে ছিল, তাদের মধ্যে ভাষা, রীতি নীতি, দেব দেবী ইত্যাদির প্রভেদ থেকে বিভেদও দেখা দিয়ে থাকতে পারে। সুতরাং নব কৃষিজ্ঞানীরা তাদের অমূল্য সম্পদ বাইরের লোকদের থেকে বাঁচাতে চেয়েছে সম্ভবত। কিন্তু তারই মধ্যে অন্যদের সঙ্গে কিছু বিনিময় ব্যবস্থাও গড়ে উঠেছিল হয়তো—আলংকারিক কড়ি ঝিনুক বা ছুরি কাস্তে বানাবার পাথর ইত্যাদি নিয়ে। এই রকম যোগাযোগ কৃষি ও পরে অন্যান্য বিদ্যা ছড়াতে সাহায্য করেছে।

কোনও কোনও গ্রামে হয়তো যব দিয়ে চাষ আরম্ভ হয়েছে, এই শস্যটির চরিত্র অনেকটা গমেরই মত। কিন্তু হেকটেআর প্রতি যবের উৎপাদন গমের চেয়ে বেশী এবং তা অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট জমিতেও ফলে। অনেক পরে সভ্যতার শুরুতে কোনও কোনও প্রাথমিক শহরের তা ছিল সস্তা মৌলিক খাদ্য। আবার কোথাও কোথাও, যেমন বর্তমান সিরিয়া ও ইজরেলের অংশে, বুনো গম এত অপর্যাপ্ত ফলেছে যে শুধু তা কেটে এনেই বেশ বড় বড় জনপদ গড়ে উঠেছিল। প্রকৃতি যেখানে অপেক্ষাকৃত কৃপণ সেখানে অবশ্য বীজ বুনে মাটি থেকে খাদ্য আদায় করতে হয়েছে। প্রথম দিকের উৎপন্ন দানা পাউরুটি জাতীয় ফাঁপা খাবার বানাবার উপযুক্ত ছিল না, তা দিয়ে তৈরি হয়েছে চ্যাপটা রুটি, জলে ফুটিয়ে পরিজের মত বস্তু, ইত্যাদি। অনতিবিলম্বে ডাল, মটরশুঁটি প্রভৃতি অন্যান্য ফসলের খেতও দেখা দিল।

স্থায়ী ঘর সংসারের আরাম স্বাচ্ছন্দ্য আস্বাদ করে মানুষ নিশ্চয় সহজে গ্রাম ছেড়ে যায় নি, কিন্তু অধিকাংশ নৃবিজ্ঞানীর মতে মানুষেরই চাপে অনেকে ঘরছাড়া হতে বাধ্য হয়েছে, এদের সঙ্গে কৃষি বিদ্যাও ছড়িয়েছে। সুলভ খাদ্য ও পাকা বাস ব্যবস্থার ফলে দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছিল—নতুন আবিষ্কারে জীবন যাত্রা সহজ হলে সর্বদা যেমন হয়েছে। কষ্টার্জিত খাদ্যে অনেকের পেট ভরানোর প্রাচীন সমস্যা লঘুতর হল, অপঘাতে মৃত্যু অনেক কমল, শিকারে গিয়ে অনেকে প্রাণ হারায় না,

শিশুরা হিংস্র পশুর পেটে যায় না। সম্ভবত সমাজে শিশু হত্যার প্রাচীন রীতিও কমেছিল, কারণ দূর দূরান্তরে তাদের আর বয়ে বেড়াতে হয় না, অতিরিক্ত খাদ্য যোগাতে হয় না। এ দিকে পরিবারের অপর প্রান্তে অসহায় অসমর্থরা—বৃদ্ধ, পঙ্গু, রুগ্ন যারা—তারাও একই কারণে তখন পথে বির্বজিত নয়, বরং অপেক্ষাকৃত সচ্ছল স্থায়ী সমাজে গ্রামের প্রবীণদের জ্ঞান বিদ্যা অভিজ্ঞতার দাম বাড়ল।

এ ভাবে লোক বাড়তে বাড়তে ক্রমে চাষযোগ্য জমি ও শস্যের পরিমাণ অকুলান হয়ে উঠল, তখন কেউ কেউ বেরিয়ে পড়েছে নতুন আবাদী ক্ষেত্রের খোঁজে, যেখানে তা পেয়েছে সেখানে ঘর বেঁধেছে। খেতের মালিকানা নিয়ে বিরোধ বা সংঘর্ষ ঘটে থাকা আশ্চর্য নয়, যেমন এখনও হয়। বড় বড় গ্রাম হয়তো প্রথমে ছোটদের বাধা দিয়েছে প্রাকৃতিক ক্ষেত্র থেকে বুনো শস্য কাটতে, তার পর আরও এগিয়ে এসে তাদের ঘরোয়া চাষের জমি চড়াও করেছে, সফল হলে গ্রামটি আক্রমণ করে যুবতী মেয়েদের ছাড়া আর সবাইকে মেরেছে কিংবা তাড়িয়েছে। আবার স্বাভাবিক ও কৃষিজাত খাদ্যের অনুপাতে গ্রাম বেশী বড় হয়ে উঠলে গৃহবিবাদে গ্রামের মধ্যেই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের সৃষ্টি হয়েছে হয়তো, যারা দুর্বল তারা গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। অবশ্য এই সবই অনুমান।

শান্তিতে হক বিরোধে হক এই বিদায়ীরা ঝুড়িতে বা থলিতে নিয়েছে তাদের পরম সম্পদ সেরা জাতের বীজ। নতুন উপনিবেশে যে চাষ হয়েছে তার প্রায় সবটাই ঘরোয়া শক্ত দানার বীজ থেকে। গম ও যব সহজেই অবস্থা বদল আয়ত্ত করেছে, কোথাও কোথাও প্রথম দিকে ফসল ভাল হয় নি কিন্তু ঐ শস্য দুটির স্বাভাবিক জাতিভেদ ক্রমশ অসুবিধাগুলি দূর করেছে : যেখানে বৃষ্টি কম সেখানে যে সব চারা বেশী জল চায় তারা ভাল বাড়ে নি, বীজ দিয়েছে সামান্য, সুতরাং পরের ঋতুতে তাদের সংখ্যা কমেছে ; যে চারা কিছুটা খরা সহ্য করতে পারে তারা বেশী ফলেছে। এ ভাবে কয়েক ঋতুর পর স্থানীয় শস্যটি খরা, শীত ও অন্যান্য অবস্থায় সহনশীল হয়ে উঠল।

পাথর ও আগাছা তুলে ফেলে মাটি ঢিলে করে নিয়ে ঠিক সময়ে বীজ বুনে এবং ছাগল ভেড়া ইত্যাদির উপদ্রব বন্ধ করে গৃহস্থরা তাদের খেতে বুনো শস্যের চেয়ে বেশী ফসল পেয়েছে। প্রথম দিকে লাঙল ছিল না, খনন দণ্ড অর্থাৎ একটি চোখা লাঠি দিয়ে মাটি খুঁড়ে চাষ হয়েছে ; তার বেশী দরকার ছিল না, খুব কম

ফসলেও এক হেকটেআরের কম জমির থেকে এক এক পরিবারের সারা বছরের গম জুটত। অল্প বিস্তর আগে পরে ক্রমে নানা নতুন উপকরণ দেখা দিল, পুরনো যন্ত্রপাতির উন্নতি হল, তাতে উৎপাদন ও বিবিধ ক্ষেত্রে সুবিধা বাড়ল—গাছ কেটে চাষের জমি বাড়াতে উন্নত কুড়াল, মাটি খুঁড়তে সরুমুখ কোদাল, পরে লাঙল, শস্য কাটতে, তা গুঁড়ো করতে, রাখতে, রান্না করতে কাস্তে, শিল নোড়া, মাটির পাত্র ইত্যাদি।

গম ও যবের বিশেষ গুণ হল তারা জমিতে আয় দেয়, তাদের সহজে জমা করে রাখা চলে, তাদের তৈরি খাদ্য পুষ্টিকর। অবশ্য জমি তৈরি থেকে ফসল ঘরে আনা পর্যন্ত কৃষক ও পরিবারবর্গের পরিশ্রম অনেক, কিন্তু তা সাংবৎসরিক নয়, মাঝে মাঝে যথেষ্ট ছুটি, তখন তারা অন্য দিকে মন দিতে পেরেছে। তার তুলনায় ধানচাষীর বিশ্রাম অনেক কম। বুনো গম ও যবের স্বাভাবিক ক্ষেত্র পরিমিত, পশ্চিম এশিয়ার ছোট ছোট অংশে সীমিত ছিল তারা। দলছাড়া চাষবাসীদের সঙ্গে ধীরে ধীরে কৃষি মধ্যপ্রাচ্যের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল—শুধু মাত্র অতীব প্রতিকূল ক্ষেত্র ছাড়া। সেই সূত্র ধরে আজ পৃথিবীর সব নাতিশীতোষ্ণ দেশে গমের চাষ প্রতিষ্ঠিত। ১০০ শতাব্দী আগে উত্তর ইরাকের পর্বতে যে বন্য গম আবিষ্কার হয়েছে তারই সভ্য বংশধররা আজ পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির আবশ্যিক পাউরুটির খোরাক এবং সারা পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক লোকের মৌলিক খাদ্য।

এ বার এ যাবৎ আদিতম চাষবাসী গ্রামের আবিষ্কার, মানুষ জন, বাস ব্যবস্থা ইত্যাদির সঙ্গে পরিচয় করা যেতে পারে। কয়েক বছর আগেও বর্তমান ইরাকের জার্মো নামক জায়গায় মাটির উপর দেখা যেত শুধু এক ছোট পাহাড়ের মাথায় একটি গোল ঢিবি, আশেপাশে ছড়ানো ফাটা ও ঘষা পাথরের খণ্ড। ১৯৪৮ সালে দৃশ্যটি পরীক্ষা করে ব্রেইড্‌উডের মন বলল স্থানটি হয়তো কৃষির সূচনা কালের সমপ্রাচীন। দূর অতীতের মূক সাক্ষী এ রকম হাজার হাজার ঢিবি মাথা তুলে আছে ভূমধ্য সাগরের পূর্বাঞ্চলের অনেক দেশে, ভারতে অসংখ্য ঢিবির উপর এখনও কোদালের ঘা পড়ে নি। সে কালের ঘর বাড়ি কাদা, ডাল-পালা, নলখাগড়া ইত্যাদির তৈরি, কিছু কাল পরেই তা ভেঙে পড়ত, তারই ধ্বংসের উপর আবার নতুন করে ঘর তোলা হত, এমনি করে গড়ে উঠত ঢিবি। তাদের নির্মাণ-বস্তু থেকে ঘরগুলি কত দিন টিকতে পারে তা অনুমান করে স্তরের বয়স

হিসাব করা যায়। এক একটি স্তরের জঞ্জাল আজ বহুমূল্য বস্তু, সে সব দিনের মানুষদের সম্বন্ধে আমরা যা কিছু জানি তা এরই থেকে। সে কালে কেউ হয়তো জল খেয়ে মাটির পাত্র ছুঁড়ে ফেলেছে দূরে, আজ তারই ভগ্নাবশিষ্ট সংগ্রহ করতে শাবল কোদাল নিয়ে পণ্ডিতরা আসেন দূর দূরান্তর থেকে অনেক সাজ সরঞ্জাম নিয়ে।

জার্মোর ঢিবিতে কিছু মাটি কেটে ব্রেইড্‌উডের সন্দেহ গাঢ় হল, তিনি যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে গেলেন অনুসন্ধানী দল গড়তে। দু বছর পরে উদ্ভিদতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব ও প্রাণী-বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে পুরো দমে কাজ আরম্ভ হল। খননে উদঘাটিত হল একের নিচে এক প্রায় ষোলটি বাস্তু স্তর, সব নিয়ে হয়তো তিন শতাধিক বছরে সৃষ্টি হয়েছে ঢিবি। নিম্নতম অর্থাৎ প্রাচীনতম স্তরে প্রাপ্ত ফসিল থেকে মনে হয় মানুষ-গুলি দেখতে অনেকটা বর্তমান আরবী অধিবাসীদের মতই ছিল— মাঝারি গড়ন, সম্ভবত কালো চোখ ও চুল, আধময়লা গায়ের রং। তারা থাকত লম্বাটে চৌকোণ মাটির বাড়িতে, তাতে কয়েকটি করে ঘর। গ্রামে এই রকম প্রশস্ত কুটিরে প্রায় ২৫ ঘর কৃষকের বাস, লোকসংখ্যা দেড় শো'র বেশী নয়।

তারা দেহ সাজিয়েছে পাথর ও হাড়ের বালা ও অলংকারে, ঘষা পাথরের আশ্চর্য মনোরম বাটি ও অন্যান্য পাত্র বানিয়েছে, কিন্তু মৃৎপাত্রের শিল্প জানত না, যদিও মাটি দিয়ে গড়েছে মানুষ ও পশুর মূর্তি। গাধা, গাজলা হরিণ ও অন্য বন্য জন্তু এবং শামুকের খোল, ওক গাছের ফল ও পেস্তার খোসা থেকে বোঝা যায় তখনও খাদ্যের অনেকটা যোগাত শিকার ও সংগ্রহ। কিন্তু অনেকটা হলেও সবটা যে নয় তার ইঙ্গিত রূপে ঐ স্তরেই উপস্থিত ছিল চকমকি ও অব্‌সিডিয়ানের (আগ্নেয়-গিরিজাত গাঢ় নীলাভ কালো বা ধূসর কাচের মত বস্তু) ফলাযুক্ত কাস্তে, শিল নোড়া এবং প্রাথমিক সরুমুখ কোদাল জাতীয় ঘষা পাথরের উপকরণ। জার্মোতে সম্ভবত কুকুর পোষা হয়েছে, তা ছাড়া পশুর ফসিলের মধ্যে প্রাণীবিজ্ঞানীরা সনাক্ত করলেন ছাগল ও ভেড়ার হাড়; এগুলি পরিণতবয়স্ক কিন্তু অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রদেহ, গার্হস্থ্য জন্তুদের মধ্যে মাংসের জন্য সাধারণত ক্ষুদ্রাকারদেরই কাটা হয়, সুতরাং ফসিলগুলি কিছুটা যেন পশুপালন নির্দেশ করছে। জার্মোবাসীরা দেহ সাজিয়েছে যে সামুদ্রিক খোলক দিয়ে তা এসেছে পারস্য উপসাগর থেকে, হাতিয়ার তৈরিতে ব্যবহৃত অব্‌সিডিয়ানের নিকটতম প্রাপ্তিস্থান কয়েক শো কিলোমিটার দূরস্থ বর্তমান তুরস্কে, সুতরাং মনে হয় দূরাঞ্চলের সঙ্গে বাণিজ্য গড়ে উঠেছিল।

ব্রেইডুডের দল চাষের স্পষ্ট প্রমাণ উদ্ধার করেছে, তা আমরা আগে দেখেছি। জার্মোবাসীরা যে দুই জাতেরই কৃষিজাত গম ও এক জাতের যব খেয়েছে তার নির্দেশ দিচ্ছে প্রায় ৯০ শতাব্দী প্রাচীন কিছু দানা, তারা বন্য পুরোগামীদের নিকটাত্মীয়, কিন্তু আজকের গম ও যবের সঙ্গেও সম্পর্ক প্রতীয়মান। মাটির নিচে এত কালের বৃষ্টির জলে তারা ভিজেছে. কিন্তু ঘর-পোড়া আগুনের তাপে কিংবা চুলায় আধপোড়া হয়েছে বলে পচে যায় নি. আবার অপেক্ষাকৃত অল্প তাতে তাদের আকার আকৃতিও বদলায় নি। উদ্ভিদবিজ্ঞানীরা আরও সংকেত আবিষ্কার করেছেন ঘরের দেয়ালের গর্ভে ও মেঝের নিচে। মাঠ থেকে ফসল এনে যখন দানা ছাড়ানো হয়েছে, আশেপাশে বর্জিত তৃণ ও শিষের সঙ্গে থেকে গিয়েছে তার কিছু কিছু। পরে গৃহনির্মাতারা সেখান থেকে খড় সংগ্রহ করে মাটির সঙ্গে মিশিয়েছে, এ দানাগুলিও ঢুকেছে তাতে। তাদের নশ্বর দেহ আজ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত, কিন্তু ফাঁপা খোবলগুলিতে তা রেখে গিয়েছে এত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ছাপ যে বিজ্ঞানীর আর প্রায় কিছুই জানতে বাকি নেই। জার্মোর ঘর বাড়ির অনেক মেঝে ও দেয়ালের নিম্নাংশ আজও চমৎকার সংরক্ষিত. সুতরাং এই সব ছাপই গ্রামবাসীদের প্রাথমিক ফসল সম্বন্ধে অধিকাংশ খাঁটি খবর দিয়েছে। জার্মো ও অন্যান্য নবপ্রস্তর গ্রামের আদিতম গৃহ, তাদের গড়ন ও নির্মাণ কৌশলের আরও বিশদ আলোচনা হবে পরে।

জার্মোতেই কৃষির সূচনা এমন কথা অবশ্য জোর করে বলা যায় না, কিন্তু প্রাচীনতর এমন প্রত্যক্ষ প্রমাণ এ যাবৎ আর কোথাও নেই। সেখানে গম ও যবের প্রাথমিক বপনের শুরু থেকে ৯০০০ বছর প্রাচীন প্রাপ্ত নমুনাগুলির অবস্থায় পৌঁছাতে নিশ্চয় আরও দু এক হাজার বছর কেটে গিয়েছে।

বিশ্বের খাদ্য ভাণ্ডারে মধ্যপ্রাচ্যের দান শুধু গম ও যব নয়। এই উর্বর অর্ধ-বৃত্তেই ৮০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের (বিসি) পরে প্রথম উৎপাদিত ছোলা, মটরশুঁটি, মসুর এবং ফাভা বীন ; এবং আরও হাজার চারেক বছর কেটে যাওয়ার পর, অর্থাৎ ঐতিহাসিক কালের কাছাকাছি ডুমুর. খোবানি. বাদাম, পেস্তা, আখরোট, খেজুর, আঙুর ও জলপাই। তার অনেক আগেই অবশ্য পৃথিবীর অন্য দুটি অঞ্চলে নানা নতুন ফসল ফল মূল তরিতরকারির উৎপাদন থেকে আহারে বৈচিত্র্য ও আনন্দ

বেড়েছে—এশিয়া মহাদেশেরই অন্তিম-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এলাকা এবং প্রশান্ত মহাসাগরের অপর পারে মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা। এর থেকে মনে হয় বিভিন্ন ফসল নিয়ে অন্তত দূর দেশে দেশে কৃষির রহস্য বার বার আবিষ্কার হয়েছে।

এশিয়ার পূর্ব প্রান্তে পাড়ি দেওয়ার আগে আমরা এক বার পশ্চিমে দৃষ্টিপাত করি। কৃষি বিদ্যা পশ্চিম এশিয়া থেকে সম্ভবত লোক যোগাযোগে ক্রমে মিশরে ও য়োরোপে প্রবেশ করেছে, সেই মহাদেশে নবপ্রস্তর যুগ পৌঁছাতে লেগেছে অন্তত ৩000 বছর। ৬000 বিসি নাগাদ ক্রীট দ্বীপে এবং ঈজীয় সাগরের উত্তর উপকূলে কিছু চাষ আবাদ দেখা যায়, ৫000 বিসির মধ্যে কৃষক সম্প্রদায় বল্‌কান অঞ্চলে উত্তরে হাংগেরি পর্যন্ত ও পশ্চিম গ্রীসের পার্বত্য ভূমি ও দ্বীপপুঞ্জে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে, উপরন্তু দক্ষিণ-পূর্ব ইটালিতেও। দানিয়ুবীয়রা মধ্য য়োরোপের আদি কৃষিবাসী, নামটি হয়েছে তারা প্রথম দানিয়ুব নদীর উপত্যকায় বসতি বানিয়েছিল বলে। ৪000 বিসির মধ্যে কৃষিজীবীরা মধ্য জার্মেনি, ইটালি, সিসিলি ও মল্টা দ্বীপ (এবং অদূরে উত্তর আফ্রিকা), দক্ষিণ ফ্রান্স এবং স্পেইন ও পর্টুগালের পূর্বাঞ্চল দখল করেছে, এবং আরও ৫00 বছরে উত্তর য়োরোপে ডেনমার্ক ও সুইডেন। প্রায় ঐ সময়ে উত্তর ফ্রানস থেকে তারা সাগর পাড়ি দিয়ে পৌঁছেছে ব্রিটেনে, নৌকায় শস্যের বীজ ছাড়াও তারা গার্হস্থ্য পশু সঙ্গে নিয়েছিল পায়ে বেড়ি পরিয়ে।

অন্তিম পূর্ব এশিয়ায় চীনে আজ চালের চলন বেশী, কিন্তু তা দিয়ে সেখানে কৃষি শুরু হয় নি। চীনের প্রাচীন সভ্যতার খোরাক যুগিয়েছে বাজরা (millet) নামক দীর্ঘ তৃণ, অন্তত ৪৫00 বিসিতেই তার উৎপাদন আরম্ভ হয়েছে, ধানের চাষ প্রায় ১000 বছর পরে, কিন্তু ১৬00 বিসি পর্যন্ত সেখানে তার তুলনায় বাজরা ও গমেরই প্রাধান্য ছিল। ভারতে ২000 বিসির আগে ধানের চাষ শুরু হয়েছে। কৃষিজাত ধানের জন্ম কোথায় তা এখনও অনিশ্চিত, সাধারণ ভাবে বলা চলে পূর্ব বা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া।

চীনের উত্তরাংশে বাজরার প্রথম ফলন, সেখানে এখনও তার চাষ হয়। বন্য- পূর্বপুরুষ থেকে বিবর্তিত এই কৃষিযোগ্য বাজরা চীন থেকে ভারত, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, উত্তর আফ্রিকা ও য়োরোপে ছড়িয়েছে, এখন তা প্রায় বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ লোকের খাদ্য। উত্তর চীনের জলবায়ু গমের অনুকূল

ছিল না, যদিও কিছু চাষ আবাদ হয়েছে এবং সামান্য প্রাবাদিক নজির অনুসারে কৃষিজাত গম পরের দিকে পশ্চিম এশিয়া থেকে আমদানি। প্রোটিন ও তেল সমৃদ্ধ সয়া বীন ৩000 বিসির আগেই প্রাচ্য অঞ্চলের নানা অংশে নিয়মিত খাদ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই বীন প্রায় মাংসেরই মত পুষ্টিকর, মাংসের স্বাদ এনে এবং আরও নানা ভাবে তা রান্না করা চলে। প্রাচীন সাহিত্য ও প্রত্নতাত্ত্বিক নজির থেকে মনে হয় উত্তর চীনে সয়া বীনের চাষ আরম্ভ ১৬00 থেকে ১১00 বিসির মধ্যে এবং ভাঁড়ারে প্রায় বাজরার মতই সমাদর ছিল তার। আজও সে দেশে সয়া দুধের তুল্য উপকারী বলে গণ্য (সাবালক চৈনিকদের পেটে গরুর দুধ সহজে হজম হয় না)।

আজকের জগতে প্রধান অন্নশস্য গম, ধান ও ভুট্টা. পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক লোক চাল খায়। বর্তমান চীনের মৌলিক খাদ্য চাল প্রথম দিকে চৈনিকদের দৃষ্টিতে অন্য শস্যগুলির তুলনায় হীন ছিল। সয়া বীন ও বাজরা অঞ্চলের কয়েক হাজার কিলো-মিটার দক্ষিণে ধান চাষের সূচনা। সেখানে জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র, দক্ষিণ চীনে বিশেষত ইয়াংসি নদীর মোহানায় গভীর বারিপাতের ক্ষেত্রে অনেক বুনো ধানের ঘাস এখনও গজায়। এই এলাকায় শাংহাই শহরের অদূরে এক জায়গায় আদিতম নিঃসন্দেহে কৃষিজাত ধান আবিষ্কার হয়েছে, তা প্রায় ৫000 বছর প্রাচীন, কিন্তু বুনো জাতের তুলনায় তাব পার্থক্য থেকে বোঝা যায় এর আগেই চীনে ধানের চাষ সুপ্রতিষ্ঠিত। তা সত্ত্বেও ধান বিশ্বে চীনের দান না হতে পারে। ১৯৬০ দশকের মাঝামাঝি হাওআই দ্বীপ ও নিউ জিল্যানড থেকে এক দল পুরাবিজ্ঞানী থাইল্যানডের পূর্বাঞ্চলে নন নক থা নামক এক ঢিবি খুঁড়ে ৫৫00 বছর প্রাচীন এক গ্রামের অবশিষ্ট উদ্ধার করেন, তার মধ্যে ছিল ধানের তুষ, রং কালো হয়ে গিয়েছে তার, মৃৎপাত্রের টুকরোর সঙ্গে পাওয়া গিয়েছে বলে অনেকে মনে করেন তা কৃষিজাত, কারণ মৃৎশিল্প কৃষির পরের কথা। যাদের ধারণা চীনের কয়েক শো বছর আগে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ধান চাষ হয়েছে এই বিবর্ণ তুষ তাদের কিছুটা সমর্থন করছে।

শুধু তাই নয়, ১৯৬৬ সালে অর্থাৎ প্রায় একই সময়ে হাওআই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র চেস্টার গরম্যান উত্তর-পশ্চিম থাইল্যানডের স্পিরিট কেভ গুহায় খনন করে মানুষের পরিত্যক্ত ১0,000-৬000 বিসি প্রাচীন বস্তুর মধ্যে উদ্ভিদের অবশিষ্টাংশ পেলেন যাদের প্রকার আকার দেখে মনে হয় অধিবাসীরা দু' রকম সিম ও এক রকম

মটরশুঁটি উৎপাদন করেছিল ৭০০০ বিসিতেই, অর্থাৎ মধ্যপ্রাচ্যে প্রথম কৃষি আবিষ্কারের মাত্র হাজার বছরের মধ্যে। আর এক সূত্র অনুসারে এই দুটি সবজি ছাড়াও সে দেশে ৬০০০ বিসিতেই আহার্যের মধ্যে ছিল বাদাম, সুপারি, শশা, পানিফল ও লাউ, তার কিছু প্রায় নিশ্চয় কৃষিজাত। গরম্যান আরও পেয়েছেন স্লেট পাথরের ছুরি, এ রকম ছুরি দিয়ে জাভার চাষীরা এখনও ধান কাটে, পরীক্ষার থেকে গরম্যানের ধারণা যে চীনের প্রায় ৫০০ বছর আগে থাইল্যানডে ধান চাষ হয়েছে। কিন্তু শুধু এ সব ইঙ্গিত থেকে ধান বা সবজি সম্বন্ধে সে দেশের দাবি সকলে মানেন না।

এশিয়ার পূর্বাঞ্চলে প্রথম উৎপন্ন হয় মিষ্টি আলু, লাল, হলদে ও সবুজ জাতের কলা, আখ, নারকেল। আজ এ সব প্রায় সকল আর্দ্র উষ্ণ দেশে ফলানো হয়ে থাকে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াবাসীদের নজর ছিল প্রধানত ফল, মূল ও কন্দের (tuber) দিকে। আধুনিক থাইল্যানড, বর্মা, পূর্ব ভারত, ইন্দোচীন ও চীনের অন্তিম দক্ষিণে বিবিধ মূল আজও খাদ্যের এক বড় অংশ, এশিয়ার এই উষ্ণ দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে কচু, মিষ্টি আলু প্রমুখ মূলের ফলন দেখা দিয়েছিল, তবে কত কাল আগে তা অনিশ্চিত। আমাদের এ যাবৎ বিবেচিত কৃষি কাজ থেকে এদের উৎপাদন সম্পূর্ণ ভিন্ন, গম ধান বাজরার মত তারা ঋতুনির্ভর নয়, সারা বছর গজায়। এ সব উদ্ভিদের পুনর্জন্ম বীজ থেকে হয় না, শিকড়ের একটু অংশ মাটিতে থেকে গেলে বা রেখে দিলেই আবার নতুন করে বাড়ে। এত সহজ বলে অবশ্য এই কৃষি আবিষ্কারের কৃতিত্বও কম, কিন্তু প্রথম ধান চাষ বা কৃষির উষা কালেই সবজি ফলনের দাবি প্রতিষ্ঠিত হলে এই অঞ্চলের গৌরব অনেক বেড়ে যাবে। এশিয়ার মাটিতে উৎপন্ন উদ্ভিদের কথা শেষ করবার আগে উল্লেখযোগ্য যে মানুষের কাজে লেগেছে এমন তরুর মধ্যে ভারতীয় উপমহাদেশের দান তুলা যা বহু দিন ধরে সারা বিশ্বে বস্ত্রের এক প্রধান উপাদান। উত্তর-পশ্চিমে সিন্ধু নদ উপত্যকায় খাদ্য শস্যের পাশাপাশি প্রথম তুলার চাষ ও কাপড় তৈরি হয়েছে, অবশ্য এই প্রসিদ্ধ সিন্ধু সভ্যতা সূচিত ২৫০০ বিসির কাছাকাছি, তখন সেখানে বড় বড় শহর গড়ে উঠছে। বস্ত্র শিল্প প্রসঙ্গে আঁশালো উদ্ভিদের চাষ সম্বন্ধে পরে আরও আলোচনা হবে।

এশিয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রশান্ত মহাসাগরের অপর পারে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ দিকে

আমেরিকা মহাদেশেও কৃষি দেখা দিচ্ছিল। যে সব বন্য তরু লতা এই অঞ্চলের লোক বশ করেছে মানুষের পাক শিল্পে এবং পরে বৃহত্তর ইতিহাসে তাদের অংশ কম নয়। ৩৫০০ বিসি নাগাদ দক্ষিণ আমেরিকায় প্রশান্ত মহাসাগর সংলগ্ন অ্যানডিজ পর্বতমালায় প্রথম ফলানো হয় আলু, সর্ব দেশের রন্ধনশালায় তা এখন অপরিহার্য, একদা য়োরোপীয়দের দুর্ভিক্ষের কবল থেকে বাঁচাতে সাহায্য করেছে এই ম্যাটমেটে দীন হীন কন্দ। কোকো বীনের বস্তু আজ চকোলেট ও আরও নানা রূপে রসনা তৃপ্ত করে, তেমনি কাঁচা লঙ্কা ছাড়া রান্না আজ বাঙালীর অকল্পনীয়, বিবিধ বীন বরবটি, টোমাটো এবং অন্যান্য সবজি এবং চিনেবাদামও আমেরিকার দান। সব নিয়ে বারোর বেশী আমেরিকাজাত খাদ্য আজ পুব পশ্চিমের নানা দেশে উৎপন্ন হয়ে অসংখ্য লোককে পুষ্ট ও তুষ্ট করছে।

তাদের মধ্যে সবচেয়ে সমাদৃত ফসলটি অবশ্য ভুট্টা—এশিয়া যেমন ধান্যপ্রধান, য়োরোপ ও উত্তর আমেরিকায় যেমন মৌলিক খাদ্য গম, তেমনি প্রাচীন কাল থেকে মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার বিশাল ভূখণ্ড জুড়ে ভুট্টার আধিপত্য. অধিবাসীরা তার থেকে চ্যাপটা রুটি বানায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই আজ বিশ্বের অর্ধেক মকাই ফলে, সে দেশের নানা আহার্য ছাড়াও বিবিধ ব্যবহারে তা কাজে লাগে। দক্ষিণে ঐতিহাসিক কালে এই শস্যের উপর গড়ে উঠেছিল বিখ্যাত মায়া, আজটেক ও ইংকা সভ্যতা।

মধ্য আমেরিকার মেকসিকো এবং তার প্রায় ২৫০০ কিলোমিটার দূরে দক্ষিণ আমেরিকার পেরুতে ঐ মহাদেশীয় কৃষির আদিতম চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। ভুট্টা আমেরিকার প্রথম কৃষিজাত ফসল নয়। এই দুই দেশে গোল লাউ ও অ্যাভো-কাডোর ফলন আজ থেকে প্রায় ৯০০০ বছর অর্থাৎ প্রথম গম চাষের সমান প্রাচীন বলে দাবি শোনা যায়। বরবটি, কুমড়ো ও কুমড়ো জাতীয় ফল স্কোঅশ ৫০০০ বিসির মধ্যে উৎপাদিত. কিন্তু ক্যানাডার এক নৃবিজ্ঞানী মেকসিকোর এক গুহায় তিনটি স্কোঅশ বীজ পেয়েছেন যাদের আয়তন দেখে তাঁর মনে হয়েছে তারা কৃষিজাত হতে পারে, তেজী-কারবন পদ্ধতি অনুসারে বীজগুলির বয়স প্রায় ৯০০০ বছর। এই দেশ দুটির মধ্যে কোথায় প্রথম চাষ সূচিত হয়েছে তা এখনও বিতর্কের বিষয়, কিন্তু আদি পর্বটা মেকসিকোতেই বেশী স্পষ্ট। সেখানে পার্বত্য ভূমিতে উষ্ণ শীতল শুষ্ক আর্দ্র ইত্যাদি বিভিন্ন অবস্থা ইতস্তত উপস্থিত ছিল বলে নানা বন্য

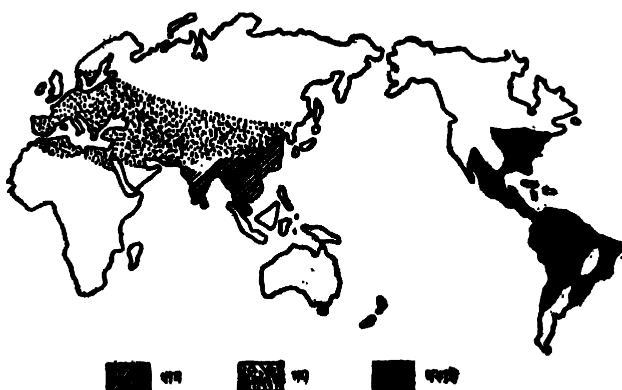
আহার্য উদ্ভিদের সন্নিবেশ হয়েছিল, প্রাথমিক কৃষীরা পছন্দ মত বেছে নেওয়ার যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছে। ১৯৬০ দশকে এক বৈজ্ঞানিক অভিযান সে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে তেউআকান উপত্যকায় গুহা ও অন্যান্য ঘাঁটি খুঁড়ে বিভিন্ন উদ্ভিদের প্রায় এক লাখ নমুনা ও ১১,০১০ পশুর হাড় সংগ্রহ করে. তাদের পরীক্ষায় জানা যায় যে প্রায় ৬000 বিসি পর্যন্ত শিকার ও বন্য উদ্ভিজ্জ সংগ্রহের পর কৃষির সূচনায় অধিবাসীদের খাদ্যে বৈচিত্র্য বাড়তে লাগল। প্রথমে ছোট ছোট জমিতে এলোমেলো বীজ বুনে তারা ফলিয়েছে ফল বা আহার্য বীজের গাছ এবং স্কোঅশ ও বরবটি, ২৭০০ বিসি নাগাদ ভুট্টার উৎপাদন বাড়তে শুরু করল প্রাধান্যের দিকে, যদিও সঙ্গে সঙ্গে চলেছে পালিত কুকুর ও টার্কি জাতীয় মুরগী এবং কিছু বন্য জন্তুর মাংস ভক্ষণ।

মেকসিকোর আদিতম কৃষিজ ভুট্টার দানাগুলি ভুতির সঙ্গে শক্ত হয়ে যুক্ত এবং তাদের খোসাগুলি বন্ধ, ফলে তা কৃষির অনুকূল ও স্বাভাবিক প্রসারের প্রতিকূল (যেমন গমের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে)। তা ছাড়া গম, যব ও অন্যান্য শস্যের মত বন্য মকাইর গুচ্ছ মেকসিকোতে দেখা যায় নি, সুতরাং তা বিদেশের আমদানি বলে এক তত্ত্ব গড়ে উঠল। ১৯৫৪ পর্যন্ত ভুট্টার উৎপত্তির কোন চিহ্ন মেলে নি, তার পর রাজধানী মেকসিকো সিটি শহরের ৬০ মিটার নিচ থেকে উদ্ধৃত উনিশটি পরাগরেণু সেখানে ভুট্টার অস্তিত্ব প্রমাণ করল, কিন্তু দেখা গেল তাদের বয়স ৮০,০০০ বছর, তখনও আমেরিকায় মানুষের পা পড়ে নি, সুতরাং তা আবাদী শস্য হতে পারে না, স্থানীয় বন্য জাতি। এই আবিষ্কারে উৎসাহ পেয়ে ক্যানাডার রিচার্ড ম্যাক্‌নিশ উপরোক্ত তেউআকান উপত্যকার এক গুহায় কয়েকটি ভুট্টার ভুতি খুঁজে পেলেন, দৈর্ঘ্যে প্রায় আড়াই সেনটিমিটার, বয়স ৫২০০-৩৪০০ বিসি। তারা দানাবিহীন, নিশ্চয় সেগুলি খুঁটে বার করে খেয়েছে মানুষ, কিন্তু পরীক্ষায় মনে হল ভুতির সঙ্গে দানার যোগ ছিল শিথিল এবং পাকলে তাদের খোসা খুলে যেত, সুতরাং তারা সহজে মাটিতে পড়ত ও অঙ্কুরিত হত।

তাতে ভিন্ন জাতের সঙ্গে যৌন মিলন অর্থাৎ সংকরণ (hybridization) সহজ হবে এবং উদ্ভিদতাত্ত্বিক নজিরের নির্দেশ এই যে বুনো ভুট্টার অসবর্ণ বিবাহ হয়েছে তেওসিন্‌তে ('দেবশস্য') নামে এক অনুরূপ তৃণের সঙ্গে, উন্নত জাতের ভুট্টা তাদেরই সন্তান। এর থেকে বোঝা যায় কি করে ১৫00 বিসির কাছাকাছি

হঠাৎ মকাই মেকসিকোর প্রধান ফসল হয়ে দাঁড়াল, শেষ পর্যন্ত সভ্য শক্ত দানা জয় করেছে বুনো শিথিল জাতভাইকে, ফলে এখন আর তাদের দেখা যায় না। গমের বেলায় শক্ত দানার গাছ মাঠেই ছিল, মানুষ সংগ্রহের সুবিধার জন্য অজানতে তা বাছাই করেছে, সুতরাং তার খেতে তাই ফলেছে।

মেকসিকো ও পেরুর অন্তর্বর্তী গভীর জঙ্গল ও রুক্ষ ভূমি পেরিয়ে সে কালে যোগাযোগ হয়েছে বলে মনে হয় না, এমন কি ১৬শ শতাব্দে স্পেনীয় বিজেতারা দেখল মেকসিকোর অ্যাজটেকরা ও পেরুর ইংকারা পরস্পরের কিছুই জানে না। সুতরাং সম্ভবত কৃষি দুই দেশের স্বাধীন আবিষ্কার—তাদের কিছু কিছু ফসল পৃথক, কিছু একই বন্য উদ্ভিদ থেকে আহৃত। পেরুর অ্যানডিজ পর্বতে প্রথমে আলু, রাঙা আলু, অন্যান্য মূল, টোমাটো, চিনেবাদাম ও লিমা বীনের চাষ হয়। এখনও নব্বইর বেশী বন্য আলুর প্রজাতি ফলে সেখানে। অধিবাসীরা আলু, চিনেবাদাম, স্কোঅশ, লঙ্কা ইত্যাদির সুন্দর অনুকরণ করে পোড়া মাটির ঘট গড়েছে, এই সব পাত্র একাধারে উন্নত গঠন শিল্প ও কৃষি বিদ্যার পরিচায়ক, এমনি বাস্তবিক ও পরিপুষ্ট রূপ ফুটেছে ফসলগুলির। এক গুহা খুঁড়ে মার্কিন বিজ্ঞানীরা প্রায় ৫৬০০



চিত্র ৩। পৃথিবীর তিনটি প্রধান শস্য ক্ষেত্র।

বি সি প্রাচীন তিরিশটি সাধারণ বরবটি পেয়েছেন যাদের অপেক্ষাকৃত বড় আকার দেখে কৃষিজাত বলে সন্দেহ হয়, কারণ মেকসিকো ও দক্ষিণ আমেরিকার বরবটি সর্বদা ছোট। শুধু এই বরবটির নয়, ভুট্টার আবাদও পেরুতে মেকসিকোর আগে

হয়ে থাকতে পারে। ১৯৭০ সালে রিচার্ড ম্যাকনিশের নেতৃত্বে একটি দল এক গুহার মাটি থেকে আদিম ভুট্টার ভুতি উদ্ধার করে, তাদের চেহারা মেক্সিকোর ভুতির সঙ্গে মেলে না, বয়স মনে হয় ৪৩০০-২৮০০ বিসি, অর্থাৎ মকাই মেক্সিকোর প্রধান শস্য হয়ে উঠবার বেশ আগে। সুতরাং এই মূল্যবান শস্যটি যদি এক দেশ থেকে আর একটিতে স্থানান্তরিত হয়ে থাকে তো কে কার কাছে ঋণী এখনও বলা যায় না।

বর্তমান নজির অনুসারে কতগুলি ফসল কখন কোথায় উৎপন্ন হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত তালিকা নিচে দেওয়া হল। বলা বাহুল্য, নতুন আবিষ্কারে স্থান কাল পরে বদলে যেতে পারে, সাধারণত উল্লিখিত নির্দিষ্ট দেশেই এ যাবৎ প্রথম চাষের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে, তবে দু একটি ক্ষেত্রে একই বস্তু নিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলের দাবি আছে।

ফসল	বিসি	দেশ
গম, যব	৮০০০-৭০০০	ইরাক
ভুট্টা	৫৫০০-৫০০০	মেক্সিকো বা পেরু
বাজরা	৪৫০০-র আগে	চীন
ধান	প্রায় ৩৫০০	পূর্ব বা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া
মটরশুঁটি, ছোলা, মসুর	৮০০০-র পরে	মধ্যপ্রাচ্য
গোল লাউ	প্রায় ৭০০০	মেক্সিকো
বরবটি	৬০০০-র আগে	মেক্সিকো বা পেরু
স্কোঅশ, কুমড়ো	৫০০০-র আগে	মেক্সিকো বা পেরু
সয়া বীন	৩০০০-র আগে	পূর্ব বা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া
বাদাম, পেস্তা, আখরোট, খেজুর, আঙুর, জলপাই	৪০০০-র পরে	মধ্যপ্রাচ্য
আলু	৩৫০০	পেরু
তামাক	২০০০	অ্যামাজন উপত্যকা ও মেক্সিকো

এই বর্ণনায় দেখা গেল যে গম যব ধান ভুট্টা বাজরার মত শুধু উদর পূর্তির খাদ্য নয়, যা দিয়ে আহারের আকর্ষণ বাড়ে কৃষি আয়ত্ত করে ক্রমে সে দিকে

মানুষের নজর পড়েছে। দেশের মাটিতে যা ফলতে দেখেছে তার থেকে বেছে সে নিজের রুচি মাফিক গাছ লাগিয়েছে বেশী করে—এই ফলের রসালো মিষ্টি স্বাদ, ঐ সবজির নরম গালভরা 'মাংস' লোভ জাগিয়েছে তার ; কিছু কাঁচা খাওয়ার যোগ্য, কিছু রান্নার, কিছু বা শুকিয়ে রাখা যায়। পাক শিল্পে নতুন নতুন পদ সৃষ্টি হল নিশ্চয়, রুটি বা ভাতের একঘেয়েমি কমল। পুরাপ্রস্তর মানুষের আহারে সাধারণত নিরামিষ ভাগটা ছিল গৌণ, এখন নিরামিষের পদোন্নতি হল। বিচিত্র খাদ্য নানা দিক থেকে দেহের পুষ্টি যোগাল—সয়া ও অন্যান্য বীন, মটর, মসুর ইত্যাদি থেকে প্রোটিন, আলু বা মিষ্টি আলু থেকে স্টার্চ, বাদাম ও অন্য বীজ থেকে তেল এবং যাবতীয় ফল ও সবজি থেকে অতি প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও আকরিক পদার্থ। এদের অভাবে যে সব রোগ ধরে, অনুমান করা যায় কৃষিবাসী সমাজে সাধারণত তার প্রকোপ কমল।

চাষ শিখে যে মানুষের খাদ্য ভাবনা মিটে গেল তা নয়, কারণ প্রথম কৃষী সমাজগুলি শিকার ও সংগ্রহ বৃত্তি সম্পূর্ণ ছাড়তে পারে নি। তবে বনে প্রান্তরে ঘুরে ঘুরে শিকার ও সংগ্রহের আকস্মিক বিপদ ও ভাগ্যানির্ভরতা কমেছে, যদিও দূর হয় নি—প্রকৃতির খেয়ালে যে বার অজন্মা হয়েছে সে বার দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে, যেমন আজও দেখা দেয়। স্থায়ী বাস ব্যবস্থার সঙ্গে ভবিষ্যতের জন্য কিছু শস্য জমা করে রাখা হত, ব্যবহার্য বা আদৃত সম্পত্তিও জমত, হঠাৎ খড়ের চালে আগুন লেগে হয়তো গৃহস্থ সব হারিয়েছে। বীজ বপন থেকে ফসল ঘরে আনা পর্যন্ত পাহারা দেওয়া, আগাছা দূর করা ইত্যাদি সব নিয়ে কৃষক ও তার পরিবারবর্গের পরিশ্রম অনেক। উপরন্তু প্রথম দিকে মাটির হাল চাল কিছুই জানা ছিল না, জমির রসদ ক্ষয় হতে হতে বছর বছর ফলনও কমেছে, শেষে আবার নতুন ক্ষেত্রের সন্ধানে বেরিয়ে পড়তে হত ভিটে মাটি ছেড়ে। ক্রমে অভিজ্ঞতা ও নতুন আবিষ্কারের ফলে কি করে কৃষির নানা সমস্যার সমাধান ও ব্যবস্থায় উন্নতি হয়েছে তা পরে দেখা যাবে।

প্রথম নবপ্রস্তর সমাজে খাদ্য শুধু সবজি ফল মূল থেকে আসে নি, পালিত পশুও পুষ্টির এক প্রধান অংশ সরবরাহ করেছে, এ বার সে দিকে নজর দেওয়া যেতে পারে।

৩। বনের পশু ঘরে

যেমন কৃষির সূচনা, তেমনি ঠিক কবে কোথায় বন্য পশু প্রথম মানব জীবনের অংশীদার হল তা কোনও দিনই নিশ্চিত জানা যাবে না। তবে অধিকাংশ নজির থেকে মনে হয় এর স্থান কাল চাষেরই অনুরূপ—মধ্যপ্রাচ্যের কোথাও আজ থেকে হাজার দশেক বছর আগে স্থায়ী বাস ব্যবস্থার সূচনায় তা ঘটেছে। কৃষি ও পশু-পালনের মধ্যে কোনটি প্রথম দেখা দিয়েছে তা নিয়ে একদা নানা মুনি নানা মত প্রকাশ করেছেন, যথা সর্বত্রই কৃষির উদ্ভব পালনের আগে, আবার সম্পূর্ণ বিপরীত অভিমত যে শিকার থেকে পালন, তার পর কৃষি। এমন আশ্চর্য কথাও শোনা গিয়েছে যে বন্য জন্তুকে খাদ্য দিয়ে বশ মানাবার উদ্দেশ্যেই শস্যের আবাদ হয়েছে প্রথম।

মধ্যপ্রাচ্যে অপেক্ষাকৃত সম্প্রতি আবিষ্কৃত বিভিন্ন গ্রামের নজির অনুসারে সে অঞ্চলে এই দুই প্রথার আবির্ভাব প্রায় সমপ্রাচীন। পৃথিবীর অন্যত্র বিভিন্ন সম্প্রদায়ে তারা আগে পরে দেখা দিয়ে থাকতে পারে। অথবা কোথাও কৃষির দিকে বেশী ঝোঁক ছিল, কোথাও পালনই প্রধান নির্ভর—আজও কোথাও কোথাও কৃষিজীবী গোষ্ঠীর পালিতপশু কিছু নেই, আবার কোথাও বা যাযাবর দল শুধু পশু চরিয়ে খায়, চাষ বাস জানে না, যেমন দেখা যায় আরবী বেদুইন বা মধ্য এশিয়ার মংগোলীয়দের মধ্যে।

কৃষিরই মত পালন বিদ্যা কয়েক সহস্র বছর ধরে ইতস্তত গড়ে উঠেছে, একের পর এক পশু প্রজাতি মানুষের বশ মেনেছে। ৩০০০ বছর আগে বলগা হরিণের বশীকরণ পর্যন্ত তাদের সংখ্যা অন্তত ২২। অধিকাংশই মানুষের খাদ্য যুগিয়েছে, কিন্তু কেউ কেউ তার মাল বয়েছে, বস্ত্রের লোম দিয়েছে, গাড়ি বা লাঙল টেনেছে, আবার কেউ শুধু খেলার সাথী, আদরের পাত্র; এমন কি পতঙ্গরা দিয়েছে রেশম ও মধু।

কি করে পশুপালনের সূচনা তা এখনও কিছুটা রহস্যাবৃত। পৃথিবীর শেষ তুষার যুগের অবসানে বিদায়ী ম্যামথের পরিবর্তে দেখা দিল যে সব ক্ষুদ্রতর জন্তু

তাদের মধ্যে ছিল পশ্চিম এশিয়ার পাহাড়ী ভেড়া ছাগল, এরাই প্রথম মানুষের বশে এসে হাতের কাছে খাদ্য যুগিয়েছে। বন্য পশু খেতের শস্যের লোভে মানুষের সান্নিধ্যে এসে থাকতে পারে, মানুষ তাকে নিজের খাদ্যে ভাগ বসাতে দেয় নি, কিন্তু তার শস্য-কাটা খেতে চরতে দিয়েছে। এই যারা তার ঘর ও খেত খামারের কাছে সরে এসেছে প্রথম চাষীরা ধরেছে তাদের ছানা। অথবা শিকারীরা কখনও কখনও তাদের কাঁচ বাচ্চা সঙ্গে নিয়ে ফিরেছে মেয়েদের ও শিশুদের অবসর বিনোদনের জন্য, এরা থেকে গিয়েছে ঘরে যেমন আমরা এখন কুকুর বিড়াল পুষি. এমনি করেই পশুপালনের সূচনা হয়তো। পশু মানুষে বন্ধুত্বের সম্পর্ক যে নবপ্রস্তর যুগেই শুরু তা নাও হতে পারে, অনেক আগেই মানুষের ঘরে পশুর প্রবেশ ঘটে থাকা অসম্ভব নয়, হয়তো বহু প্রাচীন কাল থেকেই তাদের বাচ্চা (বিশেষত কুকুরের) তার আদরের বা খেলার বস্তু। এর থেকেই যদি পরে নিয়মিত পালন গড়ে উঠে থাকে তো এ ক্ষেত্রেও বোধহয় মেয়েরাই পথ দেখিয়েছে, তারাই বেশী স্নেহপ্রবণ।

কিন্তু কেউ কেউ বলেন সে কালে আদরের প্রাণী পোষা হয়েছে বলে কোনও নজির নেই এবং বুনো ষাঁড় বা মোষের মত বৃহৎ ও হিংস্র প্রাণী সম্বন্ধে তা কল্পনা করা কঠিন। এ সম্বন্ধে এক অধুনাতন কল্পনা হল যে শিকারীরা যে সব মাদী ভেড়া ছাগল মেরেছে তাদের মাতৃহারা শাবকদের সংগ্রহ করেছে ঘরেই দল গড়ে তুলবে বলে, আরও সহজে মাংস জুটবে তা হলে। এরা অনেকে তখনও দুগ্ধপোষ্য, ঘাস খেতে পারে না, এদের বাঁচিয়ে রাখা এক সমস্যা। নিউ গিনির গণ্ডগ্রামে আজও মেয়েরা বাচ্চা শুয়োরদের বুকের দুধ খাওয়ায়, হয়তো সে কালে প্রথমাগতদের এই উপায়ে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে ঘাস খেতে শেখা পর্যন্ত। অনেকে মরলেও কিছু টিকেছে, মাদীরা যথাকালে প্রসব করল ; তখন আর ভাবনা নেই, শুধু এই বাচ্চারা নয়, শিকারীদের নতুন নতুন ক্ষুদ্র বন্দীরাও তাদের দুধ খেয়ে বড় হয়েছে, এমনি করে গড়ে উঠেছে ভেড়া ছাগলের দল। অবশ্য এমনও হতে পারে যে পূর্ণবয়স্ক জন্তুর পাল তাড়িয়ে এনে শিকারীরা খোঁয়াড়ে বন্দী করেছে। যে ভাবেই হক, ৭০০০ বিসির মধ্যেই মধ্যপ্রাচ্যের অধিকাংশ গ্রাম ভেড়া বা ছাগল অথবা দুইয়েরই সংগ্রহ রাখতে শিখেছে মনে হয়।

প্রকৃত পশুপালনের আগে দূরদর্শী শিকারীরা হয়তো বুদ্ধি করে বেছে বেছে মরদদের মেরেছে, কারণ বনে মাদীদের সংখ্যা কমলে জন্মহার সুতরাং ভবিষ্যতের

খাদ্যও কমবে। তারা বনের গাছ কেটে বা পুড়িয়ে জায়গা পরিষ্কার করেছে যাতে প্রান্তরচর জন্তুরা আকৃষ্ট হয়, তখন তাদের ধরা সহজ হবে। দুটি কারণে ভেড়া ও ছাগলকে পোষ মানিয়ে তাদের গার্হস্থ্য দল গড়ে তোলা সহজ হয়েছিল; তারা দল বেঁধে একটি পালের গোদার অধীনে থাকতে ভালবাসে এবং শাবকরা অতীব মাতৃভক্ত হলেও জন্মের পর মায়ের থেকে দূরে সরিয়ে নিলে অবিলম্বে নির্ভয়ে মানবিক রক্ষকের অনুরক্ত হয়ে পড়ে। তারা যেন পোষ মানতে তৈরি হয়ে ছিল।

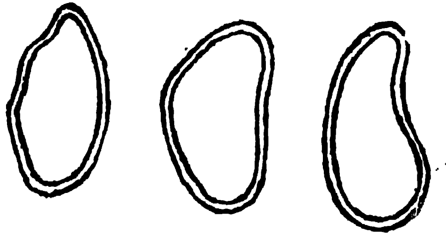
বন্য ও পালিতদের আলাদা করে চেনা সহজ নয়, তবে কি করে প্রথম পালিতরা চিহ্নিত হয়েছে? যেমন আদিতম কৃষিজাত শস্য চিনতে, তেমন এ ক্ষেত্রেও সমস্যার মীমাংসা করেছে বিজ্ঞানীদের গোয়েন্দাগিরি। এই কাজে সবচেয়ে পাকা নজির দিয়েছে অবশ্য প্রাচীন হাড়, তার অভাবে পরোক্ষ চিহ্ন থেকে অনুমান করতে হয়েছে; যথা, সিন্ধু উপত্যকায় ৪,০০০ বছর প্রাচীন ছোট ছোট মূর্তির গায়ে চিত্রিত মুরগী দেখে তাদের ঘরোয়া বলে মনে হয়, প্রাচীনতর নজির আর কোথাও নেই, সুতরাং অনুমান পাখিটি প্রথম সেখানে সে সময়ে পোষা হয়েছে। জার্মোর দেয়ালের মাটিতে যেমন বিলুপ্ত গমের দানা তাদের ছাপটুকু রেখে গিয়েছে, তেমনি পশ্চিম ইরানের এক আদি নবপ্রস্তর বসতিতে প্রায় ১০,০০০ বছর আগে পদচিহ্ন এঁকেছে ভেড়া ছাগল।

ঢিবির নাম গান্‌জ্‌-দারে, ১৯৬৯ সালে ক্যানাডীয় পুরাবিজ্ঞানীরা খুঁড়ে উদ্ধার করলেন এই বসতির ধ্বংসাবশেষ, দেখলেন ঘরের দেয়াল তৈরি হয়েছিল কাঁচা ইট দিয়ে। মধ্যপ্রাচ্যে তা আগেও পাওয়া গিয়েছে, নতুন আবিষ্কার হল ভেড়া বা ছাগলের খুরের স্পষ্ট ছাপ। এই দুটি জন্তুর হাড় মধ্যপ্রাচ্যের প্রাচীনতর গ্রামেও দেখা গিয়েছে, কিন্তু তারা বন্য না পালিত পশুর ফসিল তা অনিশ্চিত। এ ক্ষেত্রে যুক্তি এই যে বুনো ভেড়া ছাগল নিশ্চয় সাহস করে মানুষের এত কাছাকাছি আসে নি, কাদার ইট যখন রোদে শুকানো হচ্ছিল তখন পোষা জন্তুরাই নির্ভয়ে তার উপর পা ফেলে চলাফেরা করেছে।

নবপ্রস্তর কালের উষায় যখন লোকে সবে স্থানে স্থানে স্থায়ী বসবাস আরম্ভ করেছে তখন থেকেই বসতির আবর্জনা স্তূপে যে ভেড়া ও ছাগলের হাড় দেখা যায় তারা পোষা কিনা তা বলা কঠিন হলেও কিছুটা যুক্তিপূর্ণ অনুমান সম্ভব। যথা, যে সব ঘাঁটিতে খুব কচি এবং অতি বৃদ্ধদের অস্থি বেশী সেখানে হয়তো পশুরা বন্য,

কারণ দুর্বলদের শিকার করা অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু যেখানে অধিকাংশ হাড় পূর্ণদেহ জন্তুর সেখানে তারা পালিত হতে পারে—তাদের খাইয়ে লাভ নেই কারণ তারা আর বাড়বে না, সুতরাং গৃহস্থ তাদের কেটে খেয়েছে। ভেড়া ও ছাগলের অতি প্রাচীন পূর্বপুরুষ অভিন্ন, সুতরাং হাড়ের ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ থেকে ধরা কঠিন কোনটা কার; যদি বা তা সম্ভব হয় একেবারে প্রাথমিক স্থায়ী বসতির আবর্জনা থেকে উদ্ধৃত অস্থি বন্য না পালিত প্রাণীর তা চেনা অবশ্য আরও দুরূহ। কিন্তু বিজ্ঞানীদের ভাগ্য ভাল যে গৃহস্থের রক্ষণে এসে অনতিবিলম্বে রক্ষকদের জানিত বা অজানিত নির্বাচনের ফলে এই জন্তুদের দেহের গঠন কোনও কোনও অংশে বদলাতে লাগল, প্রায়ই মানুষের সুবিধার দিকে। প্রাকৃতিক নির্বাচনে দীর্ঘ কাল ধরে ধীরে ধীরে পরিবেশ অনুসারে প্রাণীর পরিবর্তন ঘটে, নতুন প্রজাতিও সৃষ্টি হয়; যেমন, প্রকৃতির মুক্ত প্রাঙ্গণে সঙ্গিনীর জন্য পুরুষদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রকায়রা জোয়ান-দের কাছে লড়াইয়ে হার মানে, সুতরাং ক্ষুদ্র দেহের নির্ধারক বংশকণিকা সন্তানে বেশী বর্তায় না, অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকায়রা বংশ পরম্পরায় প্রধান হয়ে ওঠে। কিন্তু মানুষের অঙ্গনে কৃত্রিম নির্বাচন বা প্রজননের (breeding) ফলে আরও দ্রুত ও অস্বাভাবিক পরিবর্তন দেখা দিল। গতরে ছোট খাটো ভেড়া বশ মানানো সহজ, বাচ্চার জন্য পালক এদেরই মাদী ভেড়া সরবরাহ করবে, বড় ও বেয়াড়াদের কেটে খাবে, বংশানুক্রমে ছোট শান্ত শিষ্ট লেজবিশিষ্টদের পাল গড়ে উঠবে, যদিও তা জীবন সংগ্রামে 'যোগ্যতমের জয়' এই স্বাভাবিক নিয়মের পরিপন্থী। হাড়ের আয়তনে এই পরিবর্তন ভেড়া ছাগল ছাড়াও অনেক ক্ষেত্রে পালিত পশু চিনতে বিজ্ঞানীদের কাজে লাগল। প্রায় ৮৫০০ বছর প্রাচীন এক বুনো ষাঁড়ের পশ্চাৎ পদের একটি হাড় তার প্রায় সমপ্রাচীন পালিত জাতভাইয়ের হাড়টির চেয়ে দ্বিগুণ বড়। জার্মোয় প্রাপ্ত বন্য ও পালিত শূয়োরের চোয়াল খণ্ড পরীক্ষা করে দেখা গেল পালিত জন্তুটির চোয়াল ও মাড়ির দাঁত ক্ষুদ্রতর।

দেহ ও হাড়ের আয়তনে ছাড়া আরও বদল হয়েছে, সব ক্ষেত্রে তার কারণটা ধরা যায় না। যথা, মধ্যপ্রাচ্যে প্রাচীন বুনো ছাগলের শিং ছিল তরোয়ালের মত বাঁকা এবং পাশাপাশি কাটলে দেখা যায় তার শাঁসটা মোটামুটি চতুষ্কোণ; মানুষের বশে এসে শাঁসের আকৃতি বদলাতে লাগল—প্রথমে হল বাদামের মত, তার পর এক পাশ সোজা হয়ে আরও পরে সেই পাশটা ভিতরের দিকে ঢুকে অনেকটা কাজু



চিত্র ৪। পালনের ফলে ইরানে ছাগলের শিঙে পাশাপাশি আকৃতির পরিবর্তন—বাঁয়ে অর্ধবশীকৃত, মধ্যে কয়েক বংশ পালনের পর, ডাইনে আরও পরে।

বাদামের মত দেখতে হল। আরও আশ্চর্য, পুরো শিংটা পাক খেতে খেতে হয়ে গেল কর্কস্ক্রু, এই পাকানো শিং মধ্যপ্রাচ্যে ও অন্যত্র অনেক জাতের ঘরোয়া ছাগলে এখন দেখা যায়। তেমনি ভেড়ার শিঙে সামনের দিকে চ্যাপটা ভাবটা কমে গেল এবং মাদীদের মধ্যে শিংটি সম্পূর্ণ লোপ পাওয়ার ধাত দেখা দিল।

এদের পোষকরা কেন নির্বাচনের প্রয়োগে শিঙের আকৃতি বদলাতে চাইবে তা ভেবে বার করা কঠিন, হয়তো এই পরিবর্তন বংশকণিকার যুগ্ম সূত্রে বাঁধা অন্য কোনও কাম্য বস্তুর সঙ্গে, যেমন দুধ বা পশম, নির্বাচনী প্রজনে যখন এর একটি বাড়ানো হল তখন শিংও পাকাতে আরম্ভ করল। কারণ যাই হক, এ সব অদল বদল পশুপালনের মূল অনুসন্ধানে সহায় হয়েছে। হাড়ের সূক্ষ্ম আভ্যন্তর গঠনেও পরিবর্তন দেখা দিয়েছে যা সমবর্তিত (polarized) আলোতে স্পষ্ট ধরা পড়ে, যেমন ভেড়ার সামনের পায়ের ঊর্ধাস্থির ভিতরে ছোট ছোট ছিদ্রের চেহারায় এবং আকরিক বস্তুর পরিমাণে।

ইরানে পারস্য উপসাগরের কাছে আলি কশ্ নামে এক ঢিবি খুঁড়ে মধ্যপ্রাচ্যে পশুপালনের বিভিন্ন পর্যায় সবচেয়ে সুন্দর উদঘাটিত হয়েছে। অত্যধিক কৃষি ও পশুর বিচরণ এখন জায়গাটাকে পরিণত করেছে নিরস ধু ধু প্রান্তরে, কিন্তু সে কালে তা ছিল সুজলা সুফলা, নদীতে অফুরন্ত মাছ, বুনো হাঁস। এই সব আকর্ষণ যে মানুষকে টেনেছে তার চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া গেল ১৯৬০ দশকে মার্কিন ও ইরানী প্রত্নবিজ্ঞানীদের খননের ফলে, দেখা গেল হয়তো ৭৯৫০ বিসি থেকেই প্রায় ৪০০০ বছর ধরে আলি কশে মানুষের বাস ছিল। নিম্নতম স্তরের অবশিষ্ট বস্তুর নজির

অনুসারে আদিতম বাসিন্দারা প্রায় সম্পূর্ণ শিকারী সংগ্রাহক, রোদে শুকানো মাটির পাটা দিয়ে তৈরি ছোট ছোট চতুষ্কোণ গৃহে বাস করত তারা, আশপাশের আবর্জনা থেকে উদ্ধার হয়েছে বেশ কিছু আধপোড়া বীজ—অধিকাংশই বুনো তরু লতার, তবে কিছু গম ও যবও যাদের আয়তন দেখে সন্দেহ হয় হয়তো বা কৃষিজ।

প্রায় ১০,০০০ বছর আগেই যে এই শিকারী-সংগ্রাহকরা পশুপালনের দিকে এগিয়ে থাকতে পারে তার চিহ্ন মিলল ঘরের বাইরের স্তূপে অন্যান্য হাড়ের মধ্যে এক শৃঙ্গহীন মেষ-করোটি, পালিত ভেড়ীদের এই বৈশিষ্ট্য আমরা একটু আগে লক্ষ্য করেছি। নবীনতর স্তরে মেষ-অস্থি ক্রমশ বেড়েছে, কিন্তু আলোচ্য কালে ছাগ-অস্থি পাওয়া গিয়েছে অনেক বেশী, তা বন্য জন্তুরই অনুরূপ, তবে অধিকাংশই তরুণদের, সুতরাং কোনও রকম বাছাই চলছিল। পালনের আরও নির্ভরযোগ্য ইঙ্গিত এই আবিষ্কার যে চার দিকের মাঠে ছাগল চরে বেড়িয়েছে। বুনো ছাগল পাথর বেয়ে খাড়া পাহাড়ে চড়তে ওস্তাদ, সেখানে শত্রু পৌঁছাতে পারে না, সুতরাং তারা যে আলি কশের কাছাকাছি নিচু জমিতে এসেছে তাতে মনে হয় মানুষ তাদের পাহাড় থেকে ধরে এনে উর্বর বিচরণ ক্ষেত্রে নিজেদের নজরে রেখেছে। খননের উচ্চতর স্তরে পালনের নিঃসংশয় প্রমাণ দেখা দিল, ৬৫০০ বিসি থেকে জঞ্জাল স্তূপে শিং পাওয়া গিয়েছে যাদের শাঁস বাদামাকার হতে আরম্ভ করেছে প্রাথমিক গার্হস্থ্য ছাগে যেমন ঘটে। এর চেয়ে আধুনিক স্তরে শিং ঈষৎ পাকানো এবং প্রায় ৫০০০ বিসি থেকে তারা পুরোপুরি কর্কস্ক্রুর মত যেমন মধ্যপ্রাচ্যে বর্তমানে দেখা যায়।

নবপ্রস্তর গ্রামে গ্রামে পালিত ভেড়া ছাগল ছিল গৃহস্থের পরম ধন। প্রথমত খেতের শস্যের মতই তারা হাতের কাছে মজুদ খাদ্য, মাংস ছাড়াও অস্ত্র উপকরণ বানাতে হাড় ও শিং, পরিধান ও অন্যান্য উদ্দেশ্যে ব্যবহারের লোম এবং চামড়া কাছাকাছি পাওয়া গেল। উপরন্তু তাদের খাওয়াবার সমস্যা ছিল না, চাষী তার সেরা জমিতে বুনত গম যব, মসুর মটরশুঁটি ইত্যাদি, পশুর দল তখন অনুর্বর, খাড়া বা পাথুরে ভূমিতে চরে ঘাস বা ঝোপ ঝাড়ের পাতা খেত, শস্য কাটার পর নেড়া চারাগুলি ও আগাছা খেয়ে খেত সাফ করে দিত, তাদের মল সারের কাজ করত। ছাগল এক আজব জন্তু, যে মাটিতে যা কিছু গজায় তার সবই খায়, তার খাদ্য সমস্যা নেই বলতে গেলে। উদ্ভিদ দেহের কাঠামো যে সেলুলোজবস্তু, দিয়ে তৈরি তা মানুষ হজম করতে পারে না, কিন্তু ভেড়া ছাগল গরু মোষ হরিণ ইত্যাদির জঠরে তার

ব্যবস্থা আছে, সুতরাং তারা যেন অখাদ্য থেকে আহার্য মাংস তৈরির কারখানা। পুরাপ্রস্তর যুগেই অবশ্য শিকারী মানুষ বন্য পশু শাবকদের দেখেছে মায়ের দুধ খেতে, নবপ্রস্তর আমলে ঘরের কাছেই তা লক্ষ্য করে ভাবল এই শিক্ষার সদ্‌ব্যবহার করবে নিজেদের উপকারে লাগিয়ে, মেষ ও ছাগ শাবকদের দুধে তখন থেকে তারা ভাগ বসাল। দুগ্ধদাত্রীকে কেটে খাওয়ার সময় আসবার অনেক আগেই এর থেকে পুষ্টি ও আহার বৈচিত্র্যের এক নতুন ও প্রশস্ত পথ খুলল। পাত্রে দুধ ভরে নিতে শিখে তারা অবিলম্বে দেখল কিছু ক্ষণ থাকলে তা কেটে ছানা হয়, শিখল কি করে এই বস্তুর পচন বন্ধ করে জমিয়ে রাখা যায়। যে সব জায়গায় এ ভাবে সাংবৎসরিক প্রোটিন খাদ্যের ব্যবস্থা হয়েছে সেখানে পালিত পশুর নিধন বা শিকারের প্রয়োজনও কমেছে।

ভেড়া ছাগলের পোষণ পরে এশিয়া, আফ্রিকা ও য়োরোপে ছড়িয়েছে, ইতিমধ্যে মধ্যপ্রাচ্যের গ্রামে তৃতীয় গার্হস্থ্য প্রাণী দেখা দিল শুয়োর, কিছু নজির অনুসারে ৭০০০ বিসিতেই দক্ষিণ তুরস্কের কাইউনু নামক জায়গায়। শুয়োর বাচ্চা ধরে এনে পোষ মানানো সোজা, কিন্তু নবপ্রস্তর আবর্জনা স্তূপে এই জন্তুটির অবশিষ্ট চিহ্ন বেশ বিরল। তার একটা কারণ হয়তো এই যে সহজলভ্য ঘাস পাতা তাদের স্বাভাবিক খাদ্য নয়, সুতরাং ছাগল ভেড়ার মত সুলভে মাংস পাওয়া যায় না তাদের থেকে। তা ছাড়া গ্রামবাসীদের মনে তাদের প্রতি ঘৃণার ভাব জন্মে থাকতে পারে মল ও অন্যান্য নোংরা খেতে দেখে, তাদের থেকে যে মানুষের সংক্রামক রোগ হয় হয়তো তাও সন্দেহ করেছে তারা। মানুষের খাদ্যে শূকর মাংস্য প্রাধান্য পেয়েছে অনেক পরে য়োরোপ ও উত্তর চীনের আদি গ্রামে, সেখানে গৃহপালিত শুয়োর সংলগ্ন বনাঞ্চলে খাদ্য সংগ্রহ করত।

নবপ্রস্তর ঘরে শুয়োরের চেয়ে অনেক বেশী মূল্য ছিল গরুর তবু তাদের পালন আরম্ভ হয়েছে অনেকটা পরে। তার কারণটা সহজবোধ্য, আজকের নিরীহ প্রাণীটি বিলুপ্ত ভয়ংকর অরক্সের (aurochs) বংশধর, এই প্রবল পরাক্রান্ত হিংস্র ষাঁড়টির ঘাড় পর্যন্ত প্রায় দু মিটার উঁচু, মাথায় সুদীর্ঘ তীক্ষ্ণ এক জোড়া শিং, মেজাজটাও মোটেই সুবিধার না। গরুরা কিছুটা ছোট, তবু মানুষের সংসারে তাদের স্থান করা ছাগল ভেড়া ধরে আনার সঙ্গে তুলনীয় নয়।

অরক্স কি করে বশে এসেছে তা কেউ জানে না। এক জল্পনা অনুসারে তারা

শস্য-কাটা খেতে চরে এবং বর্জিত ভুষি খেয়ে খেয়ে মোটা হয়েছে, ফলে ক্রমশ কৃষির উপর তাদের নির্ভরতা বেড়েছে। মতান্তরে গোপালনের সূত্রও শিকারে, শিকারীরা অরকসের দল বিশেষত বাছুরদের তাড়িয়ে জড়ো করেছে চতুর্দিকে ঘেরা উপত্যকায় বা মরুদ্যানে যেখান থেকে পালাবার পথ ছিল না। সাহারার মরুতে পাথরের গায়ে আঁকা ৬০০০ বছর প্রাচীন এক রঙিন ছবিতে এমনি এক বিতাড়নের দৃশ্য দেখা যায়, সাহারা তখন অবশ্য ছিল উর্বর ভূমি। যে করেই হক, ঘরের কাছে বন্দী করার পর বেশী হিংস্র জন্তুগুলিকে সম্ভবত মেরে ফেলা হত, সুতরাং নির্বাচনের কাজ চলেছিল শান্ত স্বভাবের দিকে। পরে আক্রমণাত্মক প্রবৃত্তির অব্যবহারে আজ তাদের প্রকৃতি একেবারে বদলে গিয়েছে, মানুষের উপর এখন সম্পূর্ণ নির্ভরশীল তারা।

কোনও কোনও বিশেষজ্ঞের বিশ্বাস যে মধ্যপ্রাচ্যে শিকার ছাড়া প্রথমে অরকসের ধর্মীয় তাৎপর্য ছিল। সুপরিচিত জন্তুদের মধ্যে সেই সবচেয়ে বলবান, সম্ভ্রমোদ্দীপক ও বিপজ্জনক, সুতরাং সে তেজ ও শক্তির প্রতীক রূপে গৃহীত হয়ে থাকতে পারে, যদিও মৌলিক ধর্মের অধিষ্ঠাত্রী খুব সম্ভবত ছিল জননী দেবী। তুরস্কে প্রাচীন চাটাল হুয়ুক শহরে মন্দিরের দেয়ালে আট সহস্রাধিক বছর আগে গাঁথা হয়েছে পলস্তারার তৈরি সুগঠিত বৃষ মুণ্ড, তার উপর প্রকৃত অরকসের শিং, জননী দেবী ষাঁড়ের জন্ম দিচ্ছে এমন মূর্তিও পাওয়া গিয়েছে। ষাঁড়ের আরাধনা ঐতিহাসিক কালেও মধ্যপ্রাচ্যে নানা অঞ্চলে দেখা যায়— মিশরের এপিস ও ফিনিসীয়দের বাল বৃষ দেব ইরাকের আদি শহরগুলির ধর্মে ঋষভের রূপক তাৎপর্য স্পষ্ট। ভারতে যে গরু ষাঁড় এখনও পবিত্র প্রাণী ('ধর্মের ষাঁড়') তার আদি সূত্রের ইঙ্গিত পাওয়া যায় সিন্ধু সভ্যতায়, যেমন কয়েকটি সীলমোহরের ছবিতে তার গলায় মালা দেখে। কিন্তু এ সব নজির থেকে বলা যায় না জন্তুটি কখন প্রথম পোষ মেনেছে, কবে তার থেকে মানুষ ঘরের কাছে খাদ্য পেয়েছে। চাটাল হুয়ুকের দেয়ালে অধিষ্ঠিত শিংগুলি শিকারে নিহত পশুদের হতে পারে, অথবা হয়তো খোঁয়াড়ে বন্দী অরকস বলি দেওয়া হয়েছে এবং তাদের থেকে সংগৃহীত। পক্ষান্তরে ঐ ঘাঁটিরই আবর্জনা স্তূপে প্রাপ্ত অস্থিগুলি এত ছোট যেন তারা বর্তমান গার্হস্থ্য জাতেরই অবশিষ্টাংশ, তা যদি হয় তো তুরস্কে আজ থেকে ৮৫০০ বছর আগেই জন্তুটির বশীকরণ সম্পন্ন হয়েছে। অবশ্য এও হতে পারে যে ছোট জাতের কোনও বুনো ষাঁড় তখন তুরস্কে

বাস করত।

কোনও কোনও প্রত্নবিজ্ঞানী এখন দাবি করছেন যে গরু প্রথম পোষ মেনেছে তুরস্কে নয়, গ্রীসে সম্ভবত ৮২০০ বছর আগে। সে দেশের উত্তরাংশে ১৯৬০ দশকে নেআ নিকোমেদেইয়া গ্রামে যে হাড় আবিষ্কার হয় তার অধিকাংশ অপরিণত বয়স্কদের, পালিত পশুর পাল থেকে কেটে খাওয়ার জন্য প্রায়ই যেমন বাছাই করা হত। যেখানেই হক, মানুষের বশে এসে এই ভীষণ জন্তুটি দেহে মনে অনেক বদলে গেল, স্বভাব হল শান্ত, কোনও কোনও জাতে শিং ছোট হল অথবা লোপ পেল। আবার যে সব জাত উপকারিতার পরিবর্তে প্রধানত চেহারার খাতিরে গড়ে তোলা হয়েছে তাদের শিং আরও বড় হল। খর্বকায় গরু, নানা রঙের গরু দেখা দিল, কিন্তু সকলের পিতামহ বন্য অরকস বিদায় নিল পৃথিবীর থেকে—শেষ জানিত জন্তুটি ১৬২৭ সালে পোল্যানডে এই জগতের শ্রেষ্ঠ প্রাণী নির্বোধ মানুষের হাতেই প্রাণ দিয়েছে।

তবে য়োরোপীয় জীববিজ্ঞানীদের চতুর ভোজবাজি এই লুপ্ত প্রাণীটিকে আবার ফিরিয়ে এনেছে। তা সম্ভব হয়েছে কারণ কোনও কোনও জাতের আধুনিক গরু ষাঁড়ে এখনও অরকসের বংশকণিকাজনিত কিছুটা বুনো ছাপ বর্তমান, বিজ্ঞানীরা তাদের থেকে এমন গরু ও ষাঁড় বেছে নিলেন যাদের আকৃতি ও প্রকৃতিতে প্রতীয়মান যে তাদের মধ্যে এই সব বংশকণিকার সমষ্টি বিভিন্ন। ফলে তাদের সংযোগে কিছু কিছু বাছুর জন্মাল যাদের দেহকোষে বাপ অথবা মায়ের চেয়েও বেশী অরকস বংশকণিকা উপস্থিত, পরে এদের থেকে স্ত্রী পুরুষ বেছে একই প্রক্রিয়ায় সন্তানে আকাঙ্ক্ষিত কণিকার সংখ্যা আরও বাড়ল, এ ভাবে কয়েক বংশ পর যে জন্তুটি দেখা দিল সে অনেকটা অরকসেরই সামিল, চেহারা ১৭শ শতাব্দীর ছবির মতই (অবশ্য তারও অনেক আগে পুরাপ্রস্তর যুগে য়োরোপে লাস্‌কো ও আল্‌তামিরার গুহা গাত্রে এই বন্য বৃষ ও গাভী চিত্রিত হয়েছে)। নির্বাচনী প্রজনের পথে বর্তমান উদ্ভিদ ও প্রাণীদের নানা প্রকারভেদ সৃষ্টি হচ্ছে, এখানে কৃতিত্ব এই কারণে যে প্রাণীটি বর্তমান নয়। এই পুনর্জাত পশুরা দেহে আদি পূর্বপুরুষের চেয়ে কিছু ছোট, কিন্তু পরাক্রম, ক্ষিপ্রতা ও বদমেজাজে খাটো নয়। গরু কেন মানুষের প্রথম পালিত পশু নয় এই পুনর্গঠিত বলীয়ান বলীবর্দরা তার চাক্ষুষ জবাব।

মেকসিকোর অ্যাজ্‌টেকরা আনুষ্ঠানিক বলি ও মাংসের জন্য যে বেঁটে মোটা নির্লোম পশুটি গড়ে তুলেছিল তার ক্ষুদ্রাকার মূর্তিও বানিয়ে রেখে গিয়েছে। চীনের ছোট্ট কুকুর বসে আছে বাটির মধ্যে। পক্ষান্তরে অ্যাসিরিয়ার প্রাথমিক শহরের রিলিফ ছবিতে দেখা যায় সম্ভ্রান্তবংশীয় বীরপুরুষ ব্যাঘ্রতুল্য বিশাল ডালকুত্তা নিয়ে সিংহ শিকারে বেরিয়েছে, মিশরের উৎকীর্ণ দৃশ্যে ছুটন্ত ছিপছিপে গ্রেহাউন্‌ড জাতীয় কুকুরের দল সজারু ও হাঁস ছাড়াও ক্ষিপ্র হরিণ ও হিংস্র বন্য গবাদি আক্রমণ করছে।

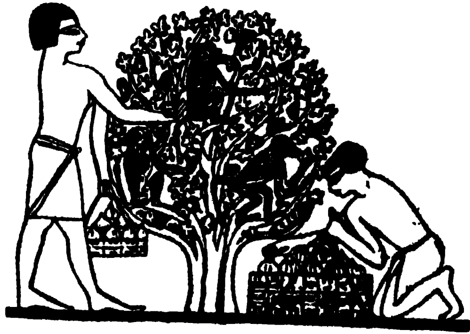
সুতরাং দেখা গেল যে যে প্রাণীটি আজ সভ্য মানুষের ঘরে ঘরে অধিষ্ঠিত, জন্তু জগতে আমাদের সবচেয়ে প্রিয়, তারই প্রথম পালনের স্থান কাল এখনও কিছুটা অনিশ্চিত। সম্ভবত ভেড়া ছাগল গরু শুয়োরের মত তাদেরও জায়গা ছিল মধ্যপ্রাচ্যের আদি গ্রামবাসীদের সংসারে। কিন্তু যেমন কৃষিতে তেমন পশুপোষণেও পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের দান কম নয়। উপরোক্ত প্রাণীরা ছাড়া মানুষ যাদের কাজে লাগিয়েছে তার মধ্যে প্রধান হল ঘোড়া, উট (এক ও দুই কুঁজ যুক্ত), গাধা ও মোষ—শেষেরটি বশ মেনেছে সিন্ধু উপত্যকায় ২৫০০ বিসি নাগাদ, তা ছাড়া আর তিনটি জন্তু বিভিন্ন অঞ্চলে ৩০০০ বিসির কাছাকাছি। ঘোড়া মধ্য এশিয়ায় প্রথম পালিত, যদিও দক্ষিণ-পশ্চিম রাশিয়ায় ইউক্রেইন প্রদেশের দাবিও শোনা যায়। জন্তুটির বন্য পূর্বপুরুষের নাম তারপান, তখন সে আকারে ছোট ছিল, প্রায় বুনো গাধার সমান, পালকদের কৃত্রিম নির্বাচনী উদ্যোগে দেখতে দেখতে ঘোড়া দেহে বাড়ল। মানুষের শ্রম লাঘবে এদের উপকারিতা পরে আলোচিত হবে। এক ও দুই কুঁজের উট যথাক্রমে সৌদি আরব ও দক্ষিণ রাশিয়াতে বশীকৃত হয়েছে প্রধানত মাল ও মানুষ বহনের জন্য, এখনও সেই কাজ করে চলেছে। পালিত গাধার প্রথম চিহ্ন মিলেছে মিশরের নীল নদ উপত্যকায়।

মহাসাগর পার হয়ে ভুট্টার দেশ পেরু পশুপালনের আর একটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র। গিনিপিগ দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে দেখে পেরুবাসীরা তা পুষল প্রধান আমিষ খাদ্য হিসাবে, তার আদিতম চিহ্ন প্রায় ৮০০০ বছর প্রাচীন। উটের ক্ষুদ্রতর আত্মীয় গুআনাকোর প্রজনন করে তারা বানাল লামা ও ২০০০ বছর পরে আলপাকা, তখন থেকে আজও দুইয়েরই মাংস খাওয়া হচ্ছে, কিন্তু বংশবৃদ্ধি ও দেহের বৃদ্ধি মন্থর বলে এখন লামার প্রধান উপকারিতা মাল বহন, আলপাকার উৎকৃষ্ট

পশম। মধ্য আমেরিকা ও তার উত্তরাঞ্চলের বাসিন্দা বাইসন ষাঁড়ের চেয়ে বেশী হিংস্র নয়, কিন্তু তার বশীকরণের চেষ্টা হয় নি।

এখন আদরের প্রাণী বলতে কুকুরের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বিড়ালের কথা মনে হয়। প্রথমটির কিছু কিছু উপকারিতা আমরা আগে লক্ষ্য করেছি, কিন্তু বিড়াল বড়জোর ইঁদুরনাশক, সে কালেও তার বেশী কিছু ছিল না। প্রায় ৫০০০ বছর প্রাচীন মিশরে পালিত মার্জারের আদিতম চিহ্ন পাওয়া যায়, যদিও তা নিঃসন্দেহ নয়। মনে হয় যে সব ছোট জাতের বনবিড়াল আঁস্তাকুড় ও ভাঁড়ারের আশেপাশে ইঁদুরের লোভে ঘোরাঘুরি করেছে গার্হস্থ্য প্রাণীটি তাদেরই বংশধর। ১৪০০ বিসির আগেই সে দেশে মার্জারমুখী দেবীর পূজা হত, সুতরাং বিড়ালের সম্মান ছিল যথেষ্ট; কিন্তু ইঁদুরের প্রধান শত্রু ছিল ঘরোয়া সাপ।

মিশরে বানর পোষাও হয়েছে মনে হয়, ছবিতে বেবুন দেখা যায়—প্রায়ই বাজারে, গলায় দড়ি বাঁধা। বানরের বুদ্ধি বেশী, তারা গাছে চড়তে দক্ষ, তাদের দিয়ে উপযুক্ত কাজ আদায়ও হয়েছে। ৪০০০ বছর প্রাচীন এক সমাধি চিত্রে বেবুনরা ডুমুর গাছে চড়ে ফল পাড়ছে, নিচে মানুষ তা সংগ্রহ করছে, যদিও কেউ কেউ ডুমুর মাটিতে না ফেলে সোজা মুখে পুরছে। সম্ভবত ওজনে হালকা সুতরাং ডাল ভাঙবে না বলে তাদের ফল পাড়া শেখানো হয়েছিল. যে কাজ সাধারণত বামন বা শিশুরা করেছে। ঐ দেশে তাদের দিয়ে কাঠ গাদা করানোও হত। বর্তমান সুমাত্রায় মাকাক জাতীয় বানর নারকেল পাড়ে এবং বছর কয়েক আগে অসট্রেলিয়ায় এক রিসাস বানর ভেড়া চরাতে এবং ট্র্যাক্টার চালাতে শিখেছিল। কুকুর যেমন অন্ধকে চালাতে শেখে তেমনি যুক্তরাষ্ট্রের এক হাসপাতালে সম্প্রতি



চিত্র ৫। মিশরী ছবিতে পোষা বেবুন গাছ থেকে ডুমুর পাড়ছে।

কয়েকটি ছোট কাপুচিন জাতীয় বানরকে পক্ষাঘাতে পঙ্গু ব্যক্তিদের সেবা যত্ন শেখানো হয়েছে। তিন বছর বয়স্ক এক মাদী বানর একটি যুবকের সঙ্গে থাকে, তার ঘাড় থেকে নিচ পর্যন্ত পক্ষাঘাতে আড়ষ্ট; এই সেবিকা ফ্রিজ থেকে খাবারের বাটি বার করে ট্রেতে রেখে চামচে দিয়ে মনিবকে খাওয়ায়, সে যখন চাকাযুক্ত চেয়ারে বসে চলা ফেরা করে তখন তার পথে দরজা খুলে দেয় বাতি নেভায় জ্বালে, ভ্যাকুআম-যন্ত্র দিয়ে ঘরের ধুলো সাফ করে—পরিবর্তে পায় শুধু বাহবা এবং কলার গন্ধযুক্ত প্রিয় খাদ্য।

নিচের সংক্ষিপ্ত তালিকায় এ যাবৎ আদিতম নজির অনুসারে বিশিষ্ট প্রাণীদের পালন কাল ও স্থান সংগৃহীত হল।

প্রাণী	বিসি	দেশ	প্রাণী	বিসি	দেশ
ভেড়া	৮৫০০	ইরাক	ঘোড়া	৩০০০	মধ্য এশিয়া
কুকুর	৮৪০০	যুক্তরাষ্ট্র	মৌমাছি	৩০০০	মিশর
ছাগল	৭৫০০	ইরান	মোষ	২৫০০	সিন্ধু উপত্যকা
শুয়োর	৭০০০	তুরস্ক	চমরী গাই	২৫০০	তিব্বত
গরু	৬৫০০-৬২০০	তুরস্ক, গ্রীস	পাতি হাঁস	২৫০০	মধ্যপ্রাচ্য
রেশম পতঙ্গ	৩৫০০	চীন	মুরগী	২০০০	সিন্ধু উপত্যকা
লামা	৩৫০০	পেরু	হাতি	২০০০	সিন্ধু উপত্যকা
গাধা	৩০০০	মিশর	হাঁস	১৫০০	জার্মেনি
উট	৩০০০	রাশিয়া, সৌদি আরব	বলগা হরিণ	১০০০	সাইবেরিয়া

প্রশ্ন থেকে যায় যে মাংস বা অন্য উদ্দেশ্যে অন্যান্য প্রাণীর পালন হয় নি কেন। যেমন জিরাফ বা জলহস্তী অপেক্ষাকৃত নিরীহ হলেও এ যাবৎ সম্পূর্ণ বন্য। সম্ভবত কোনও কোনও পশুকে বশে আনতে চেষ্টা করে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় নি। মিশরীরা হরিণ ও হায়না পুষতে চেয়ে হার মেনেছে। তিমি, সিন্ধু-ঘোটক ও শুশুক মেধাবী প্রাণী, শোনা যায় সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে গোপনে এই জাতীয় জলচর স্তন্যপায়ীদের বিভিন্ন কাজে শিক্ষা দানের চেষ্টা হয়েছে, এমন কি

ভিয়েৎনামের বন্দরে নাকি অদৃশ্যগামী শুশুক বোমা রেখে এসেছে। এই প্রাণীটির আশ্চর্য বুদ্ধি ও শিক্ষা ক্ষমতা নিয়ে কিছু দিন আগে একটি প্রসিদ্ধ উপন্যাস ও চলচ্চিত্র রচিত হয়েছিল।

কথায় কথায় আমরা সে কাল থেকে এ কালে চলে এসেছি, আমাদের আলোচ্য ছিল পশুপালনের আদি অধ্যায়টি। লক্ষাধিক বছর আগেই শিকারী মানুষ পশুর দেহ থেকে খাদ্য ছাড়াও পেয়েছে শীতের আচ্ছাদন, অস্ত্রের উপকরণ হাড় ও শিং, নবপ্রস্তর যুগে আদায় করেছে রুক্ষ চামড়া বা বাকলের চেয়ে উৎকৃষ্ট আরামদায়ক বস্ত্র ভেড়া ছাগলের লোম। বুনো ভেড়ার গায়ে কিন্তু ছাগলের মত লোমই প্রধান, তার ফাঁকে ফাঁকে আসল পশম লুকিয়ে থাকে সূক্ষ্ম আঁশের মত। পালিত মেষ চর্মে ক্রমশ এগুলি বেড়েছে, যে সব প্রাণীর পশম অপেক্ষাকৃত বেশী তাদের থেকে বংশপরম্পরায় বাচ্চা আদায় করে নিকৃষ্টদের কেটে খাওয়া হয়েছে—এ ভাবে একই প্রাণী যুগিয়েছে অন্ন ও বস্ত্র। অবশ্য পশম শিল্প মেষ পালনের বেশ কিছু পরের কথা, যথাস্থানে তার আলোচনা হবে। এখানে আমরা শুধু লক্ষ্য করছি এই নির্বাচন নীতি প্রয়োগ করে মানুষ অনেক ক্ষেত্রে প্রকৃতির উপর টেক্কা দিয়েছে, যে উপায়ে গরুর দুধ বেড়েছে সেই উপায়ে ভেড়ার পশমও বেড়েছে, খেতের শস্য যেমন উন্নত হয়েছে তেমনি খোঁয়াড়ের পশুও। শতাব্দীর পর শতাব্দী মানুষ কেবল নতুন নতুন প্রাণী বশে আনে নি, পশুর ঘাড়ে নতুন কাজ চাপিয়ে নিজের জীবন সহজ করেছে, যেমন আরও পরে গাড়ি ও লাঙলের সঙ্গে জুতে—তাও পরবর্তী আলোচনার বিষয়। পালিত পশুর বিবিধ সুবিধা বিচিত্র উপকারিতা মানুষের জীবনে ও চিন্তায় যে কত বড় বিপ্লব এনেছিল তা সহজেই অনুমেয়।

আজ কৃষি ও পশুপালন অনেক মার্জিত, অনেক বৈজ্ঞানিক, কিন্তু উন্নতির পথে অগ্রগতি নবপ্রস্তর যুগের প্রথম দিকেই আরম্ভ হয়েছে। এই প্রাথমিক পদক্ষেপগুলি এবার আমরা সংক্ষেপে অনুসরণ করি। সংগ্রাহক থেকে উৎপাদকে পরিণতি এক দিনে হয় নি—আজও তা অসম্পূর্ণ, নদী সমুদ্রে মাছ ধরা আজ প্রকাণ্ড ব্যাবসা, শিকারের আনন্দে এখনও মানুষের রক্ত নেচে ওঠে, অবশ্য আহারের প্রয়োজনে ততটা নয় যতটা বিহারের তাগিদে। কৃষি ও পালন বিদ্যা আয়ত্ত

হওয়ার পর পশু পাখি মাছ শিকার অবশ্য একেবারে বন্ধ হল না, 'দিন আনি দিন খাই' ভাগ্য-নির্ভরতার থেকে মুক্তি পাওয়া যায় নি হঠাৎ। বন্য আমিষ ভক্ষ্যের পাশাপাশি দেখা দিল গার্হস্থ্য মাংস, বীজ বাদাম মিষ্টি আলু ইত্যাদির ভঁাড়ারে প্রথম দিকে অতিরিক্ত যোগ হল শুধু শস্যজাত খাদ্য ও দুধ, পরে ক্রমশ তারাই প্রধান হয়ে দঁাড়াল। নানা নবপ্রস্তর ঘঁাটিতে সংগ্রাহক বৃত্তির চিহ্ন প্রায় সমান লক্ষিত হয় কৃষি ও পশুপোষণের পাশাপাশি। কখনও ফসল ভাল না হলে এই অবস্থায় অবশ্য অনাহার যাতনার আশঙ্কা কমেছে।

প্রথম দিকে এই ধরনের মিশ্র গৃহস্থালিই আমরা আশা করতে পারি। তেমনি এও স্বাভাবিক যে নবপ্রস্তর বিপ্লবের বিবর্তন সর্বত্র একই রাস্তা ধরে চলে নি। এই পার্থক্য যেমন দেখা যায় হাতিয়ারে পাত্রে শিল্পে অলংকারে বা কবর প্রথায় তেমন লক্ষিত হয় আহার্য সংগ্রহে ও উৎপাদনে। পশ্চিম ও মধ্য য়োরোপে, ইউক্রেইন ও পশ্চিম চীনের স্থানে স্থানে অস্থায়ী কৃষি বৃত্তি দেখা যায়, আবার দেশান্তরে, যেমন ক্রীট দ্বীপে, প্রাচীনতম চাষবাসীরা মোটামুটি স্থায়ী। পশ্চিম ও মধ্য য়োরোপের মধ্যে প্রথম দিকে গার্হস্থ্য পশু, শিকার ও শস্য উৎপাদনের বিভিন্ন গুরুত্ব লক্ষ্য করা যায়। বাইবেলে বলেছে (জেনেসিস ৪৬, ৩৪) মিশরীরা পশুপালকদের দু চক্ষে দেখতে পারত না, অবশ্য প্রত্নবৈজ্ঞানিক নজিরের সঙ্গে তা না মিলতে পারে।

সাধারণ ভাবে এই দুই ধারার জন্ম ক্ষেত্র মধ্যপ্রাচ্যে তাদের ক্রমবিকাশ চলল। প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতে নতুন নতুন প্রজাতির বশীকরণ ও নির্বাচনী প্রজনে হয়তো অজানতে তাদের থেকে উন্নত জাত সৃষ্টি ছাড়াও গ্রামবাসীরা নানা সমস্যার মুখে পড়েছে ও তাদের সমাধান করেছে। এই সাফল্যের মূল্য সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে হলে মনে রাখা দরকার যে আজ আমাদের কাছে যা স্বতঃসিদ্ধ বা সহজ, সে কালের হাতে-খড়ি বিদ্যায় তা ছিল সম্পূর্ণ নতুন ও অজ্ঞাত, সুতরাং সামান্য অগ্রগতিও সম্ভব হয়েছে বেশ কিছুটা নজর শক্তি, বুদ্ধি ও যুক্তির প্রয়োগে। পালিত পশুরা কি করে কেবল খাদ্যের খোরাক থেকে শুরু করে নানা দিকে মানুষের সহায়, প্রায় উপকরণ হয়ে দাঁড়াল তা পরে দেখা যাবে, আপাতত প্রথম কৃষকদের সমস্যাগুলির দিকে দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে।

প্রধান সমস্যা মাটি। ভূমির সংরক্ষণ ও যত্ন, সারের ব্যবহার ইত্যাদি প্রথম চাষীরা নিশ্চয় জানত না। তাদের 'খেত', যেমন জার্মোর মত গ্রামের আশেপাশে,

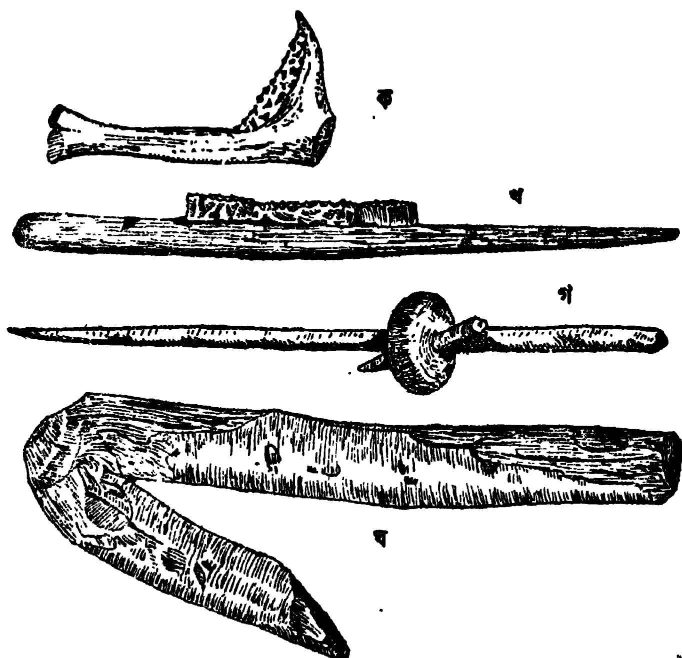
তৈরি হত ঝোপ জঙ্গল সাফ করে. কিছু গাছ কেটে ; এই সব পাতা ডালপালা শুকিয়ে গেলে তা জ্বালিয়ে দিয়েছে চাষীরা, ছাই থেকে উদ্ভিদের আবশ্যিক পুষ্টি পদার্থ নাইট্রোজেন. ফসফরাস. পটাসিয়াম ইত্যাদি জমেছে মাটিতে। তার পর তাদের বন্য পূর্বপুরুষরা কোন দূর অতীত কাল থেকে মাটির নিচে আহার্য মূল ও কন্দ উদ্ধার করতে যে চোখা লাঠি ব্যবহার করেছে তা দিয়ে অল্প একটু খুঁড়ে বীজ বুনত, যেমন অনুন্নত অঞ্চলে কোথাও কোথাও সে দিনও দেখা গিয়েছে। প্রথম ফসল ভাল হয়েছে, কিন্তু তা মাটি থেকে অনেকটা খাদ্য নিয়ে নিয়েছে. সুতরাং পরে দেখতে দেখতে কমেছে ভূমির দান. অবশেষে জীর্ণ শীর্ণ চারায় বেশী কিছু ফলে নি। তখন ঘরের কাছাকাছি নতুন জমি সাফ করে শুরু হত চাষ। অবশেষে গ্রামের কাছে সব জমি ফুরিয়ে গেলে কৃষকরা তাদের পরিবার নিয়ে তলপি তল্পা গুটিয়ে বেরিয়ে পড়ত অন্য দিকে নতুন আবাদী ভূমির খোঁজে। এই রীতির নাম উদ্যান কৃষি, কৃষি বিদ্যা ছড়াতে নিশ্চয় তা কিছুটা সাহায্য করেছে।

মাতা বসুন্ধরার অকারুণ্যের কারণ সে দিনের চাষীরা বুঝতে পারে নি. কেন সে আগে যা দিয়েছে পরে তা দিল না। কিন্তু এ দিকে তাদের অলক্ষ্যে পরিত্যক্ত রিক্ত ভূমি ধীরে ধীরে আবার উর্বর হয়ে উঠছে : গাছপালা গজাল, তাদের ঝরা পাতা ও ডাল পচে রেখে গেল উদ্ভিদের খাদ্য, বাতাস ও বৃষ্টিও বয়ে আনল তার কিছু কিছু, এ ভাবে ক্রমশ বেড়েছে সার-মাটির স্তর অবশেষে ২০-২৫ বছরে কোনও কোনও জায়গায় ঝোপ গাছ বেড়ে জমির চেহারা হয়েছে আবার আগের মত তখন আবার কেটে পুড়িয়ে চাষের উপযুক্ত করে নিলে ভাল ফসল ফলবে। এই 'কাটো ও পোড়াও' পদ্ধতি বা 'অস্থির চাষ' অনুন্নত কৃষী সম্প্রদায়ে আজও দেখা যায়, যেমন মালয়শিয়ার সাবা প্রদেশে।

যথেষ্ট জমি থাকলে তা বেশ চলতে পারে, কিন্তু লোকসংখ্যা বেড়ে গেলে বিপদ, সকলের পেট ভরাতে হলে ভূমি বেশী দিন ফেলে রাখা চলে না। জোর করে তাড়াতাড়ি আবার চাষ আরম্ভ করে সমস্যা বাড়ে, এ কারণে অনেক নবপ্রস্তর গ্রাম শেষ পর্যন্ত পরিত্যক্ত হয়েছে। কিন্তু কোনও কোনও পল্লী কয়েক শতাব্দী স্থায়ী ছিল দেখা যায়, সেটা কি করে সম্ভব হয়ে থাকতে পারে তার কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে সব সম্প্রদায় আধুনিক জগতে নবপ্রস্তর কৃষ্টির স্তরেই রয়েছে তাদের দেখে। পালিত পশুর ও মানুষের মল যে মাঠে পড়লে তার আশেপাশে উর্বরতা

বাড়ে আদি চাষীরা কোথাও কোথাও তা লক্ষ্য করেছে এবং কাজে লাগিয়েছে। ঐ বস্তু কি করে ফসলের পুষ্টি যোগাচ্ছে তা বুঝতে না পারলেও তারাই প্রথম সার আবিষ্কার করল।

কৃষির কাজে এক শ্রেণীর নতুন যন্ত্রপাতির দরকার হয়ে পড়ল। ঘষে শাণ দেওয়া পাথরের তৈরি হাতলযুক্ত কুড়ালের কথা আগে হয়েছে, তা দিয়ে গাছ কেটে চাষের জন্য খোলা জায়গা তৈরি হত। বীজ বোনার মাটি খুঁড়তে প্রাথমিক চোখা লাঠির উন্নতি হল তার গায়ে পাথর জুড়ে ভারী করে, অথবা ব্যবহার হল কোদালের মুখের মত উলটো দিকে বাঁকা ডাল কেটে চেঁছে নিয়ে। তার পর এল পাথর, হাড়



চিত্র ৬। আদি চাষীদের উপকরণ। ক—প্যালেসটাইনে প্রাপ্ত হাড় ও চকমকির তৈরি নাটুফীয় কাস্তে। খ—কাঠ ও চকমকির কাস্তে (ফাইয়ুম, মিশর)। গ—বীজ বোনার আগে মাটি খুঁড়তে দক্ষিণ আফ্রিকার বুশম্যানরা এই ভার-বসানো লাঠি ব্যবহার করে। ঘ—গাছের ডাল থেকে তৈরি আর এক রকম প্রাথমিক কোদাল (কাহুন, মিশর)।

বা শিঙের ফলা যুক্ত কোদাল এবং তারই এক লম্বা বাঁটের সংস্করণ যা মাটি ঢিলে করা, আগাছা উপড়ে ফেলার কাজে লাগত। এই কোদাল অথবা বাঁকা দণ্ড লাঙলের মত মাটির ভিতর দিয়ে টেনে নিয়েছে চাষী। ১৯৫৩-৫৫ সালে ইংল্যানডের কিউ উদ্যানে এই কোদাল দিয়ে প্রাচীন জাতের গম চাষ করা হয়েছিল, দেখা গেল তাতে হালকা মাটিরই কর্ষণ সম্ভব এবং আগাছা দূর করা কঠিন, ফলে চারাগুলি ভাল বাড়ে নি। প্রাচীন খনন দণ্ড থেকে প্রকৃত লাঙল বিবর্তনের আরও বিস্তৃত আলোচনা পরে যথাস্থানে হবে।

কৃষি আবিষ্কারের আগেই বুনো শস্য কাটতে আদিম কাস্তে তৈরি হয়েছে। প্যালেস্টাইনের নাটুফীয়দের মধ্যপ্রস্তর ঘাঁটিতে আবিষ্কার হয়েছে এমন উপকরণ—হাড়ের গায়ে লম্বা খাঁজ কেটে তার মধ্যে আঠা দিয়ে বসানো একের পর এক ছোট ছোট চকমকির ফলা (অণুশিলা), সবটা মিলে যেন করাতের মুখ, শস্যতৃণ-সংশ্লিষ্ট সিলিকার ঘষায় পাথরের গা এখনও চকচকে। নবপ্রস্তর চাষীরা শস্য কাটতে হাড় বা কাঠের সোজা বাঁটে চকমকি পাথরের দাঁত বসিয়ে নিল, পরে কাস্তে অনেকটা আধুনিক রূপ নিয়েছে যখন চোয়ালের বাঁকা হাড় বা তার অনুকরণে কাঠ দিয়ে বাঁট তৈরি হল। কাস্তের আরও এক ধাপ উন্নতি হল কাঠের হাতলে বাঁকা চাঁদের মত করে তৈরি একটি মাত্র চকমকির ফলা জুড়ে, আধুনিক লৌহ যন্ত্রটির সঙ্গে আকৃতিতে তার বিশেষ পার্থক্য নেই। ফলা ও হাতল নিয়ে এক খণ্ডে সম্পূর্ণ কাস্তে পোড়া মাটি দিয়েও তৈরি হয়েছে। শস্য ঘরে এনে তার থেকে খাদ্য প্রস্তুত পর্যন্ত কাজে প্রয়োজনীয় পাত্র উপকরণও পোড়া মাটি, পাথর, কাঠ ইত্যাদি দিয়ে গড়ে নিয়েছে গৃহস্থরা, তা পরে দেখা যাবে।

কৃষিকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিতে প্রকৃতি আবার সাহায্য করল পাউরুটি তৈরির উপযুক্ত গম দিয়ে এই জাতটিই এখনও গমচাষী দেশগুলিতে প্রধানত ফলিত হচ্ছে। পরিচিত যে গম, যব ও ভুট্টা দিয়ে চ্যাপটা গোল রুটি হয়েছে তাদের তুলনায় এই নতুন গমে গ্লুটেন নামক আঠার মত একটি বস্তু অনেক বেশী আছে। তাতে সুবিধা এই যে পাউরুটি তৈরিতে ঈস্ট্ জীবাণুর সৃষ্ট আঙ্গারিক গাসের বুদবুদগুলি বেরিয়ে যেতে পারে না, ময়দার দলাটি ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে তার মাঝে মাঝে ধরা পড়ে থাকে, ফলে পাওয়া যায় হালকা ছিদ্রবহুল এক রুটি যা আজ পাশ্চাত্ত্য জগতের আবশ্যিক খাদ্য।

সে কালের চাষীরা এই উন্নত জাতটি কি করে পেল তা জীববিজ্ঞানীদের গোয়েন্দাগিরিতে ধরা পড়েছে, সেই গল্প অনেকটা ভুট্টার জন্ম কাহিনীরই মত। বিজ্ঞানীরা অনুসন্ধানের সূত্রটি পেলেন কোষ কেন্দ্রে বংশকণিকার বাহক ক্রোমোজোমের সংখ্যায়। যে দুই প্রজাতির বুনো গম দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে কৃষির সূচনা তার মধ্যে এমার এই ইতিহাসের নায়ক, তার কোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা ২৮, কিন্তু পাউরুটির গমে ৪২, যা কোনও বন্য গমে দেখা যায় নি। এই অতিরিক্ত চৌদ্দটি কোথা থেকে আসতে পারে তার খোঁজে অবশেষে সন্দেহ পড়ল একটি তৃণের উপর যা গম নয়—দুইয়ের মধ্যে শুধু মাত্র প্রজাতির ভেদ নয়, গণের (genus) ভেদ। এই উদ্ভিদটির চলতি নাম ছাগমুখী ঘাস কারণ শিষ দেখে ঐ জন্তুটির শিং জোড়া মনে পড়ে, উত্তর ইরান, আফগানিস্থান ইত্যাদি জায়গায় শীতল পার্বত্য ভূমিতে তার বাস। কিন্তু এমার গমের এলাকায় আবহাওয়া আরও মৃদু, শীত কালে বৃষ্টি বেশী, গ্রীষ্ম উষ্ণ ও শুষ্ক। তবু, উদ্ভিদবিজ্ঞানীদের গবেষণা অনুসারে এই দুই বিধর্মী বিদেশীর মিলন হয়েছে যখন কৃষি শিল্প ছড়াতে ছড়াতে উত্তরে ছাগমুখীর স্বাভাবিক ভূমির কাছাকাছি এল। তখন তার বীজ হাওয়ায় উড়ে এসে পড়ল গমের খেতে : তার থেকে গজাল আগাছা, বিজাতীয় সংযোগে ছাগমুখীর থেকে এমার পেল চৌদ্দটি ক্রোমোজোম, সৃষ্টি হল এক বহুমূল্য সংকর (hybrid)।

প্রথম দিকে সম্ভবত সাবেক গমের ফাঁকে ফাঁকে এই নতুন জাতের চারাগুলি ছিল দুর্বল ও স্বল্পায়ু, কিন্তু একদা একটি সতেজ প্রকারভেদ দেখা দিল, গম কাটা হলে তার সঙ্গে এই নবাগত সংকরের বীজও কিছু মিশেছে। পরের বছর এমারের সঙ্গে এই বীজও কিছু অজানতে বোনা হয়েছে, সে বারে আরও বেশী ফলেছে অপরিচিত জাতটি, ক্রমে কোনও কোনও চাষীর নজরে পড়েছে তা, তখন আলাদা জমিতে তারা চাষ করেছে তার। এর প্রেরণা যুগিয়েছে নতুন গমটির এক বিশেষ গুণ, তার দানার খোসা অপেক্ষাকৃত ঢিলে—সাবেক গমের ভুষি ছাড়াতে হত গরম করে অথবা নোড়া দিয়ে পিটিয়ে। সুতরাং নতুন গম রান্না করতে গৃহিণীদের পরিশ্রম বেঁচে গেল, খাওয়ার সময়ে ভুষির গুঁড়ো যে মুখে খোঁচা দেয় না তাও সবাই লক্ষ্য করলে। ছাগমুখীর বংশকণিকার থেকে এই গম আরও পেল আর্দ্র গ্রীষ্ম ও প্রখর শীত সহিষ্ণুতা, ফলে তা ছড়িয়েছে উত্তর ইরান ও তুরস্কে, দক্ষিণ-পশ্চিম য়োরোপ ও দক্ষিণ রাশিয়ায় ও পরে উত্তর য়োরোপ ও মধ্য এশিয়ায়।

তৃতীয় গুণ অবশ্য তা দিয়ে নতুন খাদ্য পাউরুটি বানানো চলে। তার কৌশলটি নিশ্চয় প্রথমে জানা ছিল না—আকস্মিক আবিষ্কার। কি করে তা ঘটল তা কল্পনার বিষয়। এখন পাউরুটি বানাতে ময়দার সঙ্গে পরিমাণ মত ঈস্ট মেশানো হয়, কিন্তু কিছু বুনো ঈস্ট সর্বত্র অদৃশ্য রূপে বাতাসে ভাসছে। হয়তো সে কালে একদা কোনও রাঁধুনী এই গমের গুঁড়ো মেখেছিল রোজকার রুটি বানাবে বলে, তার পর ভুল করে দলাটা ফেলে রেখেছে। তার সঙ্গে মিশেছিল বাতাসের ঈস্ট কিছু, গরম জায়গায় থেকে দু এক দিনে দলাটা ফুলে উঠল। পরে তা দেখে গৃহকর্ত্রী ভাবল হয়তো জিনিসটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে, তবু সেঁকে ফেলল। বিস্ময় আরও বেড়েছে উনন থেকে যখন বার হল হালকা মনোহর পাউরুটি, খেয়ে দেখা গেল মামুলী রুটির চেয়ে তা অনেক সুস্বাদু। এর পরে শিখতে দেরি হল না কি করে মাখা ময়দা আরও তাড়াতাড়ি ফুলিয়ে তোলা যায়; সেঁকার আগে গৃহিণী বুদবুদভরা দলার থেকে বাড়ন্ত ঘন ঈস্ট সহ কিছুটা তুলে রেখে পরের বার ময়দার সঙ্গে তা মেশাল, ঠিক সাঁজা দিয়ে দই পাতার মত। বাজারে ঈস্ট বিক্রি হওয়ার আগে সর্বত্র এই উপায়ে পাউরুটি তৈরি হয়েছে। এখনও বাড়িতে অনেকে তাই করে। পাউরুটির গম এ যাবৎ প্রায় ৬০০০ বিসি প্রাচীন ঘাঁটিতে আবিষ্কার হয়েছে. তারও আগে জন্ম হয়ে থাকতে পারে তার।

গমের মত যবের সংকরণের কোনও নজির নেই. কিন্তু ক্রমশ তারও উন্নতি হয়েছে। আদিম কৃষিজাত যবের ছিল দুই সারি দানা. পরে ছয় সারি হয়ে উৎপাদন অনেক বাড়ল; আগে তার খোসা ছিল শক্ত করে আঁটা, পরবর্তী প্রকারভেদে তা ছাড়ানো অনেক সহজ হল। কয়েক শতাব্দীর চাষে যবের বৈচিত্র্য ও জলবায়ু সহিষ্ণুতা বেড়েছে, এখন উত্তর নরোএ থেকে সাহারার প্রান্ত দেশ পর্যন্ত তা ফলে। মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার কোনও কোনও অঞ্চলে যব এখনও এক প্রধান ফসল, য়োরোপ ও উত্তর আমেরিকায় তা অধিকাংশে ব্যবহার হয় বিয়ার বানাতে।

এই বিয়ারই মানুষের প্রথম মাদক পানীয়। তাও ঈস্ট জীবাণুর দান, তার ক্রিয়ায় সৃষ্টি হয় অ্যালকহল। গম ও যব পেয়ে আদি কৃষিবাসীদের ঘরে নানা নতুন খাদ্য তৈরি হয়েছে; হয়তো শস্য সেঁকে গুঁড়ো করেছে তারা. তার থেকে পিঠে রুটি, অথবা গরম জল বা দুধ মিশিয়ে পরিজের মত কিছু। শুধু জল দিয়ে

ফ্যুটিয়ে হতে পারে পানের উপযুক্ত মাড়. তা পড়ে থাকলে স্বাভাবিক ঈস্টের ক্রিয়ায় গেঁজে গিয়ে হবে মাদক পানীয়। সুতরাং এই আদি মাদকের আবিষ্কার সহজেই হয়েছে, তখন তাও সন্ধিত (fermented) হয়েছে ঘরে ঘরে, আহারের সঙ্গে যব থেকে তৈরি বিয়ার শুধু তৃষ্ণা মেটায় নি, এক অভিনব রঙিন জগতের দুয়ার খুলে দিয়ে মন মাতিয়েছে। আণুবীক্ষণিক অদৃশ্য এক জীব অজ্ঞাতসারে মানুষের সহায় হয়ে এক হাতে দিয়েছে রুটি আর এক হাতে সুরা. যেন বলছে মানুষ শুধু রুটি খেয়ে বাঁচে না। তার ঘরে প্রথম পালিত জীবাণু ঈস্ট, এখন অবশ্য নানা উদ্দেশ্যে ব্যাকৃটিরিয়া. ছত্রাক ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীব কাজে লাগানো হয়. যেমন পেনিসিলিন জাতীয় ওষুধ বানাতে।

ইতিহাসের উষাতেই দেখা যায় মিশর ও ইরাকে বিয়ার তৈরি হচ্ছিল। মিশরী পুরাণে বিয়ারের ক্ষমতা সম্বন্ধে একটি মজার গল্প আছে। সে কালে এক সিংহমুখী মানুষখাকী মেয়ে, নাম সেখমেৎ, মহা উৎপাত আরম্ভ করেছিল—তার বাবা আর কেউ নয়, দেবাদিদেব রা। যদিও তারই প্ররোচনায় সেখমেৎ এই মারণব্রত নিয়েছিল তবু রক্তের নদী যখন বয়ে গেল তখন বাপের মন গলল. কিন্তু মেয়েকে আর থামানো গেল না। অবশেষে অনেক ভেবে উন্মাদিনীকে বশ বানাবার এক বুদ্ধি বার করল রা। তার আদেশে দেবতারা যব ভেঙে বানালে ৭০০০ কলসি বিয়ার, তার পর তার সঙ্গে মেশানো হল এক মাদক মূলের রস। সেই রক্তলাল মিশ্রিত পানীয়টি ঢেলে দেওয়া হল মাটিতে. সেখমেৎ এসে মানুষের রক্ত মনে করে পরমানন্দে তা চেটে চেটে খেলে. তার পর ঝিমিয়ে পড়ল। তখন বাবার ডাকে লক্ষ্মী মেয়ের সে আবার তার কাছে ফিরে গেল। যে বিয়ার শুধু মন মাতায় না, এমন বিপদ থেকে ত্রাণ করে তার প্রতি পক্ষপাতিত্ব স্বাভাবিক।

আজ থেকে ৫০০০ বছর আগেই য়োরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের প্রায় সব সমাজে মদ মদিরা অবশ্য-প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং বিবিধ আচার অনুষ্ঠানে তার ব্যবহারের জন্য নানা আকৃতির ঘট ঘটি গেলাস ছাঁকনি ইত্যাদি গড়া হয়েছে। এখনও পৌরাণিক সমাজে এর মূল্য হয়তো রুটির চেয়ে কম নয়—জ্যাম্বিয়ার অধি-বাসীদের মধ্যে নৃবিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন যে তারা বরং প্রতি বছরই আধপেটা খেয়ে থাকবে, তবু বিয়ারের জন্য নির্দিষ্ট শস্যের গায়ে হাত দেবে না। বর্তমান জগতের যে সব সম্প্রদায় নবপ্রস্তর স্তরেই আছে তাদের সমাজে এমনি কোনও না

কোনও সন্ধিত পানীয়ের ব্যবহার আছে, চাল, মধু, আখ, তাল রস ইত্যাদি কোনও উপযুক্ত স্থানীয় উপাদান থেকে তা তৈরি। মধ্যপ্রাচ্যে মানুষ ৪000 বিসির পরে মদিরাও বানিয়েছে এবং তদুদ্দেশ্যে আঙুর ফলিয়েছে, সুমেরের প্রথম দেবতাদের তোষণে উৎসর্গ করা হত সুরা। প্রসঙ্গ ক্রমে আমরা অবশ্য আমাদের আলোচ্য কাল থেকে অনেক দূরে সরে এসেছি।

জল বিনা মানুষের অবশ্য কোনও দিনই চলে নি, কিন্তু নবপ্রস্তর যুগে এই প্রয়োজন যে অনেক গুণ বেড়ে গিয়েছিল তা সহজেই অনুমেয়। মাটির ঘর বানাতে, পাত্র উপকরণ গড়তে, নিজে খেতে ও ঘরের পশুকে খাওয়াতে, রান্না ও ঘরকন্নার যাবতীয় কাজে তো জল দরকারই. কিন্তু সবচেয়ে বেশী দরকার খেতের তৃষা মেটাতে। আজও সভ্য দেশে দেশে কোন বছর কেমন ফসল হবে তার অনেকটা ভাগ্যের হাতে. কৃষক চেয়ে থাকে আকাশের দিকে, যদিও কৃত্রিম সেচের ব্যবহারে এই নির্ভরতা কমেছে। নবপ্রস্তর চাষীরা প্রথমে অবশ্য সেচ জানত না, কিন্তু তাও তাদেরই আবিষ্কার। এর ফলে জমির উর্বরতা অনেকটা বাড়ল, জনবৃদ্ধির সমস্যা মেটাতে তা খুবই সময়োপযোগী হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে মধ্যপ্রাচ্যের প্রথম চাষী গ্রামগুলি নদী ঝর্ণা ঝোরাকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে, কিন্তু বসুন্ধরার এই অঞ্চল খুব সুজলা নয়, গ্রামের আকৃতি ও লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমস্যা অবশ্য কঠিন হয়ে উঠেছিল।

সেচ আবিষ্কার অনেকটা আকস্মিক। যারা নদী বা ছোট ছোট জলধারার ধারে নিচু জমিতে বাসা বেঁধেছে তারা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছে যে যে সব জায়গা বানের জলে ভিজে যায় সেখানে ফসল ভাল ফলে---যদিও জলের সঙ্গে পলির সারও যে মাটি উর্বর করেছে তা প্রথমে তাদের জানা ছিল না। তখন মাটি কেটে পথ করে তারা জল নিয়ে এল যেখানে যেখানে তা পৌঁছায় না। নদী যদি ছোট হয় তবে হয়তো এ ভাবে জল সরিয়ে নিতে নিতে তা নেমে গিয়েছে খেতের চেয়ে নিচু স্তরে, তখন কিছুটা এগিয়ে স্রোতের মুখে ছোট খাটো বাঁধ তৈরি করে দিলে জল আবার বাড়বে এবং প্রণালীর পথে মাঠে গিয়ে পড়বে। এই ধরনের সহজ সেচ ৫৫00 বিসিতেই কাজে লাগানো হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের এমন এমন জায়গায় যেখানে বৃষ্টি কম বা অনিশ্চিত। উদাহরণ দেখা যায় ইরানে জাগ্রস গিরিমালার নিচে খুজিস্তান এলাকায়, সেখানে প্রাচীন চাষবাসী গ্রামের ধ্বংসাবশেষ পড়ে আছে মজা

নদীর এত দূরে দূরে যে অন্তত প্রাথমিক সেচ ব্যতীত কৃষি সম্ভব হতে পারে না। এই কাজে দক্ষতা বাড়তে বাড়তে গ্রামগুলি ছড়াল টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর দিকে। নবপ্রস্তর চাষীদের পক্ষে খাত কেটে জলের পথ করা কঠিন ছিল না, পাথুরে কোদাল দিয়ে মাটি ঢিলে করে তা ঝুড়িতে তুলে সরিয়ে নিয়েছে গ্রামবাসীরা। এই খাত কাটা বাঁধ তৈরি করা ইত্যাদিতে যে সাম্প্রদায়িক সহযোগিতা দরকার হয়েছে তা ক্রমশ্ বেড়েছে, যথাস্থানে তার আলোচনা হবে।

৪। কাদা পুড়িয়ে পাথর

নবপ্রস্তর বিপ্লবের প্রথম দিকে অন্য যে প্রধান আবিষ্কার মানুষের জীবন অনেক সহজ ও সমৃদ্ধ করেছে তা হল পোড়া মাটির পাত্র। ভূগর্ভে বিস্মৃতির অন্ধকারে নিমজ্জিত সামান্য খোলামকুচি আজ পুরাতত্ত্বের অন্বেষণে মস্ত বড় সহায়। এক খণ্ড ভাণ্ডকে সাক্ষী করে প্রত্নবিৎ গড়ে তোলেন পুরাকালের চিত্র। এই মৃৎশিল্প নব-প্রস্তর সমাজের সাধারণ ও প্রায় সর্বজনীন বৈশিষ্ট্য, যদিও কোথাও কোথাও কৃষি ও পশুপালনের আগেই তা দেখা দিয়েছে, যথা কিনিয়াতে অথবা মধ্যপ্রস্তর ডেনমার্কে। আজ থেকে প্রায় ২৭,০০০ বছর আগে চেকোস্লোভাকিয়ার দল্‌নি ভেস্তোনিৎসে ঘাঁটির অধিবাসীরা ভাণ্ড না বানালেও মাটি পুড়িয়ে শক্ত করার রহস্য শিখেছে, তার সাক্ষী স্বরূপ রয়েছে ছোট ছোট পশু মূর্তি। জাপানে ১০,০০০ বছর প্রাচীন পোড়া মৃন্ময় পাত্র পাওয়া গিয়েছে। পক্ষান্তরে কৃষি ও পালনের পথিকৃৎ জার্মোতে যদিও মনোরম পাথর বাটি গড়া হয়েছে, মৃৎপাত্রের নজির প্রায় নেই, এবং আর এক সুপ্রাচীন ও সুপ্রসিদ্ধ ঘাঁটি জেরিকোতেও দুই সহস্রাধিক বছর পরে তার আবির্ভাব। কৃষিবাসী পেরুতে বেশ কিছু কাল লাউয়ের খোলস পাত্রের কাজ করেছে। এ ধরনের সাক্ষ্য এই সাধারণ ধারণার পরিপন্থী যে কৃষির পরে স্থায়ী গৃহস্থ ঘরে শস্য জমিয়ে রাখবার ও তা রাঁধবার উপযুক্ত ভাণ্ডের তাগিদে মেয়েরা অবিলম্বে মৃৎশিল্প আবিষ্কার করে।

মাটি সর্বত্র আছে হাতের কাছে, তা দিয়ে সস্তায় ও সহজে নানা আকার আকৃতির বস্তু গড়া যায়, যেমন ভাণ্ড শ্রেণীর মধ্যে জল খাওয়ার খুরি থেকে শস্য মজুত রাখবার প্রকাণ্ড জালা পর্যন্ত। পোড়া মাটির আগে রোদে শুকানো কাঁচা মাটির পাত্র ব্যবহার হয়েছে এবং সম্ভবত কখনও কখনও ঝুড়ির গায়েও মাটি লেপে নেওয়া হয়েছে জল ঝরার পথ বন্ধ করতে। ঠিক কবে কোথায় এবং কি করে পাকা মৃৎপাত্রের রহস্যটি মানুষের কাছে প্রথম ধরা পড়ে তা জানা নেই। মাটি পুড়িয়ে পাত্র বানাবার সর্বাগ্র উদ্যোগ মধ্যপ্রাচ্যে কোথাও নির্দিষ্ট করা যায় নি, তবে সাধারণ ভাবে সেই অঞ্চলে তার চিহ্ন মেলে ৭০০০ বিসি নাগাদ।

আবিষ্কারের স্থান কালের চেয়ে কি করে তা ঘটল তাই বেশী আগ্রহজনক। হয়তো কেউ লক্ষ্য করেছে যে মাটির উনন পুড়ে পুড়ে ক্রমশ কঠিন হচ্ছে ; অথবা মাটি-লেপা ঝুড়ি কোনও রকমে রান্নার আগুনে পড়েছে, পাচিকা দেখল মাটির রং ও কাঠিন্যে এক আশ্চর্য অবিশ্বাস্য রূপান্তর। কিনিয়াতে অন্তিম পুরাপ্রস্তর আমলের যে পোড়া মাটির খণ্ড পাওয়া গিয়েছে তা এই রকম সম্ভাবনারই নির্দেশ দেয়, খণ্ডগুলির গায়ে ঝুড়ির বোনা দাগ স্পষ্ট। এই ধরনের আকস্মিক আবিষ্কার লোক মুখে সহজেই ছড়াবে, আবার একাধিক ক্ষেত্রে স্বাধীন ভাবে ঘটে থাকাও স্বাভাবিক —আমেরিকা মহাদেশে তা প্রায় সুনিশ্চিত।

মৃত্তিকা শিল্প শিখে মানুষের সুখ সুবিধা ও আনন্দ আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। এর আগে কাঁচা মাটির পাত্র ব্যবহার করতে গিয়ে সে নানা অসুবিধা ভোগ করেছে—তা সহজে ফেটে বা ভেঙে যায়, জল লাগলে গলে যায়, গরম করলে টেকে না। কিন্তু পোড়া ভাণ্ড অত সহজে ভাঙে না, ফাটলেও এই সস্তা বস্তু ফেলে দেওয়া চলে। গম ও যবজাত খাদ্য প্রস্তুত করতে এমন পাত্রের প্রয়োজনীয়তা বেড়েছিল যাতে তরল জিনিস রাখা যায়। পোড়া মাটির ভাণ্ডে রান্না করা, তা মেজে পরিষ্কার করা চলত। তাতে খাদ্য ঢেকে রাখলে তা মাছি ও অন্যান্য পোকার থেকে নিরাপদ, ঝুড়িতে শস্য জমা রাখলে ইঁদুর তা কেটে ফেলতে পারে, কিন্তু তার দাঁত হাঁড়ি কলসি ফুটো করতে অক্ষম। সব দিক দিয়ে পরিচ্ছন্নতা অনেক বাড়ল। মাটির বাসন পত্র থেকে লোকে যে সুখ সুবিধা পেয়েছে তার জন্য মৃৎ-শিল্পীদের প্রতি বিস্ময়মিশ্রিত সম্ভ্রমও স্বাভাবিক, হয়তো তারই চিহ্ন আমরা দেখতে পাই কয়েক হাজার বছর পরে আদি ঐতিহাসিক কালের আচার ঐতিহ্যে। মিশরে সব কিছুর স্রষ্টা খ্‌নুম দেব ছিল কুমোর, মেসোপটেমিয়ার আরুরু দেবী মানুষ বানিয়েছে মাটি থেকে। তার সঙ্গে মেলে বাইবেলের উক্তি "আমরা মাটি, তুমি কুম্ভকার"।

প্রথম আবিষ্কারের সময় থেকে মাটির রূপান্তরও অলৌকিক মনে হয়েছে। এ যেন যাদু বলে কাদার থেকে পাথর সৃষ্টি। যাদুর ধারণা আরও দৃঢ় হল ঐ ম্যাটমেটে কালো রং আগুনের ছোঁয়ায় কেমন তারই মত লোহিতাভ হয়ে উঠল তা দেখে। সে কালের ভাবুক লোকের মনে এর থেকে হয়তো দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক প্রশ্নও জেগেছে বস্তুর রূপ ভেদ ও স্বীয় চরিত্র সম্বন্ধে। এই রূপান্তরে ও পোড়া

মাটির সামগ্রী সৃজনে আছে প্রকৃত বিজ্ঞানের ক্রিয়া, যদিও তার রাসায়নিক মূলনীতি আমরা শিখেছি বহু হাজার বছর পরে। মাটি নানা রকম, কুমোরের পছন্দ আঠালো মাটি, তা প্রধানত হল অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট এবং তার সঙ্গে সংযুক্ত জল (কেলাস জল)। অতিরিক্ত জল মিশিয়ে কাদা বানিয়ে এই পদার্থটিকে যেমন খুশি রূপ দেওয়া চলে। আবার গরম করলে ৪৫০ ও ৭০০ ডিগ্রি সেনটিগ্রেডের মধ্যে যুক্ত জল বেরিয়ে গিয়ে এক কঠিন বস্তুর সৃষ্টি হয়, ৬০০ ডিগ্রির কাছাকাছি তাপ তুলতে পারলে মাটি ঘন হয়, তার ছিদ্র বন্ধ হয়, তাতে জিনিসটির উৎকর্ষ বাড়ে।

প্রাচীন কুম্ভকাররা এত গূঢ় তথ্য না জানলেও অভিজ্ঞতার থেকে তারা নানা কলা কৌশল শিখেছে। মাটির খেলনা বা পুতুলের তুলনায় পাত্র বানাতে অনেক বেশী জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োজন। তা অর্জন করতে হয়েছে বহু ব্যর্থ চেষ্টা ও পরীক্ষার পাঠশালায়। প্রথম কথা, দেখা গেল ভিজে পাত্রটি সরাসরি চুলায় রাখলে তা ফেটে চৌচির হয়, আগে ধীরে ধীরে রোদে শুকিয়ে নিলে ফাটে না। খড় বা অন্যান্য উদ্ভিজ্জ বস্তু অথবা বালি, পাথর কণা মিশিয়ে নিলেও যে ফাটার আশঙ্কা কমে, উপযুক্ত মাটি বেছে নিয়ে তা ভাল করে ধুয়ে এবং মিশিয়ে না নিলে যে রুক্ষ ভঙ্গুর পাত্র সৃষ্টি হয় তাও ক্রমশ শিখেছে কর্মীরা। প্রথমে অবশ্য খোলা আগুনে পাত্র পোড়ানো হয়েছে কিন্তু বুঝতে দেরি হয় নি যে ঢাকা চুলায় বস্তুটি আরও শক্ত ও উৎকৃষ্ট হয়—তার কারণ অবশ্য ভিতরে হাওয়ার তাপ-সাম্য। প্রায়ই আগুন জ্বালা হয়েছে ছোট গাছপালা দিয়ে, তার পর তা বাঁচিয়ে রাখতে ঘাস বা গোবর ফেলা হয়েছে—কোনও কোনও প্রাচীন সমাজে এই পদ্ধতি এখনও চলে।

পাত্রের সর্বাঙ্গীণ সমতা এক আবশ্যিক বৈশিষ্ট্য, কুমোরের চাকে তা বজায় রাখা অনেক সহজ, কিন্তু তা আবিষ্কার হতে প্রায় ৪০০০ বছর কেটে গেল। তার আগে দুখানি হাতের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর, ঘট ঘটি বাটির বিকৃতি এড়িয়ে বিভিন্ন অংশে সমতা অক্ষুণ্ণ রাখা নিশ্চয় সহজ হয় নি। অবশ্য প্রথম দিকে লক্ষ্য ছিল কার্যকারিতা। পরে ক্রমশ সৌন্দর্যের মূল্যবোধ জাগল, তখন কাজটা হল কারুশিল্প। মাটির ছোট খাটো উপাদান অনেকাংশে বস্তুর গুণ ও রূপ নির্ধারণ করে, সুতরাং জানতে হয়েছে তার কোন অংশ বেছে বাদ দিলে বা তাতে নতুন কোন পদার্থ যোগ করলে কাজ সহজ হয়, জিনিস ভাল হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর মাটি থেকে তৈরি পাত্রের রং পৃথক হতে পারে। বাইরের ঘরোয়া উপাদান মিশিয়েও নতুন রং আনা যায়,

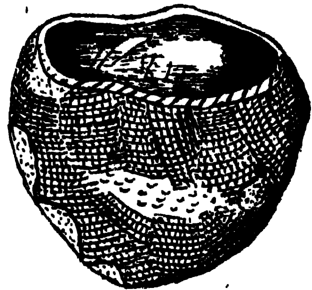
যেমন পশুর মল বা ছাই থেকে মনোরম ধূসর বর্ণ। তা ছাড়া আগুন জ্বালতে কি জ্বালানি ব্যবহার হল, তার সঙ্গে বাতাস কতটা মিশল, তাপ কতটা উঠল ইত্যাদিরও প্রভাব আছে রঙের উপর, যথা বাতাস বাড়িয়ে লাল, তা প্রায় বন্ধ করে কালো। লাল রং আরও আনা যায় এমন মাটি দিয়ে পাত্র গড়ে যাতে লোহাযুক্ত পদার্থের অনুপাত বেশী অথবা সাধারণ মাটির পাত্রে পোড়াবার আগে তা মাখিয়ে নিয়ে। বিভিন্ন মাটি গুলে এই উপায়ে নানা রঙের নকশা ও ছবিও ফুটিয়ে তোলা যায় পোড়া পাত্রের গায়ে। এ সব কাজে বেশ কিছুটা শিল্প প্রবৃত্তি ও কল্পনা দৃষ্টির সহযোগ দরকার. কারণ চিত্রিত পাত্রের চেহারা পোড়াবার আগে ও পরে সম্পূর্ণ আলাদা, সৃষ্টি কালে শিল্পীকে মানস চক্ষে দেখতে হয়েছে পরবর্তী রূপটি। অবশ্য পোড়া পাত্রটিকেও রং দিয়ে অলংকৃত করা যায়. প্রথমে রঙিন গেরিমাটির এলোমেলো ছোপে তার শুরু হয়েছে, ক্রমে দেখা দিয়েছে .মনোরম নকশা ও ছবি। আদিতম প্রাকৃতিক দৃশ্যের এক নমুনা দেখা যায় ইরাকের টেপে গাউরা ঘাঁটিতে উদ্ধৃত এক কলসির গায়ে, পাহাড় নদী (সম্ভবত ইউফ্রেটিস) ও পালিত পশু রূপায়িত এই দৃশ্যে। পাত্রের গঠনে ও বর্ণ বৈচিত্র্যে সর্বাঙ্গীণ উন্নতি অবশ্য লক্ষিত হয় চাক আবিষ্কারের পর মিশর, মেসোপটেমিয়া ও সিন্ধু তীরের আদি ঐতিহাসিক শহরগুলিতে।

গঠন যথার্থ না হলে বর্ণ বৈচিত্র সত্ত্বেও পাত্রের সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য সম্পূর্ণ হয় না, ঘট ঘটি সব মাটি হয়ে যায়, আবার আকৃতিতে মৌলিক কল্পনার খেলা দেখিয়ে ম্যাটমেটে ঘটকেও চিত্তাকর্ষক করে তোলা যায়। আদি ঐতিহাসিক চীনের ঘট আজ লাখ লাখ টাকায় কেনা বেচা হয়, তাদের প্রধান আকর্ষণ গঠন সৌন্দর্য। শুধু মাটির নয়, অন্যান্য পাত্রেও সমতা ও পরিপ্রেক্ষিতের প্রতি দৃষ্টি রেখে নব নব রূপ সৃষ্টি আজ এক মস্ত শিল্প, তার জন্য বহু যন্ত্র উপকরণও আছে। সেই সাবেক দিনে মানুষকে প্রধানত নিজের হাতের উপর নির্ভর করতে হলেও তারই মধ্যে মাথা খাটিয়ে সে কাজ সহজ করে নিয়েছে। ছোট খাটো অথবা চ্যাপটা ধরনের পাত্র অবশ্য হাতে অনায়াসে গড়া যায়, কখনও বা কুম্ভকার আগে লাউয়ের অর্ধাংশের বা ঝুড়ির গায়ে কাদা লেপে শুকিয়ে নিয়েছে, পরে পোড়াবার আগে ভিতরের বস্তুটি বার করে ফেলেছে। কিন্তু ঘটি বা কলসি জাতীয় আধার গড়া এত সহজ হয় নি, সে ক্ষেত্রে নিচের অংশটি ঐ উপায়ে বানিয়ে নিয়ে সরু করে টানা কাদা তার উপর

পাকিয়ে পাকিয়ে বসিয়েছে, অথবা সরু সরু কানা আলাদা তৈরি করে একের পর এক জুড়েছে।

কাজটি খুব সহজ নয়, কারণ কানাগুলির পরিধি ক্রমশ ছোট হবে, প্রত্যেকটি ঠিক মাপ মত বানাতে হয়েছে, সেগুলি বসাবার আগে খেয়াল রাখা দরকার যেন শুকিয়ে না যায়, পরে অপেক্ষা করা যাতে কিছুটা শুকিয়ে নিচের অংশকে ভাল করে ধরে। এমনি করে ধাপে ধাপে কাজ এগিয়েছে, হয়তো কয়েক দিন কেটে গিয়েছে একটি ঘটি সম্পূর্ণ করতে। তার পর পোড়াবার আগে পাত্র শুকিয়ে কুম্ভকার তার গা চেঁছে মসৃণ করেছে এবং প্রায়ই নুড়ি জাতীয় গোল কিছু অথবা বালি দিয়ে ঘষে পালিশ এনেছে যাতে সূক্ষ্ম ছিদ্র কমে যায়, কখনও বা মিহি মাটি জলে মিশিয়ে লেপে দিয়েছে গায়ে, পুড়ে শক্ত ও মসৃণ হয়েছে তা। এত যত্ন ও ধৈর্যের কাজ সম্ভবত প্রথম দিকে মেয়েদের হাতে ছিল, তাদের আঙুলের ছাপও পাওয়া গিয়েছে আদিতম কিছু মৃৎপাত্রের গায়ে। হয়তো ঘরের গৃহিণীরা ময়দার দলা থেকে যেমন রুটি বানিয়েছে, তেমনি সুদক্ষ হাতে বাড়ির উঠনে কাদারও রূপ দিয়েছে, শুধু চাক ছাড়া প্রয়োজনীয় সব উপকরণ তাদের রান্না ঘরেই ছিল—শস্য বা রুটি সেঁকার চুলা কাঠের বেলুন, পাথরের ছুরি, লেপনের জন্য হাড়ের চওড়া পাত। পরে শিল্পটি পুরুষ কুম্ভকার শ্রেণীর হাতে গিয়েছে, যেমন এখন তারাই চাক চালায়।

মৃৎশিল্পের আগে কিছু বানাতে প্রধান উপাদান ছিল পাথর হাড় কাঠ। এই সব কঠিন পদার্থ কষ্ট করে কেটে ঘষে প্রয়োজন মেটাতে হয়েছে। কিন্তু এক তাল কাদার থেকে নমনীয় আর কি হতে পারে—তা মানুষের সম্পূর্ণ অধীন। অথচ এমন জিনিস হাতে পেয়ে সে নতুন পরীক্ষা ও উদভাবনের খেয়ালে মেতে ওঠেনি, প্রাথমিক পাত্রগুলিতে আমরা দেখি পূর্ববর্তী কোনও আধারের স্পষ্ট ছাপ—এখানে ছাপ শব্দটি প্রায় আক্ষরিক অর্থে ব্যবহার করা চলে। এর আগে মানুষ পশু দেহের স্থলী বা চামড়া, লাউয়ের খোসা, ঝুড়ি এবং নিজেরই খুলি ব্যবহার করেছে জিনিস রাখতে, প্রথম দিকের অনেক মৃৎপাত্রে



চিত্র ৭। কিনিয়াতে প্রাপ্ত মৃৎপাত্র, গায়ে ঝুড়ির অনুকরণে দাগ কাটা।

এদের কোনও কোনওটির আকৃতির অনুকরণ দেখা যায়, তলাটা সর্বদাই গোল, এমন কি সাদৃশ্য বোঝাতে কখনও কখনও পাত্রের গায়ে চামড়ার সেলাই বা ঝুড়ির বোনা-নকশা এঁকে বা খুদে দেওয়া হয়েছে, যেমন কিনিয়াতে। মৃৎপাত্রের কানার ঠিক নিচে তা ঘিরে খোদাই করা বিন্দুর সারি. দেখে মনে হয় চামড়ার থলির মুখ বন্ধ করতে যে তা ঘিরে ফুটো করে তার মধ্যে সরু চামড়ার ফালি পরানো হত, এ যেন সেই ছিদ্রগুলির অনুকরণ। মেয়েরা স্বভাবত সনাতন ও প্রচলিতের অনুসরণ করে বলে এর থেকেও সন্দেহ হয় যে প্রথম দিকে মাটির কাজ তারাই করেছে। আজ আমরা অনেক আধুনিক তৈরী জিনিসের পরিকল্পনায় পুরনোর ছাপ দেখতে পাই, কিন্তু তা ফ্যাশানের তাগিদে বা শিল্পীর খেয়ালে স্বেচ্ছায় ধার করা। প্রথম মৃৎকর্মীরা পরিচিতের অনুকরণ করেছে তার বাইরে কিছু ভাবতে পারে নি বলে। কিন্তু ক্রমে নানা নবপ্রস্তর সমাজে ঘটশিল্পীদের কল্পনা পাখা মেলেছে, মুক্তি পেয়েছে অভিনব দৃষ্টিসুখকর আকার আকৃতিতে অথবা পশু বা মানুষ দেহের অনুকরণে। পেরুবাসীরা যে তাদের ফলিত চিনেবাদাম. আলু ইত্যাদির আকারে ঘট বানিয়েছে তা আমরা আগে দেখেছি, এই সব ফসলের গায়ে মানুষ বা জন্তুর মুখ ও অবয়বও গড়ে তোলা হয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব য়োরোপের এক পৃথুলা উলঙ্গ নারী মূর্তির ভিতরটা ফাঁপা, হাত দুটি হাতল, গলাটি ঘটের মুখ। কৌতুক-রসিক শিল্পীরা অদ্ভুত জন্তুর আকারে ভাণ্ড গড়েছে, কোথাও ঢাকনাটি এক পেঁচার গুরুগম্ভীর বদন। পাত্র গড়নে অভিনব উদভাবনের এই ধারা আজও অব্যাহত।

মধ্যপ্রাচ্যের আদিতম ঘাঁটিগুলির মধ্যে সিয়াল্‌কের (ইরান) নিম্নতম স্তরেই চিত্রিত মৃৎপাত্র লক্ষিত হয়। কিন্তু তৎপরবর্তী কালে প্রায়ই রঙের ব্যবহার দেখা যায় ইরাকে এবং বিশেষ করে ইরানে—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এক রঙের নকশা, কখনও দুই কি তারও বেশী। চিত্রণ-কৌশল ও তার আনুষঙ্গিক উন্নত চুলার আবিষ্কার উত্তর ইরান, ইরাক ও সিরিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে ঘটে থাকতে পারে, কিন্তু পরে পারস্য উপসাগর সরে যাওয়ার ফলে দক্ষিণ ইরাক বাসযোগ্য হলে ঘটশিল্পীরা নিচে নেমে এসেছিল। এই ঐতিহ্যের প্রসার উত্তরে তুর্কিস্থান, পুবে ইরানের ভিতর দিয়ে বেলুচিস্থান পর্যন্ত অনুসরণ করা চলে। এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বিবিধ সাক্ষ্যের তুলনা-মূলক বিচারের ফলে দুটি প্রথাগত বিভাগ লক্ষিত হয়েছে: দক্ষিণাঞ্চলে রঙিন আলপনা কাটা হয়েছে প্রধানত হলুদ ধরনের জমির উপর, উত্তরে লাল জমির উপর।

প্রত্নবিজ্ঞানীরা সন্দেহ করেন যে অনেক ক্ষেত্রে পাত্রের গায়ে অঙ্কনের উদ্দেশ্য শুধু সৌন্দর্য বৃদ্ধি নয়, তাদের সাংকেতিক অথবা ধর্মীয় তাৎপর্য ছিল। তার আলোচনা পরে হবে, কিন্তু সে কালের শিল্পীর উদ্দেশ্য যাই থাক, এ কালের বিজ্ঞানীরা নকশা ও তাদের রং নিজেদের কাজে লাগিয়েছেন ; যেমন পুরাপ্রস্তর যুগের পাথুরে অস্ত্র, তেমনি নবপ্রস্তর পাত্রশিল্পের রং ও নকশার বিশেষত্ব আজ এক জটিল শাস্ত্র সৃষ্টি করেছে। সাধারণের চোখে তা নিরস সন্দেহ নেই, তবে এর সূত্র ধরে সে কালের জীবন সম্বন্ধে নানা তথ্য জানা যায়, বিশেষ করে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের চলা ফেরা ও গতিবিধি সম্বন্ধে অনেক খবর মেলে, যেমন ইরানী আলপনা হঠাৎ সিন্ধু তীরের মাটির থেকে উদঘাটিত হয়ে নির্দেশ দিতে পারে যে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যের যোগ ছিল। বস্তুত সিন্ধুবাসীদের সীলমোহর পাওয়া গিয়েছে সুমেরী মাটির স্তরে যার বয়স আমাদের জানা সুমেরের সঙ্গে এই বাণিজ্যিক সম্পর্ক সিন্ধু সভ্যতার প্রাচীনতা নির্ণয়ে সাহায্য করেছে। দেশে দেশে কোন রাস্তায় ব্যাপারীরা যাতায়াত করত তার ইঙ্গিত দেয় পথে বিবর্জিত ভাণ্ডের খণ্ড। বিশিষ্ট রং ও নকশা পরিচয় পত্রের কাজ করে মামুলী ভগ্নাংশ এত খবর সরবরাহ করতে পারে না। শিল্পী যখন আপন খেয়ালে তুলি চালিয়েছে তখন সে যে তার দু দিনের ব্যবহার্যের গায়ে ইতিহাসের স্বাক্ষর রাখছে তা তার দুরন্ততম কল্পনারও বাইরে ছিল।

কাদা দলে মৃৎশিল্পীরা শুধু পাত্র নয়, অসংখ্য খেলনা, ছোট ছোট পুতুল ও আরও অনেক কিছুর মূর্তি দিয়েছে। আগে যা সব তৈরি হয়েছে পাথর হাড় শিং বা কাঠ কেটে, মাটির মত নরম নমনীয় বস্তু হাতে পেয়ে তা বানাতে ভাস্কর তার খেয়াল খুশি চরিতার্থ করবার চরম স্বাধীনতা লাভ করল, তার কল্পনার সীমা পরিকল্পনার সম্ভাবনা পূর্ণ প্রসারিত হল। আদিম কালের জননী দেবী ছাড়াও তারা মাটি পুড়িয়ে গড়েছে মানুষ ও পশু পাখির মূর্তি, ক্ষুদ্রাকার যান বাহন, ঘর বাড়ি, আরও কত কি। ব্যবহারিক দ্রব্যের মধ্যে প্রদীপ, ছাঁচ এবং যেখানে পাথর দুষ্প্রাপ্য সেখানে কাস্তে কোদাল পর্যন্ত। নবপ্রস্তর আমলে পশ্চিম এশিয়ার লোক মাটির বাড়িতে বাস করত, তার ছাত সমতল ; চেকোস্লোভাকিয়ায় কোন এক অজ্ঞাত কুমোর ক্ষুদ্র একটি গৃহ গড়ে হয়তো ছেলেকে খেলতে দিয়েছিল, দেখে বোঝা যায় সেখানে বাড়ি তৈরি হত কাঠ দিয়ে, তার ছাত মাঝখানে উঁচু, দু দিকে ঢালু ; য়োরোপীয় জলবায়ুর উপযুক্ত এই ধরনটা এখনও চলতি। মহেনজোদারো ও

সিন্ধু উপত্যকার অন্যান্য শহরে উদঘাটিত হয়েছে নানা অভিনব খেলনা, যথা ঘটির আকারে তৈরি পোকার খাঁচা, খেলার ঘুঁটি, দুঁ পাশে চাকা লাগানো ভেড়া, মাথা নাড়তে পারে এমন ষাঁড় এবং জোড়া বলদ যুক্ত কলসি চাপানো সুন্দর একটি মৃচ্ছকটিক, অর্থাৎ ক্ষুদ্র মৃন্ময় শকট ; নিশ্চয় তার বৃহত্তর সংস্করণ তখন কাজে ব্যবহার হয়েছে, প্রায় অনুরূপ গাড়ি আজও চলে ঐ অঞ্চলে। কিন্তু সম্ভবত কেবল অবসর বিনোদনে বা শিশুদের মনোরঞ্জনে দেশে দেশে মৃৎশিল্পীরা এত সব 'অকাজের' জিনিস বানায় নি কোনও কোনও মূর্তির গুরুতর আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য ছিল হয়তো।

অবশ্য নিঃসন্দেহে সবচেয়ে কাজে লেগেছে এই নতুন উপাদানে গঠিত ছোট বড় ঘট ঘটি বাটি থালা রেকাবি হাতা ইত্যাদি। নতুন সম্পদ শস্য জমিয়ে রাখতে এবং প্রতি দিন তা থেকে নানা খাদ্য পাকে দরকার হয়েছে বিভিন্ন আকারের মৃন্ময় পাত্র ও উপকরণ ; যেমন চ্যাপটা নৌকার মত একটি বস্তুর মধ্য স্থলে পর পর পাঁজর তোলা, সম্ভবত শস্যের দানা ঘষে খোসা ছাড়ানো হয়েছে তাতে। নিশ্চয় খেতে খোঁয়াড়েও বিবিধ উদ্দেশ্যে প্রয়োগ ছিল এই নবলব্ধ শিল্পের। পোড়া মাটির আধারের পাশাপাশি পাথরের পাত্র, চামড়ার থলি ছাড়াও তখন ব্যবহার হয়েছে নানা উদ্ভিজ্জ বস্তু থেকে বোনা ঝুড়ি, ডালা ইত্যাদি। কিন্তু ঝুড়ি বা থলি তরল পদার্থ রাখবার উপযুক্ত নয়. মাটির ঘটি কলসিতে জল ঠাণ্ডাও থাকত ভাল।

তা বলে মৃত্তিকা শিল্প আয়ত্ত করে মানুষ তার চিরপরিচিত পাথর অবজ্ঞা করে নি, যদিও ক্রমশ সাবেক কঠিন উপাদানের স্থান অনেকটা দখল করেছে মাটি। মৃৎপাত্র অনেক বেশী ভঙ্গুর, নবপ্রস্তর সমাজের স্থিতিশীল জীবনেই সম্ভব তার ব্যাপক ব্যবহার। জার্মোর ঘাঁটিতে অন্তিম পর্বের গ্রামে ছাড়া মৃৎপাত্রের চিহ্ন দেখা যায় না, কিন্তু প্রথম দিকেই চুনাপাথরের চমৎকার বাটি গড়া হয়েছে, ঘষে মসৃণ করা গায়ে তাদের নানা রঙের শিরা। ইরাকেই অন্যত্র প্রাপ্ত রাঁধুনীর দুটি উপকরণ উল্লেখযোগ্য। শস্য গুঁড়ো করবার জন্য মাঝখানে খোবল করা রুক্ষ পাষাণ পাটা, সঙ্গে ঈষৎ চ্যাপটা গোল পাথর ; এই শিল নোড়া এত ভারী যে শিকারী-সংগ্রাহক সমাজে তা বয়ে বেড়ানো সম্ভব হত না, কিন্তু স্থায়ী কৃষী পরিবারে খুব কাজে লেগেছে তা। দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত একটি রান্নার ভাণ্ড, তলাটা চ্যাপটা, পাশটা ঢালু

হয়ে উঠেছে মুখের দিকে এবং ঘষে মসৃণ করা। পাথর থেকে এমন আকৃতি আনতে বেশ কিছুটা কৌশল দরকার হয়েছে, আশ্চর্য নয় যে সব দিকে সমতা রক্ষা হয় নি। মূর্তি, অলংকার ও বিবিধ কাজের উপকরণ গঠনেও মৃত্তিকার পাশাপাশি চলেছিল নানা জাতের শিলা, আজও চলছে।

৫। ঘরের কথা

নতুন আবিষ্কার, নতুন শিল্প ও স্থিতিশীল জীবনের প্রভাবে নবপ্রস্তর যুগে বাস ব্যবস্থা ও গৃহস্থালিতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে, সামান্য ও সাধারণ সূচনার থেকে আরম্ভ করে এ যুগের আদি পর্বেই নানা স্থানে আশ্চর্য উন্নত বাড়ি ঘর সৃষ্টিতে ও সামাজিক বিবর্তনে তা প্রতিফলিত দেখা যায়।

প্রথম চাষবাসীরা বাস করত শস্য খেত ও পশুর বিচরণ ভূমির অদূরে লাগা-লাগি কয়েকটি ঘরে, এই নিয়েই গ্রাম। বাড়ি তৈরি হয়েছে স্থানীয় অবস্থা অনুযায়ী— মাটি, নলখাগড়া, হোগলা, খড়, কাঠ, পাথর ইত্যাদি ব্যবহার হয়েছে। আজও ভারতের পল্লীগ্রামে যে মাটির কুটির লক্ষ লক্ষ লোকের আবাস মধ্যপ্রাচ্যের মাটির ঘরগুলি ছিল সাধারণত তারই অনুরূপ, এখনও কোনও কোনও অঞ্চলে তাই ; প্রায়ই কাদার চাক প্রখর রোদে শুকিয়ে বানানো রুক্ষ কাঁচা ইট বসিয়ে দেয়াল, উপরে খড় বা কাদা-লেপা ডালপালা দিয়ে ঢেকে সমতল চাল, তার ভিতর দিয়ে বাতাস খেলত। গৃহবাসীরা সযত্নে দেয়াল ও মেঝে লেপেছে কাদা দিয়ে, কখনও চিত্রিত করেছে। মাদুরের মত বোনা আসন ও শয্যা, শোবার জন্য কিছুটা উঁচু করে তোলা বেদী, আলাদা রান্নার জায়গা এ সব দেখা যায় স্থানে স্থানে। অনেক পরে য়োরোপের বন্য পরিবেশে যখন নবপ্রস্তর যুগ প্রবেশ করল তখন সেখানে কাঠের অভাব ছিল না, গৃহ নির্মাণে সহজেই তা গৃহীত হয়েছে ; স্থাপত্যও ছিল ভিন্ন ধরনের, জলবায়ুর উপযুক্ত, যেমন ছাত দু পাশে ঢালু, যাতে বৃষ্টি ও বরফ ঝরে পড়তে পারে, এই রীতি আজও অব্যাহত। মধ্যপ্রাচ্যের মাটির ঘর অবশ্য বেশী দিন টেকে নি, কখনও কখনও চালে আগুন লেগে ধ্বংস হয়েছে। তখন মাটি সমতল করে অধিবাসীরা তাদের উপরেই নতুন করে বাড়ি বানিয়েছে, এ ভাবে প্রত্নবিজ্ঞানীদের পরম আকাঙ্ক্ষিত সব ঢিবি গড়ে উঠেছে, অনেক জায়গায় এখন তাদের শীর্ষে আধুনিক গ্রাম। .

বর্তমান জর্ডান দেশে এমনি এক ঢিবির নিচে উদঘাটিত হয়েছে এ যাবৎ পৃথিবীর আদিতম শহর। জেরিকো বাইবেলের প্রসিদ্ধ নাম, তাতে বর্ণিত আছে

জশুআ স্থানটি দখল করেছিলেন যখন তাঁর পুরোহিতদের শিঙা নিনাদে জেরিকোর প্রতিরক্ষা-প্রাকার ধূলিসাৎ হয়েছিল। কিন্তু এ যুগের এক আশ্চর্য আবিষ্কার থেকে আজ জানা আছে জেরিকোর খ্যাতির দাবি আরও বেশ কয়েক হাজার বছর প্রাচীন যখন সেখানে একাধিক প্রাচীর নিয়ে রীতিমত শহর গড়ে উঠেছিল। গ্রাম কখন শহর পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয় তার অবিসংবাদিত নির্ণায়ক হল কতগুলি বৈশিষ্ট্য, যেমন খাল প্রাচীর, মন্দির, স্মৃতি সৌধের মত সমষ্টির স্বার্থে গঠিত নির্মাণ কাজ এবং বিদেশী ব্যক্তিদের উপস্থিতি। মিশরের পিরামিড, সুমেরের গগনস্পর্শী মিনার-মন্দির জিগুরাট ইত্যাদির সাক্ষ্য থেকে বহু দিন ধরে পুরাতত্ত্বে এই ধারণা সুপ্রতিষ্ঠিত যে ঐ সব দেশে খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ সহস্রকে পৃথিবীর প্রথম শহরগলি দেখা দিয়েছে। কিন্তু পিরামিড বা জিগুরাট যখন তৈরি হয়েছে তার প্রায় ৫000 বছর আগেই জেরিকোবাসীরা উঁচু করে গড়েছে মোটা মজবুত শিলা প্রাচীর। বর্তমান শতাব্দীর মাঝামাঝি এই আবিষ্কার এবং জেরিকোর অন্যান্য বিস্ময় পুরাবিজ্ঞানীদের যে স্তম্ভিত করেছে তা আশ্চর্য নয়।

এই উদঘাটন সম্ভব হয়েছে যে মহিলার উদ্যোগে তিনি ব্রিটেনের প্রত্নবিৎ ক্যাথলিন কেনিয়ন। তাঁর আগে এই ঢিবির খনন থেকে জানা ছিল যে নিম্নতম স্তরের অধিবাসীরা মৃৎশিল্প জানত না, যদিও তারা জার্মোবাসীদের মত ঘষে পালিশ করা চুনাপাথরের পাত্র গড়েছে। ১৯৫২ সালে শ্রীমতী কেনিয়নের দল খুঁড়তে আরম্ভ করে উন্মুক্ত করল তিনটি প্রাচীর। প্রথমে যেটি দেখা দিল তার বয়স ৬000 বিসি, দ্বিতীয়টি তৈরী হয় ৭000 বিসি নাগাদ মস্ত মস্ত অখণ্ড পাথর দিয়ে, কেনিয়নের হিসাবে তা সাড়ে চার মিটার উঁচু ছিল; এর ভিতর দিকে গায়ে গায়ে ঠেকিয়ে বাড়ি ঘর তোলা হয়েছিল, সুতরাং তা একাধারে শহর প্রতিরক্ষা ও বাড়ির দেওয়ালের কাজ করেছে। তৃতীয় প্রাচীরটি প্রাচীনতম এবং আরও বাইরের দিকে অবস্থিত, তা গড়া হয়েছে প্রায় ৮000 বিসিতে। এটি অবশ্য আজ মাটির সবচেয়ে নিচে, ভূগর্ভের যে স্বাভাবিক শিলা-ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত তা এখন ঢিবির মাথা থেকে ১৫ মিটার গভীরে। সেখানে এই প্রাচীর দু মিটার মোটা, অবশিষ্ট অংশের উচ্চতা বর্তমানে কোথাও কোথাও প্রায় ছ মিটার, নির্মাণ কালে এই প্রাকার কত উঁচু ছিল তা কেউ জানে না। আজ পর্যন্ত এটি বিশ্বের প্রাচীনতম শহর-প্রাচীর।

প্রায় এক কিলোমিটার দূরে এক নদী কূল থেকে ভারী পাথর বয়ে এনেছে অধিবাসীরা, তার পর মসলা ছাড়াই তাদের সাজিয়ে দেয়াল গেঁথেছে। তা ছাড়া প্রাচীনতম দেয়ালটির বাইরে পাথর খুঁড়ে আট মিটার চওড়া ও প্রায় তিন মিটার গভীর এক পরিখা কেটেছে। ৮০০০ বিসিতে এটি এবং ঐ প্রাচীর তৈরি হয়েছে শুধু হাতের জোরে, দারুণ গরম অঞ্চলে, এবং জেরিকোর চার হেকটেআর পরিমাণ বাসভূমিতে তখন জনসংখ্যা দু তিন হাজারের বেশী ছিল না। তাই অবশ্য সব নয়, এই আদিতম প্রাকারের ভিতরের দিক ঘেঁষে তারা এক পাষাণ মিনার বানিয়েছিল, তাও সম্ভবত প্রতিরক্ষার জন্য। মিনারটির উচ্চতা এখনও ন মিটার, গোড়ায় ব্যাস ন মিটারের বেশী. সেখান থেকে সরু পথ ভিতরে গিয়েছে উপরে উঠবার সিঁড়ি পর্যন্ত। সে কালে এই সোপানের কতগুলি ধাপ ছিল তা জানা নেই, ধাপগুলি তৈরি হয়েছে ঘষে পিটে মসৃণ করা পাষাণ পাটা দিয়ে। মিনারের গোড়ায় সংকীর্ণ জায়গার মধ্যে উন্মুক্ত হয়েছে ৯০০০ বছর পুরনো বারোটি কঙ্কাল, যৌথ কবরখানা হতে পারে জায়গাটা।

জেরিকোতে পৌর নির্মাণের মধ্যে আরও ছিল কতগুলি দেয়াল যাদের উপরে লক্ষিত হয় ৪৬ সেনটিমিটার গভীর প্রণালী, তাতে পলিমাটি জমেছে দেখে মনে হয় দেয়ালগুলি অ্যাকুইডাক্টের মত উঁচু করে জল বয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা। তার উদ্দেশ্য হয়ে থাকতে পারে নাগরিক স্বাস্থ্য বা সেচ, শ্রীমতী কেনিয়ন এই দ্বিতীয় সম্ভবনার পক্ষপাতী, কিন্তু অন্যরা মনে করেন ৭০০০ বিসিতে এতখানি অগ্রগতি সম্ভব না। আদি কাল থেকে এক ফোয়ারার জল মরুভূমির মধ্য স্থলে সরস ক্ষেত্র সৃষ্টি করেছিল বলেই জেরিকোতে জনপদ গড়ে উঠতে পেরেছে। শ্রীমতী কেনিয়নের মতে এই সলিলের প্রাণদাত্রী শক্তির মোহে প্রাক্-নবপ্রস্তর শিকারী-সংগ্রাহক গোষ্ঠী স্থানটিকে পবিত্র বলে ভক্তি করেছে এবং পূজার প্রতীক কিছু একটা যে প্রতিষ্ঠা করে থাকতে পারে তারও সামান্য চিহ্ন আছে।

জেরিকোর ইতিহাসের সূচনায় বোধহয় জলের সন্ধান পেয়েই অদূরবর্তী পাহাড় থেকে গুহাবাসী নাটুফীয়রা ৯৫০০ বিসিতেই মাঝে মাঝে সেখানে আসত, আমরা জানি তারা কাস্তে বানাতে জানত, তা ছাড়া তাদের ছিল বুনো শস্যের দানা গুঁড়ো করবার পাথুরে উপকরণ। পরের এক আগন্তুক সম্প্রদায় মাটির পাত্র বানাতে জানত না, কিন্তু ছাঁচ ব্যবহার না করেই মাটি দিয়ে মাঝখানে মোটা চার দিকে

পাতলা কাঁচা ইট বানিয়েছে, তা রোদে শুকিয়ে গোল গোল বাস ঘর তৈরি করেছে, তাদের অবশিষ্ট দেয়াল ভিতর দিকে হেলানো দেখে মনে হয় ছাতও গোল করে উপরে তোলা হয়েছিল। ৭০০ বছরের মধ্যে একটি প্রাচীর বার বার বার গড়েছে তারা। তাদের পরে ৭০০০ বিসি নাগাদ অধিবাসীরা ইট জুড়বার মসলা জানত, সম্ভবত তপ্ত চুনাপাথর ('পোড়া চুন'), বালি ও জল মিশিয়ে তা বানিয়েছে, এই বিদ্যা কাজে লাগিয়েছে শহর-প্রাচীরের সম্প্রসারণে ও লম্বাটে চতুষ্কোণ গৃহ নির্মাণে, পোড়া চুনের পলস্তারা দিয়ে তারা ঘরের মেঝে ও দেয়াল সুন্দর চকচকে করেছে। ঘর বাড়ি সুপরিকল্পিত ও প্রশস্ত, কোথাও কোথাও সামনে উঠন।

প্রাচীন মানুষ কি করে গোলাকার ঘর থেকে চতুষ্কোণে উত্তীর্ণ হল তা এক হেঁয়ালি। চক্র বা তার অংশের অনেক প্রাকৃতিক নিদর্শন তার চোখে পড়েছে, যেমন গাছের গুঁড়ি গুহার ছাত, রামধনু বা দিগন্ত ; কিন্তু চতুষ্কোণ বস্তু অস্বাভাবিক, প্রায় সর্বদাই মানুষের সৃষ্টি, তথাপি অনেক জায়গায় প্রথম স্থায়ী আবাসগুলির এই চতুর্ভুজ আকৃতি। গোল থেকে চৌকোণে বিবর্তনের দৃষ্টান্ত পরে আরও দেখা যাবে। জেরিকো সম্বন্ধে জল্পনা হয়েছে যে যারা পরে চতুষ্কোণ গৃহ গড়েছে তারা প্রাচীনতর প্রাচীর ও মিনার নির্মাতা গোল গৃহবাসীদের পরাজিত করে স্থানটি দখল করেছিল। এই চারকোনা বাড়ির বাসিন্দারাই ৬০০০ বিসির শিলা প্রাকারটি তুলেছে, তার ঠিক ভিতরেই পাওয়া গিয়েছে চল্লিশটি খুলি, তার থেকে মনে হয় প্রতিরক্ষা প্রাচীর সত্ত্বেও আবার বহিরাগতদের আক্রমণে প্রাণ হারিয়েছিল এই নাগরিকরা। হয়তো পৃথক যোদ্ধা শ্রেণীও ছিল এই শহরে। জেরিকোতে এ ছাড়া কয়েকটি আশ্চর্য খুলিও উদ্ধার হয়েছে যারা হিংসার সঙ্গে নয়, সম্ভবত শ্রদ্ধার সঙ্গে সম্পর্কিত, নবপ্রস্তর সমাজের রীতি ধর্মের আলোচনায় তাদের পরিচয় পাওয়া যাবে।

৬০০০ বিসির পরে কোনও এক সময়ে জেরিকো শহর পরিত্যক্ত হল, তখন শুধু হাওয়ায় তাড়িত তপ্ত বালুকার নাচানাচি চলল তার প্রাচীর মিনার খুলি কঙ্কালের উপর। হয়তো আরও হাজার বছর পরে সেখানে বাস করেছে এক নতুন সম্প্রদায়, পূর্বগামীদের চেয়ে সভ্যতার মান তাদের অনেক নিচু, তারা প্রাচীর বা বাড়ি ঘর বানায় নি, সেকেলে অস্থায়ী আস্তানা খাড়া করে থেকেছে। কিন্তু তারা ছিল মৃৎ-শিল্পী, ঘট ঘটি ভাঙে তার প্রমাণ রেখে গিয়েছে, তাদের সঙ্গেই প্রাচীন জেরিকোর যবনিকা। তার পর আধুনিক নতুন অঙ্ক দেখা যায় ৩০০০ বিসিতে কাংস্য যুগের

সূচনায়, অনেক নব নব দল এসেছে গিয়েছে, প্রাচীর তুলেছে, বাইবেল-বর্ণিত লড়াই ঘটল ১৫০০ বিসির কাছাকাছি। অনেকটা সাম্প্রতিক হলেও 'জশুআর প্রাচীরটির' কোনও চিহ্ন পাওয়া যায় নি, জল বাতাস ছুটন্ত বালি ও তাপ সম্পূর্ণ গ্রাস করেছে তাকে। কিন্তু জেরিকো মরে নি. কয়েক মিটার দক্ষিণে গড়ে উঠেছে এক আধুনিক শহর।

জেরিকোর খননে ক্যাথলিন কেনিয়নের সহকারী ছিলেন লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের জেম্‌স মেলার্ট, তুরস্কের মধ্য-দক্ষিণ অঞ্চলে চাটাল হুয়ুক জনপদটি আবিষ্কার করে তিনিও পুরাজ্ঞানীদের অবাক করেছেন। ১৩ হেকটেআর জুড়ে ঢিবিটির শীর্ষ গোড়া থেকে ১৮ মিটার উঁচু, ১৯৬০ দশকের প্রথম দিকে সামান্য অংশ খুঁড়েই বোঝা গেল এই ঘাঁটি ঠিক গ্রাম নয়, বরং তাকেও শহর বলা চলে; যদিও সেখানে প্রতিরক্ষা প্রাচীর, মিনার বা পরিখার মত সাম্প্রদায়িক সৃষ্টি নেই, চাটালের ১৩ হেকটেআরে অন্তত ৬০০০ লোক বাস করতে পারত। কেন্দ্রটি কম করেও ৮৫০০ বছর প্রাচীন, কারও কারও অনুমান ১০,৩০০ বছর। মধ্যপ্রাচ্যের যে সব দেশে প্রথম শহর সভ্যতা দেখা দিয়েছে তার থেকে এতটা দূরে এমন জমকালো জনপদের অস্তিত্বও বিশেষজ্ঞদের কল্পনার বাইরে ছিল।

শুধু লোকসংখ্যা নয়. গৃহ নির্মাণও বিস্ময়কর। উদঘাটিত অংশে দেখা যায় ৬০০০ বিসি নাগাদ অধিবাসীরা পূর্বতন ঘর বাড়ির ধ্বংস স্তূপের উপর একতলা ও দোতলা কাঁচা ইটের বাড়ি তুলেছে গায়ে গায়ে লাগিয়ে. কারণ নিচের মাটি অসমান. কোথাও ঢালু কোথাও উঁচু, বাড়িগুলির দেয়াল পরস্পরকে ঠেকিয়ে রেখেছে। ভিতরে দেয়াল ঘেঁষে কিছুটা দূরে দূরে চতুষ্কোণ ভারী কাষ্ঠ স্তম্ভ, তাদের উপরে আড়াআড়ি কড়িকাঠ। ছাত বানাতে এদের উপরে আবার অপেক্ষাকৃত সরু কাঠের কড়ি গায়ে গায়ে ঠেকিয়ে আড়াআড়ি বসিয়েছে নির্মাতা, তার পর ঘন করে বোনা নলখাগড়ার মাদুর পেতে উপরে পাশাপাশি ঘন করে চাপিয়েছে এই নলের গোছা, সবচেয়ে উপরে মাটির মোটা স্তর—এই মাটি যাতে ঘরে না পড়ে তারই জন্য নলের মাদুর পাতা হয়েছে।

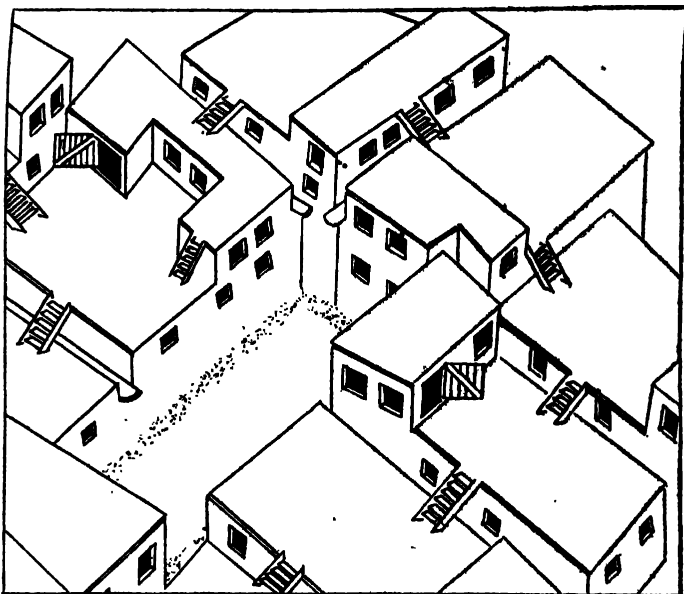
বৃষ্টি কম. তবু গৃহস্থরা এত মজবুত করে ছাত বানিয়েছে কারণ তা ছিল বাড়ি বাড়ি যাতায়াতের রাস্তা, ভিতরে ঢুকবার পথও সেখানে। চাটালবাসীরা ভিতের

কাছে বাড়ির দরজা বানায় নি—হয়তো জল ও হিংস্র পশুর পথ বন্ধ করতে। ছাতের ঢাকা প্রবেশ পথ অথবা দোতলার ঘরের কাঠের দরজা দিয়ে ঢুকে মই বেয়ে ভিতরে নামতে হত। পাশাপাশি গৃহের উঁচু নিচু ছাতের সঙ্গেও মইয়ের যোগ। দোতলা-গুলি অপেক্ষাকৃত ছোট একতলার ছাতের বাকি অংশ নানা কাজের এবং গরম কালে শোবার জায়গা, যেমন ভারতেও অনেকে শোয়। তুরস্কের ঐ অঞ্চলে গ্রাম্য লোকে এখনও এই সব উদ্দেশ্যে ছাত ব্যবহার করে এবং মই দিয়ে সেখানে চড়ে।

উদ্ধৃত বাড়িগুলি সাধারণত দৈর্ঘ্যে প্রস্থে যথাক্রমে ছয় ও সাড়ে পাঁচ মিটার। মই বেয়ে নেমেই দেয়ালের প্রস্থ জুড়ে রান্নার জায়গা, সেখানে একটি নিচু খোলা উনন এবং অন্তত একটি ঢাকা চুলা, ছাতের প্রবেশ পথ দিয়ে তাদের ধোঁয়া বেরিয়ে যায়। বাকি অংশও ভাগ ভাগ করা কাজের ও শোবার জন্য। গৃহিণী ও তার পুত্র কন্যার শয্যা এর কাছেই অন্য দেয়াল ঘেঁষে মেঝে থেকে অল্প উঁচু এক বেদীতে, তার পরে অনুরূপ এক তোলা জায়গায় গৃহস্বামী তার মাদুর পাতে। দেয়ালের একটি ফোকর দিয়ে ঢুকে ক্ষুদ্র এক প্রকোষ্ঠে ভাঁড়ার সেখানে উঁচু মাটির ভাণ্ডে উপর থেকে শস্য ঢালা হয়, নিচ থেকে দৈনিক প্রয়োজনের মত বার করা যায়, যার ফলে সবচেয়ে পুরনো বা ভিজে অংশ আগে খরচ হয়। ঘনসন্নিবিষ্ট বাড়িগুলির মধ্যে কোথাও কোথাও এক খণ্ড খালি জায়গা, একদা কেউ সেখানে ঘর তুলেছিল, এখন মরে বা চলে গিয়েছে, ধ্বংসস্তূপাক্রান্ত এই প্রাঙ্গণ বর্তমানে প্রতিবেশীদের আঁস্তাকুড় ও পায়খানা। দুর্গন্ধ ও মাছি দূর করতে প্রতিবেশীরা উননের ছাই কয়েক মুঠো ছড়িয়ে ঢেকে দিত নতুন জঞ্জাল। বৃষ্টির জলও উপর থেকে গোল-করা নর্দমা বেয়ে সেখানে পড়ে।

বর্ষা বিদায় নিলে বসন্ত ঋতুতে অনেক কাজ, মাঠে বীজ বপনের মত বাড়ি ঘর মেরামতও অবশ্য-করণীয়। কাঁচা ইট ভিজলে সহজে ক্ষয়ে যায়, সেগুলি শোধন করতে হয়েছে, নতুন পলস্তারা লাগাতে হয়েছে। অনুসন্ধানীরা বাড়ির ভিতর দেয়ালে পলস্তারার প্রলেপ গুণেছেন ১২০ পর্যন্ত। সূক্ষ্ম সাদা মাটি জলে মিশিয়ে তা তৈরি হয়েছে এবং বাসিন্দারা তা লেপেছে সর্বত্র—ছাত, দেয়াল, মেঝে, শয়ন বেদী, খোলা ও ঢাকা উনন। বসন্ত কালই সম্ভবত মৃতের সমাধি ও তৎসংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপের প্রকৃষ্ট সময় ছিল, তার আলোচনা পরে।

অনুসন্ধানীরা চাটাল হুয়ুকে ১৪ রকম কৃষিজাত ফসলের প্রমাণ পেয়েছেন



চিত্র ৮। এক খণ্ড খোলা জায়গা ঘিরে চাটালের পর বাড়ি ও মন্দির।

তাদের বীজ ও পরাগরেণু থেকে, তাদের মধ্যে আছে দুই জাতীয় বুনো গম আইনকর্ন ও এমার, পাউরুটির গম, যব, মটরশুঁটি ও সরষের মত এক তৈলবাহী বীজ। অধিবাসীরা গরু ছাগল ভেড়া ও কুকুর রেখেছে, আবার খাদ্য জোটাতে অরক্স, বুনো শুয়োর, হরিণ, গাধা ও মাঝে মাঝে শেয়াল, নেকড়ে ও চিতাবাঘও যে শিকার করেছে তার চিহ্ন আছে হাড়ে। ৫৬০০ বিসি নাগাদ তারা এই সমৃদ্ধ সমুন্নত বাস ভূমি ত্যাগ করে চলে যায়—কি কারণে তা জানা যায় নি।

মধ্যপ্রাচ্যে অনেক জায়গায় একই বহির্প্রাচীরের গায়ে ঠেকে একাধিক ঘর নিয়ে চাটালের মত চতুষ্কোণ বাড়ি কাছাকাছি তোলা হয়েছে। কিন্তু গৃণ নির্মাণে গোল ও চতুষ্কোণ দুইয়েরই ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। গোল থেকে চতুষ্কোণে পরিণতি আমরা জেরিকোতে লক্ষ্য করেছি. অন্যত্র আবার এর বিপরীতও দেখা যায়—যেন পশ্চাদপসরণ। আগে বলা হয়েছে যে আজ প্রায় ১০,০০০ বছর হল ইরানের আলি কশ

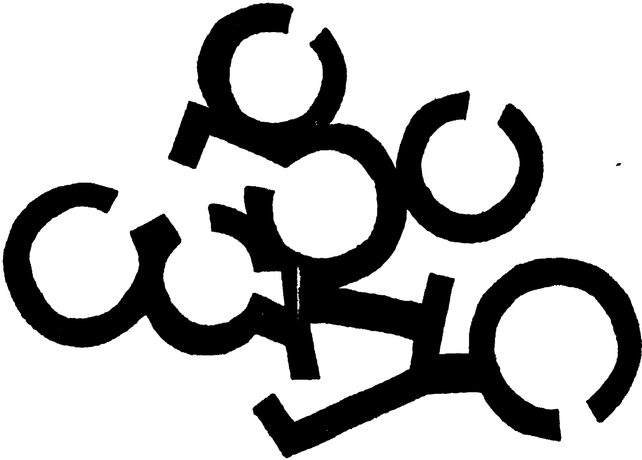
ঘাঁটিতে রোদে শুকানো মাটির পাটা দিয়ে চারকোনা বাড়ি তৈরি হয়েছিল এবং নির্মাতারা পশুপালনের দিকে কিছুটা এগিয়ে থাকলেও তাদের প্রায় সম্পূর্ণ নির্ভর ছিল শিকার ও সংগ্রহ। কিন্তু কোথাও কোথাও নবপ্রস্তর কালে আরও আদিম গোলাকার ঘর বানিয়েছে মানুষ যা পুরাপ্রস্তর আমলের কোনও কোনও অস্থায়ী আশ্রয়ের স্মৃতি জাগায়। এই গোল ঘরগুলি সাধারণত নবপ্রস্তর যুগের প্রথম স্থায়ী আবাস. যদিও অনেক ক্ষেত্রে যে চতুষ্কোণ কুটির দিয়ে বসবাস আরম্ভ হয়েছে তা একটু আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

বাস ব্যবস্থার ক্রমপরিণতি সম্পূর্ণ উদঘাটিত হয়েছে বর্তমান জর্ডানের বেইধা বসতিতে, মরা সাগর (Dead Sea) থেকে ৪৮ কিলোমিটার দক্ষিণ-পুবে। ১৯৬০ দশকে এই খননের কাজ করেছেন ইংরেজ প্রত্নবিজ্ঞানীরা, তাঁদের নেত্রী অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডায়ানা কার্কব্রাইড। এখন জায়গাটির কাছে মরুভূমি এগিয়ে এসেছে, কিন্তু প্রায় ১০,০০০ বছর আগে ছিল গাছপালা ও বন্য জন্তু। ৭৫০০ বিসির কিছু আগে বেইধাতে প্রথমে এল শিকারী-সংগ্রাহক দল, আহার্য ফল, বীজ এবং মাংসের অভাব হয় নি তাদের। মিটার খানেক চওড়া গোল জায়গায় আগুন জেলে রান্না করেছে তারা, তার পাশে ঘিরে সাজানো ছিল পাথরের পাটা, কিছু হাড় পাওয়া গিয়েছে তাদের উপর। আর আবিষ্কার হয়েছে বৃত্তাকার দুটি ভিত, একটি পাথরের, অন্যটি মাটির—এদের উপর কোনও রকম আশ্রয় তৈরি হয়েছে, প্রথমটি মাটির নিচে কিছুটা নিমজ্জিত। আবর্জনার পরিমাণ দেখে মনে হয় কয়েক ঋতুতে অধিবাসীরা ফিরে ফিরে এসেছে ঘাঁটিতে।

সম্ভবত শিকার বিরল হলে তারা বিদায় নিল, ক্রমশ মাটি ঢাকা পড়ল জায়গাটি, তার পর ৭০০০ বিসি নাগাদ এল এক দল কৃষিজ্ঞানী, ;ম ও যব সঙ্গে নিয়ে। মাটিতে গর্ত দেখে মনে হয় প্রথমে সে সব জায়গায় খুঁটি পুঁতে তার উপর কোনও রকম ছাত বানিয়ে তৈরি হয়েছে সাময়িক আবাস। মাটি খুঁড়ে নিচু করে তারা রান্নার জায়গা বানিয়েছে, এমন একটি উনুনের চার পাশে কাঁচা ইট ঘেরা ছিল, সম্ভবত বালি আটকাতে। বেইধাতে এ পর্যন্ত গৃহ নির্মাণের প্রচেষ্টা পুরাপ্রস্তর যুগে কোথাও কোথাও যা হয়েছে তার চেয়ে খুব বেশী কিছু নয়, কিন্তু মাথা গুঁজবার একটা ব্যবস্থা করে এবং সম্ভবত সঙ্গে আনা শস্য বুনে এ বার তারা স্থায়ী এবং অংশত ভূমি-নিমজ্জিত বাড়ি বানাতে মন দিয়েছে, এই পরিপাটি কাজ দেখে মনে হয় উন্নত

গৃহ নির্মাণ বিদ্যা আগেই তাদের জানা ছিল।

বাড়ি তুলতে নির্মাতারা প্রথমে বালিতে প্রায় দেড় মিটার চওড়া ও আধ মিটার গভীর গোল গর্ত খুঁড়েছে সেখানে পাথর বসিয়ে হয়েছে ভিত; তা কাঠের থাম দিয়ে ঘিরে তৈরি হল কাঠামো, তার মাথা থেকে কাঠের কড়ি এসে মিশল কেন্দ্রে স্থাপিত আর একটি দণ্ডের শীর্ষে। গোল কাঠামোটি ঘিরে তৈরি হল পাথরের দেয়াল, মেঝে ও দেয়ালে পড়ল বালি-মেশানো পলস্তারা। কাঠের ডাণ্ডা, ছোট গাছ-পালা ও খাগড়ার উপর পুরু মাটির স্তর চাপিয়ে তৈরি হয়েছে ছাত। দেয়ালের একটি ফাঁক দিয়ে পাথরের ধাপ বেয়ে ঘরে ঢুকতে হত। কাঠের কাঠামো সত্ত্বেও সম্ভবত দেয়ালের শক্তি বাড়াতে ঘরগুলি গা ঠেকাঠেকি করে তৈরি হয়েছে, ফলে চেহারা



চিত্র ৯। বেইধার গোল ঘর, আশেপাশে কোণ-করা অংশগুলি গুদাম রূপে ব্যবহৃত।

অনেকটা মৌচাকের মত; এমন এক একটি সমষ্টির ঘরে ঘরে যোগাযোগ ছিল সংলগ্ন প্রকোষ্ঠ বা ছোট সরু পথ দিয়ে এবং সমষ্টিটি ঘিরে ছিল পাষাণ প্রাচীর। গোল

ঘরগুলির বাইরের ফাঁক ভরা হত পাথর দিয়ে অথবা জায়গাগুলি কাজে লাগানো হয়েছে গুদামের মত। এক এক ঘরে এক জন দু জন লোকের বাস এবং কক্ষ-সমষ্টির বাসিন্দারা হয়তো পরস্পরের আত্মীয়।

একই ঘটনা কারও দুর্ভাগ্য কারও সৌভাগ্য হতে পারে। একদা আগুন লাগল পল্লীতে, এতটা কাঠের ইন্ধন পেয়ে বহ্নি শিখা সর্বনাশ করল অধিবাসীদের, কিন্তু ছাত ভেঙে পড়ে তাদের খাদ্য, উপকরণ, সম্পত্তি ঢেকে রাখল যেন ভবিষ্যৎ প্রত্নবিজ্ঞানীদের জন্য, তাঁরা পেলেন এক সাজানো যাদুঘর। তাঁদের পরীক্ষায় জানা গিয়েছে এই প্রাথমিক চাষবাসীরা সঙ্গে এনেছিল বুনো ঢিলে দানার ও পরবর্তী গার্হস্থ্য শক্ত দানার এমার গম এবং শুধু বুনো যব। তা ছাড়া তারা সংগ্রহ করেছে মসুর, মটরশুঁটি ইত্যাদি, ছাগল পুষেছে, আবার বন্য জন্তু শিকার করেছে। এ সব নজির আদিম নবপ্রস্তর কালের বেশী কিছু নয়, কিন্তু বেইধাতে সেই সময়েই যে পেশা অনুসারে আধুনিক সামাজিক বিভাগের সূচনা হয়েছে তারও চিহ্ন আছে। কোনও কোনও ছোট গোল ঘর কারিগরের দোকান বলে মনে হয়। একটিতে দেখা যায় প্রধানত বড় বড় ভারী পাথরের বস্তু, যেমন শস্য বা বীজ গুঁড়ো করবার জন্য শিল নোড়া হামানদিস্তা জাতীয় উপকরণ। আর এক ঘরে মজুত ছিল হাড় ও শিং, তাদের থেকে নানা জিনিস তৈরি হয়েছে, উপরন্তু সেই ঘরে রঙের কারবারও চলত মনে হয়, গুঁড়ো রং বানাবার ওকার, ম্যালাকাইট ও অন্যান্য বর্ণোজ্জ্বল আকরিকের তাল পাওয়া গিয়েছে সেখানে। যে দোকানটি বিচিত্র বস্তু সম্ভারে সবচেয়ে আগ্রহজনক সেটি বোধহয় কোনও সর্দার কারিগরের; সেখানে আটটি বড় বড় চ্যাপটা পাথর, ক্রমাগত ঘষা খেয়ে তাদের গা চকচকে, খুব সম্ভবত তাদের উপর মিস্ত্রীরা পাথর ও হাড়ের বস্তু পালিশ করেছে, সেই কাজে ব্যবহৃত পামিস পাথর ও অন্যান্য ঘষবার বস্তুও ইতস্তত উপস্থিত। তা ছাড়া পাওয়া গিয়েছে দুটি ছোট গোল ঝুড়ি ও আর একটির অংশ—এরাই এ যাবৎ প্রাচীনতম ঝুড়ি। ঘরে আর ছিল একটি কাঠের বাক্স, সেটি তার মালিকের মতই এখন নিশ্চিহ্ন, শুধু রেখে গিয়েছে ছায়া অর্থাৎ মাটির গায়ে রঙের তারতম্যে তার স্পষ্ট ছাপ। বাক্সে ছিল ১১৪ চকমকির তৈরি বর্শা ও তীরের ফলা, তাদের গড়ন সুন্দর, কিন্তু কিছুটা ঘষা মাজার কাজ তখনও বাকি, তা শেষ করবার আগেই গ্রামটিকে গ্রাস করেছে আগুন।

ধ্বংস-স্তূপের উপর বেইধা নতুন করে গড়ে উঠল এবং তার অল্প পরে আরও

এক বার দ্বিতীয় বিপর্যয় ও পুনর্গঠনের কারণ ভূমিকম্প হয়ে থাকতে পারে। চাষ ও সাধারণ জীবন পরিচিত পথেই চলল, কিন্তু স্থাপত্য শিল্পে ধীর পরিবর্তন দেখা যায়। শেষ দিকের কয়েকটি ছোট গোল কুটির সমষ্টির অংশ নয়, তারা স্বাধীন ও স্বতন্ত্র এবং অল্প বিস্তর চতুষ্কোণ ; কিন্তু কোণগুলি গোল করা এবং দেয়ালও কিছুটা বাঁকা, যেন নির্মাতারা প্রাচীন ধারার প্রভাব সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে না পারলেও চতুষ্কোণ আকৃতির সুবিধা বুঝেছে, দেয়ালের জোর বাড়াতে ব্যবহৃত কাঠের থামও বর্জন করেছে তারা।

৬৮০০ বিসি নাগাদ তিনটি প্রশস্ত চতুষ্কোণ গৃহ গঠিত হয়েছে, তারা দৈর্ঘ্যে ছ মিটার ও প্রস্থে প্রায় পাঁচ মিটার। ভিতরে সূক্ষ্ম পলস্তারার লেপন, রান্নার আগুন ঘিরে পলস্তারা করা তাক. তাতে পাথর বাটি সাজানো, এই সব পাত্রে তপ্ত শিলা খণ্ড ফেলে তরল খাদ্য গরম করা হয়ে থাকতে পারে। গৃহ তিনটির সামনে অনেকটা খোলা জায়গা, তার ও পারে এবং বাড়িগুলির আশেপাশে ছিল চারকোনা সব গৃহ। হয়তো বৃহত্তর আবাসগুলি ছিল প্রধান কৃষকদের সাধারণ চাষী ও কারিগরদের উপর তারা ছিল মাতব্বর ; তা হলে মাত্র শ দুয়েক বছরে বেইধাতে সমাজে উচ্চ নীচ ধনী দরিদ্রের শ্রেণী বিভাগ দেখা দিয়েছে, মানব সম্প্রদায়ে আবহমান কালের সমতায় ফাটল ধরে সূচনা হয়েছে আজ পর্যন্ত অব্যাহত নব্য ধারার।

আবার গ্রামটি দু বার ভূমিসাৎ হয়েছে, সম্ভবত ভূমিকম্পেই, এবং পুনর্গঠিত হয়েছে। কিছু অভিনব বৈশিষ্ট্য দেখে নবাগতদের প্রভাব সন্দেহ হয়। প্রায় সমান্তরাল আড়াআড়ি পথের রেখায় গ্রামটি বিভক্ত হল। ৬৬০০ নাগাদ বেইধার প্রধান গৃহটি উল্লেখযোগ্য। তার একটি মাত্র বড় ঘর, কিন্তু তার মাপ দৈর্ঘ্যে ন মিটার ও প্রস্থে সাত মিটার. হয়তো অনেক লোক সমাবেশের উদ্দেশ্যে তৈরি। ঘরের ভিতরে চকচকে সাদাটে পলস্তারা, মেঝে থেকে ছাত পর্যন্ত দেয়ালে পর পর চওড়া লাল ডোরা. এই রং হয়তো টাটকা পলস্তারার উপর লাগানো হয়েছে, যেমন আধুনিক প্রাচীর চিত্রে করা হয়। আগুনের জায়গা ঘিরেও অনুরূপ ডোরা, সেখানে পালিশ করা পাথরের একটি আসন বা টেবিল, আগুনের গর্তটি পাথর দিয়ে তৈরি এবং তলায় বেশ বড় এক শিলা খণ্ড বসানো।

এই জমকালো ঘরটির বাইরে দুই দেয়ালের পাশে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ, তা পার হয়ে লাগালাগি কয়েকটি বাড়িতে ছোট ছোট ঘরের সমষ্টি, প্রতি গৃহে প্রায় ছ মিটার

লম্বা একটি ঢাকা পথের দু পাশে এ রকম ছ'টি খোপ মুখোমুখি সাজানো। এদের কোনও কোনও খোপ গুদাম হয়ে থাকতে পারে, অন্যগুলি নানা কারিগরের কর্মশালা—বেইধার নিম্নতর স্তরে যা দেখা গিয়েছে তার তুলনায় অনেক উন্নত। এই কারুশিল্পীরা যে সব বস্তু রেখে গিয়েছে তাতে বোঝা যায় তারা পাথর, হাড় ও শিঙের বিচিত্র কাজে বিশেষজ্ঞ ছিল ; কেউ বিভিন্ন পদার্থ থেকে বিশেষ কোনও ব্যবহারের দ্রব্য বানাত, কেউ পারদর্শী একই পদার্থ কেটে নানা সাধারণ উপকরণ গড়তে। হাড়ের কাজ যে ভাল জানে সে তা থেকে বানাচ্ছে হার, বালা, পিন ইত্যাদি অলংকার—আবার অরক্সের স্কন্ধাস্থি থেকে কোদাল পর্যন্ত। অভিজ্ঞ শিলাশিল্পীর হাতে গড়ে উঠেছে শিল নোড়া, হামানদিস্তা হাতলযুক্ত কুড়ালের মাথা, তা ছাড়া পাত, চাঁছনি ইত্যাদি প্রাচীন উপকরণ। কোনও জহুরী বানাচ্ছে পাথরের পুঁতি, পাশের ঘরে হয়তো তার সঙ্গী ফাঁপা হাড় কেটে টুকরো করছে, দুই বস্তু গেঁথেই হার তৈরি হবে। এর মধ্যে একটি কক্ষ কিছুটা বিভিন্ন, সেখানে পাওয়া গিয়েছে ভারী পাথরের কাটারি যন্ত্র এবং পশুর কঙ্কাল, বহু হাড় ও শিংসংযুক্ত খুলি : হয়তো ঘরটি ছিল কসাইখানা, মালিক অন্যান্য কারিগরদের হাড় ও শিং সরবরাহ করেছে, যদিও কাজের এতটা সংকীর্ণ ভাগাভাগি অত প্রাচীন কালে বিরল।

খুপরিগুলি মোটা দেয়াল দিয়ে ভাগ করা এবং বাইরের দেয়াল পাথর গেঁথে তৈরি, তার থেকে মনে হয় উপরে দোতলা ছিল, হয়তো বাস ঘর। যাই হক, ৬৫০০ বিসির কাছাকাছি বেইধা যখন পরিত্যক্ত হয় তখন তা আর শুধু কয়েক ঘর চাষীর গ্রাম নয়, নানা শিল্পের এক বিশিষ্ট কেন্দ্র ; সম্ভবত সেখান থেকে অন্যান্য গ্রাম তৈরী জিনিস নিয়েছে অভ্যুদয় হয়েছে এক পরিচালক গোষ্ঠীর যারা ঐ লাল বর্ণাঙ্কিত বড় ঘরটিতে অধিষ্ঠিত হয়ে কাজ করেছে।

কিন্তু ৭০০০ বিসিতে কৃষির সূচনা থেকে গ্রামটি ক্রমেই সংকুচিত হয়ে পড়েছে, মাত্র ৫০০ বছর পরে নানা শিল্পে উন্নত বর্ধিষ্ণু গ্রামটি ছেড়ে বাসিন্দারা চলে গেলে তা পড়ে রইল বেদখলে, তার প্রায় ৬০০০ বছর ব্যবধানে বেইধাতে স্বল্পকালীন এক উপনিবেশ দেখা দেয়। এখন যাযাবর আরব্য বেদুইন ছাড়া আর জন মানব নেই সে অঞ্চলে।

পশ্চিম ইরানের গানুজ-দারে গ্রামটি শুধু পালিত ছাগল ভেড়ার ৯৫০০ হাজার বছর প্রাচীন পদচিহ্নের জন্য বিখ্যাত নয়, তার স্থাপত্য শিল্পও বিস্ময়কর এবং

তাতে বেইধার সঙ্গে কিছু মিল দেখা যায়। অনুসন্ধানীরা খনন করে প্রথমে পেলেন কতগুলি খুপরির সমষ্টি, ঘরগুলি এত ছোট যে তাতে বাস করা দায়. তা ছাড়া দরজা জানলা বলতে কিছু নেই, কয়েকটি খুপরিতে শুধু গোল ক্ষুদ্র গবাক্ষ যা বন্ধ করা যেত মাটির চাকতি বা শঙ্কু (cone) দিয়ে। মোটা দেয়াল তৈরি হয়েছে উপরটা গোল করা কাঁচা ইট দিয়ে, কোনও কোনওটা প্রায় এক মিটার লম্বা, কাদার মসলা দিয়ে গাঁথা। কয়েকটি ঘরে কুলুঙ্গি কিংবা পৃথক আধার ছিল, একটি ঘরে দেখা গেল দেয়ালের এক খোপের মধ্যে উপরে নিচে সাজানো দুটি বুনো ভেড়ার খুলি। হয়তো সেটি ছিল ঠাকুর ঘর, শিকারে যাওয়ার আগে গ্রামবাসীরা সেখানে প্রার্থনা করেছে।

কিন্তু প্রায় নিশ্ছিদ্র এই খুপরিগুলির রহস্য মিটল না খননের কাজ একেবারে শেষ না হওয়া পর্যন্ত। তখন বোঝা গেল সেগুলির উপরে আর এক তলায় ছিল বাস স্থান। গ্রামটি আগুনে পুড়ে গিয়েছিল, তবু ধ্বংসাবশেষের মধ্যে পাওয়া গেল দোতলার ভার বহন করেছে যে সব কাঠের কড়ি তাদের চিহ্ন ; বাড়ির ছাত তৈরি হয়েছিল কড়িকাঠ ও বেতের উপর মাটি দিয়ে, তাদেরও অবশিষ্ট পাওয়া গিয়েছে। নিচ তলার অধিকাংশ ঘর সম্ভবত গুদাম—শস্য বা অন্য কিছু মজুদ বস্তুর চিহ্ন না মিললেও কয়েকটি বড় পাথুরে খল ইঙ্গিত করে যে গম বা যবের ভুষি ছাড়ানোর অথবা তাদের গুঁড়ো করার কাজ হয়েছে সেখানে।

তুরস্কের কাইউনু গ্রামে যে প্রথম শূকর পালন হয়ে থাকতে পারে তা আমরা দেখেছি, সেখানে স্থাপত্য শিল্পের আর একটি বিস্ময় উদঘাটিত হয়েছে। ৭০০০ বিসির আগেই শিকারী সংগ্রাহকরা সে জায়গায় ঘাঁটি বানিয়েছে এবং অবিলম্বে শুয়োর ছাড়াও ছাগল ভেড়া পুষেছে, যদিও তাদের হাড়ের সঙ্গে বুনো গরু হরিণের অস্থিও বর্তমান ছিল, তার পর আরম্ভ হয়েছে চাষ। পেটের দায় মেটাতে যখন তারা এ সব নতুন বিদ্যা আয়ত্ত করছে তখন তাদের কোনও এক অজ্ঞাত স্থপতি ঘরের মেঝে বানাতে সৃষ্টি করল এক অসাধারণ কীর্তি. বর্তমান কালে যাকে বলা হয় টেরাজো। এই কাজে প্রথমে চুনাপাথরের কুচি মেশানো হয়েছে এক বাঁধুনীর সঙ্গে যা জমেছে সিমেন্ট কংক্রিটের মত কঠিন হয়ে, তার উপরাংশে গাঁথা দেখা যায় হালকা গোলাপী রঙের নুড়ি, তাদের শোভা আরও খুলেছে সাদা নুড়ির দুটি সমান্তরাল ডোরা দিয়ে। মেঝে শক্ত হয়ে জমার পর নির্মাতারা নুড়ি ঘষে তা

সমতল করেছে, তার পর পালিশ করেছে সবটা। টেরাজো তৈরির এই রীতি প্রায় ৯০০০ বছর পরে আজও প্রচলিত, শুধু ঘষার কাজটা হয় যন্ত্রে।

কাইউনু গ্রামের প্রায় ১৯ কিলোমিটার দূরে এক বিস্ময়কর আবিষ্কার হয়েছে। জায়গাটিতে তাম্রবাহী শিলার স্তর থেকে এখনও ঐ মূল্যবান ধাতুটি নিষ্কাশিত হয়, কিন্তু নবপ্রস্তর কালেই সেখান থেকে তামার এক আকরিক উজ্জ্বল সবুজ ম্যালাকাইট সংগ্রহ করে দেহ সাজিয়েছে গ্রামবাসীরা। এই সংগ্রহের কাজে তারা একদা লক্ষ্য করল চকচকে লালচে এক অজানা আশ্চর্য বস্তু, ভারী পাথরের আঘাতেও তা ভাঙে না, শুধু আকৃতি বদলে যায়। এই অদ্ভুত বস্তুটি প্রায় বিশুদ্ধ তামা, তা কাজে লাগাতে দেরি হল না, পিটিয়ে তৈরি হল পিন ও অন্যান্য ছোট খাটো উপকরণ, সেগুলি যে কোনও ধাতুর তৈরি যন্ত্রের মধ্যে এ যাবৎ আদিতম। এদের সঙ্গে বিশদ পরিচয় হবে ধাতু যুগের আলোচনায়, সাধারণ ভাবে সেই যুগ শুরু হয়েছে আরও সহস্রাধিক বছর পরে।

জার্মোর ঘর বাড়ি আগে উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের চেহারা অনেকটা মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান গ্রাম্য কুটিরের মতই। নির্মাতারা প্রথমে বেশ বড় বড় পাথরের ভিত বানাত, তার পর আঠালো মাটি জল দিয়ে মেখে তাতে খড় মেশাত ফাটল ধরা বন্ধ করতে। এই বস্তু দিয়ে সাড়ে সাত থেকে ১০ সেনটিমিটার উঁচু পর্যন্ত একটি দেয়াল তৈরি করে রোদে শুকোবার জন্য তা প্রায় এক দিন ছেড়ে দিয়ে তারা অন্য দেয়ালের কাজ আরম্ভ করত। এ ভাবে পাতলা পাতলা স্তরে গড়ে উঠত প্রায় দু মিটার উঁচু চার দিকের সম্পূর্ণ দেয়াল, স্তরগুলি উপরের দিকে ক্রমশ চওড়ায় কম। ৬৭০০ বীসিতে জার্মোর এমন এক বাড়িতে সাধারণত থাকত লম্বা চতুষ্কোণ একটি ঘর, মাপ দৈর্ঘ্যে প্রস্থে সাড়ে পাঁচ ও দু মিটার, তা দু ভাগে বিভক্ত আড়াআড়ি আর একটি দেয়াল দিয়ে, সেটি হয়তো ছাত পর্যন্ত ওঠে নি। এক অংশে শোবার জায়গা, অন্যটি দিনের। পাশে প্রায় সমান বড় আর একটি ঘর চার অংশে ভাগ করে মাল পত্র রাখার ব্যবস্থা। ঘরগুলির মেঝে যে নলখাগড়ার মাদুর দিয়ে ঢাকা ছিল তার সাক্ষ্য দেয় মাটিতে তার ছাপ। গুদাম ঘরের এক পাশে একটি গলিপথ বেয়ে গিয়ে খোলা উঠন, সম্ভবত সেখানে শস্য ভাঙা ও অন্যান্য গার্হস্থ্য কাজ কর্ম হত, পশুদের আটকে রাখা হত। জার্মোর চরম বৃদ্ধি কালে এই রকম গোটা পঁচিশ বাড়ি ছিল গ্রামে,

তাদের মধ্যে গলি বা উঠনের ব্যবধান।

এই মামুলী গ্রাম্য বাস ঘরের মধ্যে দুটি বৈশিষ্ট্য বিস্ময়কর। সম্ভবত কাঠ দিয়ে তৈরি হয়েছিল এক পাল্লার দরজা, তাদের চিহ্ন মাত্র নেই, কিন্তু কবজার ব্যবস্থা কি ছিল তা বোঝা যায়। উপর দিকে দেয়ালে এবং নিচে মাটিতে বসানো ছিল গোল গর্ত করা পাথর, দ্বারদণ্ডের গোল করা মাথা ঢুকত এই দুই খোবলে। খিল লাগিয়ে এই দরজা বন্ধ করলে বাইরের কেউ সহজে ঢুকতে পারত না। অধিবাসীরা তাদের সম্পত্তি ও পারিবারিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে যে যত্ন নিয়েছে তা বোঝা যায়। দ্বিতীয় বিস্ময় তাদের চুলা, দেয়াল বানাবার বস্তু দিয়ে তাও তৈরি হয়েছে ঐ চারটি ছোট ঘরের একটিতে ; চুলার উপরটা ঢাকা ও গোল করা, মুখ উঠনের দিকে এবং ধোঁয়ার নালিটি দেয়াল বেয়ে উঠে সম্ভবত শেষ হয়েছিল ছাতের উপরে চিমনির মত এক নির্গম পথে। এই ধরনের উনন আজও জগতের অনেক জায়গায় দেখা যায়, তা ব্যবহারে সহজ ও কার্যকর। তার মুখ দিয়ে ইন্ধন ভরে আগুন জ্বলতে দেওয়া হত যত ক্ষণ না ভিতরটা দরকার মত গরম হয়, তার পর কয়লা ও ছাই বার করে খাদ্য ভরে চুলার মুখটি বন্ধ করা হত। রান্না সম্পন্ন হত দেয়ালের তাপে—এই চুলার সুবিধা এই যে খাদ্য বস্তু চার দিক থেকে সমান তাপ পায়, খোলা আগুনে তা সম্ভব না। এই সব চুলায় হয়তো শস্যও গরম করা হয়েছে, যাতে খোসা ছাড়ানো বা গুঁড়ো করা সহজ হয়।

উত্তর ইরাকের হাসুনা ঢিবি খুঁড়ে প্রায় ৭৫০০ বছর প্রাচীন যে গ্রামটি উদ্ধার হয়েছে সেখানে দু রকম চুলা ছিল। আঙিনা ঘিরে ছোট ছোট মাটির বাড়ি, রান্নাঘরে ও উঠনে মাটি খুবলে তুলে আগুন জ্বালবার ব্যবস্থা। উঠনে কখনও কখনও মাটির চুলাও দেখা যায়। গরম কালে মেয়েরা মুক্ত প্রাঙ্গণে রান্নার যাবতীয় কাজগুলি করেছে, অন্য সময়ে ভিতরে। এই সব গৃহীরা মাটিতে গর্ত করে বানিয়েছে শস্য মজুদ রাখবার আধার অল্প-বাঁকা কাঠের হাতলে নাটুফীয়দের মত চকমকির ফলা বসিয়ে কাস্তে তৈরি করেছে। তাদেরও আগে হাসুনার নিম্নতম স্তরে মনে হয় এক অস্থায়ী গোষ্ঠী বাসা বেঁধেছিল, সম্ভবত তাঁবুর বাসা। কিন্তু তখনই চাষ ও পশুপালন জানা ছিল, শুধু যে গরু ভেড়ার হাড় অপর্যাপ্ত পাওয়া গিয়েছে তাই নয়, খেতের মাটি ঢিলে করতে প্রাথমিক পাথুরে কোদাল—তা হাতলের সঙ্গে জুড়তে যে শিলা-জতুর আঠা ব্যবহার হয়েছে তা এখনও লেগে আছে গায়ে। শস্য পিটিয়ে গুঁড়ো

করবার হামানদিস্তা, ঘষে গঁড়ো করবার শিল নোড়াও ছিল। উপকরণ তখনও প্রায় সবই পাথরের, কিন্তু নকশা-আঁকা মাটির পাত্র তৈরি আরম্ভ হয়েছে।

তুরস্কের দক্ষিণ-পশ্চিমে আনাতোলিয়া অঞ্চল উর্বর অর্ধবৃত্ত থেকে কিছটা দূরে, সেখানে ৩০০০ খ্রীঃপূঃ-এর আগে স্থায়ী বসবাস আরম্ভ হয় নি এই প্রচলিত ধারণার নিপাত করলেন জেম্স মেলার্ট যিনি পরে চাটাল হুয়ুক উদঘাটন করেন। ১৯৫৬ সালে সেই এলাকায় হাসিলার নামক জায়গায় এক ঢিবি দেখানো হয় তাঁকে, তা খুঁড়ে চিত্রিত মৃৎপাত্র উদ্ধার করে ইস্তানবুলের বাজারে বিক্রি হচ্ছে। পরবর্তী বছর থেকে তাঁর দল ঢিবির থেকে আরও অনেক আশ্চর্য বস্তু ও তথ্য আবিষ্কার করেছে। তাঁর হিসাবে হাসিলারে নবপ্রস্তর যুগের শুরু প্রায় ৯০০০ বছর আগে জার্মোর সমকালেই, পরবর্তী কালে লোকে তাদের ঘর বাড়ি ঘিরেছে এক মিটারের চেয়েও মোটা পাঁচিল দিয়ে। কিছু কিছু বাড়ি তৈরি গায়ে গায়ে ঠেকিয়ে তাতে জানলা দরজা ছিল, কোনও কোনও বাড়ি দোতলা, পাথরের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হত। এক ছাত থেকে উচ্চতর ছাতে অথবা পাঁচিলে চড়তে হত মই দিয়ে। মৃৎশিল্পীরা সুন্দর ঘট ঘটি বাটি বানিয়েছে, নানা বয়সের জননী দেবী গড়েছে নানা ভঙ্গিতে, তাদের কোনও কোনও অঙ্গ যথারীতি অত্যধিক স্ফীত হলেও সব মিলিয়ে মূর্তিগুলির গঠন সৌকর্য ও বাস্তবিকতা প্রসংশা জাগায়; যথা এক দেবী পা মুড়ে বসে বাঁ দিকে তাকিয়ে আছে, মাথায় চূড়া করে বাঁধা খোঁপা। মেয়েরা সেজেছে অলংকারে, মুখে লালিমা এনেছে রং মেখে, পুরুষরা গরুর হাড় দিয়ে এক খেলা খেলেছে যা এখনও তুরস্কে চলে। বাস গৃহ ছাড়াও তারা বানিয়েছে পৃথক রান্নাঘর, শস্য জমা রাখবার গুদাম, কুমোরের কর্মশালা, এমন কি ঠাকুর বাড়ি বা মন্দির।

উদঘাটিত নজির আশ্রয় করে আমরা এই গ্রামে ৫৪০০ খ্রীঃপূঃ নাগাদ একটি কর্মব্যস্ত অপরাহ্ণ কল্পনা করতে পারি। তখন শস্য কাটার সময় গম ও যব ভরা ঝুড়ি পিঠে নিয়ে কেউ কেউ পাঁচিলের উত্তর-পশ্চিম দরজা দিয়ে ঢুকে উঠনে রাখল, সেখানে এক গৃহিণী তা চুলায় ভেজে নিচ্ছে যাতে সহজে ভুষি ছাড়ানো যায়, তার পর তা পাশের গুদামে রাখা হবে। অন্য পাশে এক দোতলা বাড়ির ছাতে মেয়েরা ফল শুকাতে দিচ্ছে। এ দিকে পুব দেয়ালের গায়ে এক পাকঘরের সংলগ্ন ঘেরা আঙিনায় অন্যরা রান্না চড়িয়েছে। দক্ষিণ দেয়ালের বড় দরজা দিয়ে রাখাল বালকরা গরু ছাগল ভেড়ার পাল ঘরে আনল, ঢুকেই যে বড় উঠন সেখানে তারা

রাত কাটাবে, উঠনে দুধ দোহানো শুরু হল। কাছেই এক ঘেরা জায়গায় দু জনে ঝুড়ি বুনছে। মাঝামাঝি অংশে তিনটি বাড়িতে মৃৎকর্মীদের কাজ চলে, এখন বাইরের প্রাঙ্গণে তারা তাদের পাত্র রং করছে, শুকাচ্ছে। উত্তর ও পুব প'াচিলের কোণে কুয়ো থেকে জল তুলছে কয়েক জন, পাশের দেবালয়ে পূজারীরা ঢুকছে নানা উপচার হাতে নিয়ে। বেকার ছেলে মেয়েরা দেয়ালে বা ছাতে চড়ে খেলছে।

৫000 বিসিতে দক্ষিণ-পূর্ব য়োরোপে বর্তমান গ্রীস, ইটালি ইত্যাদি অঞ্চলে প্রথম কৃষিবাসীরা অনেক জায়গায় বেশ জনবহুল পল্লীতে বাস করেছে, ঘর বাড়ি প্রায়ই তৈরি হয়েছে জায়গা মত কাঠের খ'ুটি খাড়া করে তাদের মাঝখানের ফাঁক কাদা-লেপা কাঠের দণ্ড বা ডালপালার জালি দিয়ে ভরে। অধিকাংশ কুটিরে কিছুটা উ'চু মাটির বেদীতে রান্নার জায়গা, কখনও বা তা ঘিরে আলাদা করা হয়েছে, সেখানে ছিল চুলা, শস্য বা আটা রাখবার মৃত্তিকাধার, পাত্র উপকরণ। মধ্য য়োরোপের আদিতম কৃষকরা হাংগেরির দানিউব নদীর উপত্যকায় বাসা বেঁধেছিল, তার পর দ্রুত পুব দিকে ছড়িয়েছে এই দানিউবীয়রা। তাদের গ্রামে ৩00 পর্যন্ত লোক, তারা প্রকাণ্ড সাম্প্রদায়িক কাঠের বাড়িতে বাস করত, সেগুলি লম্বায় ৪৬ মিটার পর্যন্ত, চওড়ায় প্রায় সাড়ে প'াচ মিটার। দেয়াল তৈরি হয়েছে ওক গাছের কাঠ আর তার মাঝে মাঝে মাটি-মাখানো ডালপালা দিয়ে, উপরে ঘরের ছাত ঢালু। ভিতরে এক প্রান্তে উ'চু করা মেঝে সম্ভবত শস্য জমা রাখার জায়গা, বিপরীত প্রান্ত মজবুত করে তৈরি গোটা কয়েক পালিত পশু রাখবার জন্য। ঘরের মাঝামাঝি কয়েকটি নিকটাত্মীয় পরিবারের বাস ব্যবস্থা। প্রতি গ্রামের কেন্দ্রে একটি করে আরও বড় লম্বা ঘর, তাদের দেয়াল কখনও কখনও তক্তা দিয়ে তৈরি, হয়তো সেখানে পল্লীবাসীরা সমবেত হত। আর এক প্রান্তে চল্লিশ পঞ্চাশটি গরু রাখবার জায়গা, তাও এক সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থা হয়ে থাকতে পারে।

৬। অন্নের পর বস্ত্র

শীত নিবারণে এবং ক্ষত এড়াতে মানুষ পুরাপ্রস্তর যুগেই পশু চর্ম দিয়ে দেহ ঢেকেছে, শেষের দিকে এই আবরণ হয়েছে আভরণ বা দেহ সজ্জারও বাহন। তখন এগুলি সেলাই করতে দড়ি ও সুতোর কাজ করেছে চামড়ার ফালি, পশুর নাড়িভুঁড়ি বা পেশীতন্তু এবং নানা জাতের তৃণ, শিকড়, বাকলের অংশ ইত্যাদি উদ্ভিজ্জ বস্তু। সে সব এখন পচে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও তাদের দিয়ে চামড়ার বসন বা থলি সেলাইতে ব্যবহৃত হাড়ের তৈরি সুঁচ বা ছিদ্রকর শলা পাওয়া গিয়েছে প্রচুর পরিমাণে। তেমনি নানা যাদুঘরে আছে মধ্যপ্রস্তর যুগের পাথর বা হাড়ের অস্ত্র উপকরণ যা সুতো ও আঠা দিয়ে জুড়তে হয়েছে হাতলের সঙ্গে। এই যুগে য়োরোপে মাছ শিকারের তৎপরতা বেড়েছিল, জাল এবং ছিপ বানাতে দরকার হয়েছে দড়ি ও সুতো। নবপ্রস্তর যুগে একদা চর্ম বা বল্কল পরিধানের পরিবর্তে দেখা দিল সুতোয় বোনা প্রকৃত বস্ত্র, সূচিত হল আর এক বৈপ্লবিক অগ্রগতি।

এই আবিষ্কার অবশ্য সম্পূর্ণ আকস্মিক নয়. অনেক আগেই প্রাকৃতিক জগতে বুননের আভাস পেয়েছে মানুষ, তার পর অন্যান্য ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তা কাজে লাগিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়েছে এ দিকে। ঝোপ ঝাড় ডালপালার প্রশাখা প্রায়ই পরস্পরের উপরে নিচে জড়াজড়ি করে থাকে. আজ থেকে ৩০-৪০ লক্ষ বছর আগে মানুষের সম্ভব পূর্বপুরুষ অসট্রালোপিথেকাস এই রকম কাঁটাদার ঝোপ ঝাড় গোল করে সাজিয়ে রাত্রির অস্থায়ী আশ্রয় বানিয়েছে মনে হয়। তার পর মানুষ শিকারের খোঁজে পাথুরে হাতিয়ার হাতে নিয়ে বনে জঙ্গলে বিচরণ করতে করতে নিশ্চয় লক্ষ্য করেছে জড়ানো পাকানো লতা গুল্ম ও ঝোপের দুর্ভেদ্য বাধা। আদি মানব হোমো ইরেকটাস অন্তত চার লক্ষ বছর আগে যে স্বাভাবিক অঙ্গাঙ্গীজড়িত ডাল সাজিয়ে বৃক্ষ আবাস বানাত তার কিছু নজির আছে। হয়তো তার থেকে শিকারীরা নিজেরাই ডালপালা জড়াতে শিখল. তা দিয়ে হল আত্মরক্ষার আবরণ, এমন কি নিহত পশু চাপিয়ে গুহায় বা ডেরায় টেনে নিয়ে যাওয়ার 'স্লেজ গাড়ি'।

অনেক পরে পশু চর্মের পোশাক বা থলি সেলাইতে সুঁচ যে পর পর উপরে

নিচে চলেছে তার থেকে ঝুড়ি বা মাদুর বোনার ধারণা এসে থাকতে পারে এবং এই শিল্প বস্ত্র বয়নের অনুরূপ। কবে কোথায় প্রথম ঝুড়ি বা মাদুরের উদভাবন তা জানা নেই, প্রাথমিক পোড়া মৃৎপাত্রের গায়ে ঝুড়ির অনুকরণে অঙ্কিত দাগ থেকে বোঝা যায় তা আরও প্রাচীন। সাধারণ ধারণা অনুসারে কাপড়ও দেখা দিয়েছে ঝুড়ি এবং মাদুরের পরে। প্রথম কৃষীরা জানত কি করে নলখাগড়া, কাশ, শর ইত্যাদি নদীজাত তৃণ জড়িয়ে মাদুর বানাতে হয়, ৯০০০ বছর প্রাচীন বেইধা গ্রামের ধ্বংসাবশেষে গোল মাদুরের খণ্ড পাওয়া গিয়েছে। এই ধরনের গোলাকার আসন বানানো খুব কঠিন নয়। প্রথমে দরকার মোটা গোছের কোনও রকম ডাঁটা, যেমন নদী তীরের নল, খেতের খড় বা আগাছা; এগুলি পাকিয়ে দড়ি বানালে তা খুলে আসতে পারে, কিন্তু দড়িটা আঁশযুক্ত ছাল বাকল দিয়ে জড়িয়ে নিলে তখন তা আঁট করে পাকিয়ে নেওয়া চলে। তার পর এই দড়ি গায়ে গায়ে ঠেকিয়ে ক্রমশ বৃহত্তর বৃত্ত পাকিয়ে গিয়ে দুটি করে পাশাপাশি পাকের উপরে নিচে সুঁচ চালানোর মত ছাল বুনে চালিয়ে বেঁধে দিলেই গোল একটি আসন হয়ে গেল।

ঝুড়ি বানাতে প্রথমে মাদুর শিল্পীর এই কৌশলই সম্ভবত ব্যবহার হয়েছে, শুধু চ্যাপটা বস্তুটির ধারগুলি গামলার গায়ের মত উপর দিকে তোলা হল। ছোট ঝুড়ি বানাতে কম ও বড়র বেলায় বেশী দড়ি পাকিয়ে দরকার মত নানা আকারের ঝুড়ি চাঙারি ডালা তৈরি সম্ভব হল। ঝুড়ির আকার বজায় রাখতে এবং ফাঁক বন্ধ করতে মাদুরের তুলনায় অনেক বেশী ছাল জড়াতে হয়েছে, ফাঁক থাকলে বীজ জাতীয় বস্তু রাখা চলবে না। অনেক সময়ে ভিতরে পাতলা করে মাটি বা পিচ লেপে দেওয়া হয়েছে যাতে তরল জিনিসও রাখা যায়।

গোল মাদুর থেকেই চৌকোণ আসনের ধারণা এসে থাকতে পারে, কিন্তু কোনটা আগে দেখা দিয়েছে তা জানা নেই, দুইয়ের স্বতন্ত্র উৎপত্তিও সম্ভব। একটি কেন্দ্রকে ঘিরে পাক জড়িয়ে না গিয়ে চৌকোণ মাদুর বানাতে কর্মীরা সমান লম্বা ডাঁটা পরস্পরের উপরে নিচে আড়াআড়ি সাজিয়েছে, শেষে সেগুলি টেনে ঘন করেছে। চাটাল হুয়ুকে ৮৫০০ বছর আগে গৃহ নির্মাণে এবং শুতে বসতে যে মাদুর ব্যবহার হয়েছে তার অবশিষ্টাংশ থেকে জানা যায় তা নিঃসন্দেহে এই রীতিতে তৈরি। এই রকম আড়াআড়ি সাজিয়ে ঝুড়িও বানানো হয়েছে খুব প্রাচীন কালেই।

এ বার আমরা বোনা কাপড়ের কাছাকাছি এসে পড়েছি. তার শিল্প কৌশল অভিন্ন, শুধু বস্তু আলাদা—ডাঁটা বা বাকলের বদলে ব্যবহার হয়েছে সুতো. সর্ব প্রথম তা তৈরি হয়েছে ঐ বাকলের আঁশ বা পশুর লোম পাকিয়ে। এই সুতো তৈরি এবং তা বুনে কাপড় বানানো বস্ত্র শিল্পের দুটি প্রধান ও অপরিহার্য ধাপ। নবপ্রস্তর যুগের আগে এর কোনও চিহ্ন নেই, সে যুগে এই শিল্পের উপযুক্ত আনুষঙ্গিক যন্ত্রও উদভাবন করতে হয়েছিল—প্রধানত টাকু ও তাঁত। মিশরে আধুনিক কায়রো শহরের অল্প দক্ষিণে ফাইয়ুম অঞ্চল নানা প্রাচীন আবিষ্কারের গুণে প্রসিদ্ধ, ৫০০০ বিসির আগে সেখানে মরুভূমির এক সরস অঞ্চলে একটি নবপ্রস্তর ঘাঁটির পত্তন হয়েছিল। এই ফাইয়ুমে এক টুকরো কাপড় উদ্ধার হয়. তার আঁশ এসেছে তিসি বা মসিনার বাকল থেকে। এই লিনেন বস্ত্রের চেয়ে প্রাচীন নমুনা পাওয়া যাবে এমন আশা ছিল না। কিন্তু ১৯৬০ দশকের প্রথম দিকে চাটালের ধ্বংসে ছোট ছোট চতুষ্কোণ বস্ত্র পাওয়া গেল যার বয়স ৬০০০ বিসির কাছাকাছি—অর্থাৎ তারা তাঁতের অস্তিত্ব পিছিয়ে দিল প্রায় হাজার বছর। জার্মো গ্রামে বোনা কাপড়ের ছাপ আছে মাটির গায়ে, কিন্তু তা অনেক পরের কথা।

চাটালের নমুনাগুলি যে এত কাল টিকে আছে তা সম্ভব হয়েছে ভাগ্য গুণে কতগুলি অবস্থার সংযোগে। স্থানীয় আনুষ্ঠানিক প্রথা অনুসারে মৃত ব্যক্তির অস্থি কাপড়ে জড়িয়ে এবং থুলির ভিতরেও তা ভরে সমাধিস্থ করা হত ঘরে ঘরে বা মন্দিরে দেউলে মাটির মেঝের নিচে। সেখানে বাতাসের সংস্পর্শ পায় নি বলে তাদের ক্ষতি হয় নি তার পর ৫৮৮০ বিসিতে এক সাংঘাতিক অগ্নিকাণ্ডে বাড়িগুলি ধ্বংস হলেও কাপড় বেঁচে গিয়েছে. কারণ সমাধি স্থলে অক্সিজেন না পেয়ে অগ্নি তা গ্রাস করতে পারে নি। তার পরিবর্তে রূপে ও আকারে অক্ষুণ্ণ থেকেও আগুনের তাপে অধিকাংশ আঁশ কারবনে পরিণত হয়েছে, ঠিক কাঠ তেতে যেমন কাঠকয়লা হয়। কালের প্রভাবে কারবনের অবক্ষয় হয় না. ফলে অঙ্গারীভূত বস্ত্র খণ্ডগুলি আট সহস্রক ধরে অপরিবর্তিত থেকে গিয়েছে।

এই ছোট ছোট ভঙ্গুর টুকরোগুলি আজ দেখতে চটের মত, কিন্তু বিশেষজ্ঞদের নানা রকম পরীক্ষাও আঁশ বস্তুটি সনাক্ত করতে পারে নি। পাটের রোঁয়া মোটা ও ছোট বলে চটও নিকৃষ্ট শ্রেণীর বস্ত্র, কিন্তু চাটালী নমুনাগুলির পরীক্ষায় দেখা যায় যে এই অজ্ঞাত আঁশ সযত্নে প্রস্তুত করে তা থেকে উৎকৃষ্ট, সুষম ও মসৃণ সুতো

পাকানো হয়েছে, তাদের গা থেকে রোঁয়া বেরিয়ে নেই, তারা পাশাপাশি সমান্তরাল। সুতোর সূক্ষ্মতা আরও আশ্চর্য, আজ তাঁত শিল্পে তা সাধারণত মাপা হয় নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে টানা ও পড়েনের সংখ্যা দিয়ে, সংখ্যা যত বেশী সুতো তত সরু, কাপড় তত মিহি—চাটালী নমুনাগুলিতে প্রতি সেনটিমিটারে টানা সুতো ১২, পড়েন ১৫। এই মান আজকের হালকা রেশম বস্ত্রের সমান। সুতরাং অাঁশের নিষ্কাশন ও প্রস্তুতি, সুতো কাটা, কাপড় বোনা এই সব দিকে উৎকর্ষ প্রকাশ পাচ্ছে। ফাইয়ুমের লিনেন বস্ত্রের সুতোগুলিও সমতাপূর্ণ, তাদের পাক এত কম যে প্রায় ধরা যায় না।

চাটালের নমুনাগুলিতে বৈচিত্র্যেরও অভাব নেই, কোনওটায় পড়েন সুতো খুব ঢিলে করে ঢুকিয়ে হয়েছে হালকা জাতীয় বুনন, কয়েকটির প্রান্তে টানা সুতোগুলি পড়েনের পরেও কিছুটা বেরিয়ে থেকে সৃষ্টি করেছে ঝালর, একটি খণ্ডের ধার মুড়ে সেলাই করা, আর একটিতে সুঁচ সুতো দিয়ে মেরামত হয়েছে। কোনও কোনও প্রাচীর চিত্র থেকে অনুমান করা যায় যে হয়তো চাটালবাসীরা রং ও নকশা দিয়ে কাপড় অলংকৃত করেছে, যদিও এই ঝলসানো টুকরোগুলিতে তার কোনও চিহ্ন থাকতে পারে না। এ সব ছবিতে দেখা যায় রঙের লম্বা আঁচড়, স্বস্তিকা, চতুষ্কোণ, ত্রিকোণ ইত্যাদি নকশার নিয়মিত পুনরাবৃত্তি, গালিচা বা দেয়ালে ঝোলানো আলংকারিক বস্ত্রে যেমন থাকে—ছবিগুলি এই রকম প্রাচীর বস্ত্রেরই রূপায়ণ হতে পারে। অবশ্য এই চিত্রাবলীর সঙ্গে কাপড়ের কোনও সম্পর্ক নাও থাকতে পারে, হয়তো কেবল প্রাচীর সজ্জা তারা ; কিন্তু কোথাও কোথাও ধারের পাশাপাশি যেন রঙিন রেখায় মুড়ি সেলাইর অনুকরণ দেখা যায়, তার থেকে মনে হয় শিল্পীর উদ্দীপনা এসেছে বাস্তবিক বস্ত্র থেকে। নকশাকাটা কাপড় তৈরি হয়ে থাকলে প্রথম দিকে নিশ্চয় ছাপগুলি দেওয়া হয়েছে সীলমোহরের মত বস্তু চেপে চেপে।

চাটালের তাঁতীরা কি আঁশ দিয়ে কাপড় বুনেছে তা এ যাবৎ মস্ত এক হেঁয়ালি। এত সরু সুতো ও তার উপরোক্ত গুণাবলী দেখে মনে হয় তা লিনেনেরই মত তিসির রোঁয়া থেকে তৈরি, কিন্তু চাটালে প্রাপ্ত লক্ষ লক্ষ বীজের মধ্যে তিসি বীজের চিহ্ন নেই, তা পাওয়া গিয়েছে দক্ষিণ-পশ্চিম ইরানের আলি কশ গ্রামে, ৬৫০০ বিসিতেই যে সেখানে লিনেন ব্যবহার হয়ে থাকতে পারে এটা তার পরোক্ষ নজির। পশমের গায়ে অণুবীক্ষণের নিচে মাছের আঁশের মত আঁশ দেখা যায়, চাটালী বস্ত্রের রোঁয়াতেও যেন তদনুরূপ চিহ্ন আছে। রাসায়নিক পরীক্ষায় তাদের মধ্যে নাইট্রোজেন প্রকাশ

পেয়েছে, তা প্রোটিনের উপাদান, সুতরাং পশমের মত প্রাণীজাত দ্রব্য নির্দেশ করে। তবে নমুনাগুলি দেখে মনে হয় অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় ব্যবহারের আগে এ কাপড় অনেক দিন ধরে গায়ে পরা হয়েছে, সুতরাং নাইট্রোজেন এসে থাকতে পারে মনুষ্য দেহ থেকে। জলীয় ক্ষারে ফোটাবার পর এক বিজ্ঞানীর আণুবীক্ষণিক পরীক্ষায় রোঁয়ার গায়ে আড়াআড়ি দাগ প্রকাশ পেয়েছে লিনেনে যেমন থাকে—অর্থাৎ আবার উদ্ভিজ্জ উপাদানের দিকে নির্দেশ।

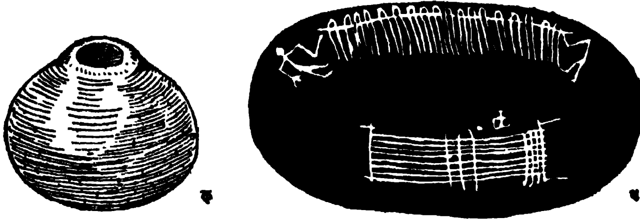
চাটালের এই অমীমাংসিত রহস্য কাহিনী ছেড়ে এ বার বস্ত্র শিল্পের বিভিন্ন পর্যায়ে কলা কৌশল কি ভাবে গড়ে উঠল সে সম্বন্ধে আলোচনা করা যেতে পারে। চাটালী নমুনাগুলি যাই হক না কেন, লিনেনের আঁশ যে বয়নের এক আদিতম উপাদান তাতে সন্দেহ নেই। গাছের ছাল থেকে তার নিষ্কাশনে এবং আঁশগুলি সুতো তৈরির উপযুক্ত করতে কতগুলি বিদ্যা শিখতে হয়েছে। তুলা বা পশম শুধু পরিষ্কার করে আঁচড়ে সোজা করে নিলেই হল. কিন্তু তিসি বা পাটের বাকল আগে কিছু দিন জলে ভিজিয়ে রাখতে হয়, তাতে আঠালো অংশ পচে গলে যায়, তখন পিটিয়ে, আছড়ে, ধুয়ে, চেঁছে আঁশগুলি বার করা চলে। বাকল বেশী দিন ভিজলে আঁশ পচে যেতে পারে. সুতরাং সে দিকে নজর রাখা দরকার। শুকাবার পর আঁচড়ে জট ছাড়িয়ে তবে সুতো তৈরি। ফায়ুমের লিনেন বস্ত্রটি যে ৬০০০ বছরের বেশী কাল টিকে আছে তাতে বোঝা যায় এব সব পদ্ধতি ভাল রকম জানা ছিল।

এক গোছা আঁশ লম্বা করে টেনে নিয়ে পাক দিলে সুতো। সম্ভবত কাজটা ছিল মেয়েদের. প্রথম দিকে তারা হাতে আঁশ টেনে তা ঊরুতে বা হাঁটুর নিচে ঘষে পাক দিয়েছে, তার পর সুতো জড়িয়েছে কাঠিতে। ক্রমে টাকুর ধারণা খেলল কারও মাথায়, চাটালী কাপড় তৈরিতে অর্থাৎ ৬০০০ বিসর আগেই তা ব্যবহার হয়েছে। এক দিকে চোখা এক কাঠির সঙ্গে ওজন জুড়ে ভারী করা – এই ছিল প্রাথমিক টাকু। পোড়া মাটি, পাথর বা হাড় দিয়ে লাট্টু, বালা ইত্যাদির আকারে তৈরি এই ওজনগুলির মাঝখানের ফুটো দিয়ে টাকুর কাঠিটি ঢুকে যেত, মধ্যপ্রাচ্যে ও অন্যত্র নানা নবপ্রস্তর ঘাঁটিতে পাওয়া গিয়েছে বস্ত্র শিল্পের এই সব সাক্ষী, কাঠের কাঠি আর অবশিষ্ট নেই। আঁশ গোছার এক মাথা কাঠির সঙ্গে আটকে টাকু হাতে ঘুরিয়ে ছেড়ে দেওয়া হত, সঙ্গে সঙ্গে আঁশও ছাড়া হত অন্য হাতে। ওজন থাকাতে টাকু সোজা হয়ে

ঝুলত, পাক বজায় থাকত, ফলে পাওয়া যেত সরু সমতাপূর্ণ সূত্র। তা জড়ানো হত টাকুর কাঠিতে। বলা বাহুল্য, আজও নানা দেশে গ্রামাঞ্চলে সুতো কাটার এই রীতি। চরকা নাকি সৃষ্টি হয়েছে ভারতে আজ থেকে হাজার তিনেক বছর আগে।

সুতো কাটার পর কাপড় বোনা। মাদুর বা ঝুড়ির মত তাও আগাগোড়া হাতে করা যায়, কিন্তু অনেকের মতে কাজটা প্রথম থেকেই হয়েছে তাঁতে, যেমন চাটালে। মৌলিক অর্থে সুতোর সারি লম্বালম্বি টেনে রাখার কোনও রকম যন্ত্রকেই তাঁত বলা যেতে পারে, এর থেকেই এই সারিগুলির নাম টানা সুতো। ব্যবস্থাটা দু ভাবে হতে পারে, সহজ ও প্রাথমিক উপায় হল ঘরের মেঝে বা উঠনে পাশাপাশি টানা সুতো পেতে। সে কাজটা হয়েছে চার কোণে চারটি খুঁটি পুঁতে তার সঙ্গে দু মাথায় দুটি দণ্ড বেঁধে, সুতোগুলি তাদের গায়ে জড়িয়ে লম্বা করা থাকত। এক মাথায় হাঁটু গেড়ে বসে তাঁতী (সম্ভবত বাড়ির কোনও মেয়ে) টানা সুতোর উপরে নিচে এক বার করে পড়েন চালিয়ে একটা লাঠি দিয়ে তা চেপে দিয়েছে নিজের দিকে, এ ভাবে তৈরি কাপড়ের উপর বসে ক্রমশ সে এগিয়ে গিয়েছে সামনে। পড়েন চালনার সুবিধার জন্য টানা সুতো একটি করে বাদ দিয়ে অন্যগুলি (যেমন প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম ইত্যাদি) আর একটা লাঠির সঙ্গে জুড়ে দিত তাঁতী, সেটি তুললে দু ভাগে ভাগ হত টানার সারি, তখন তাদের মধ্যে এক বার করে পড়েন চালাত। তার পর লাঠিটা নামিয়ে একটি লম্বা কাঠের পাত তার ধারের উপর দাঁড় করিয়ে অন্য টানাগুলি (দ্বিতীয়, চতুর্থ ষষ্ঠ ইত্যাদি) তুলে উলটো দিকে পড়েন চালাত সে। এই শ্রেণীর তাঁতের প্রকৃত কাঠামো বলে কিছু ছিল না এদের অবশিষ্টও কিছু থাকতে পারে না, তবে প্রমাণ আছে মিশরের বাদারি ঘাঁটিতে প্রাপ্ত ৪৪০০ বিসির এক বাটিতে আঁকা এক ছবিতে (চিত্র ১০খ) এবং মেসোপটেমিয়ার সুজায় ব্যবহৃত এক সীলমোহরের ছাপে, তার তারিখ ৩২০০ বিসি। আজও মধ্যপ্রাচ্যের কোথাও কোথাও এই ভাবে কাপড় বোনা হয়।

এর পরে উন্নত সংস্করণ দেখা দিল খাড়া তাঁতে। প্রথমে সম্ভবত দেয়াল ঘেঁষে দাঁড় করানো দুটি খুঁটির মাথায় আড়াআড়ি একটি লাঠি বসিয়ে হয়েছে যন্ত্রটি। তাঁতী সেটিতে টানা সুতো জড়িয়ে ঝুলিয়ে দিয়েছে, তার পর তাদের টান করে রাখতে নিচে ছোট ছোট গোছা জড়ো করে পাথর বা মাটির তৈরি ওজন বেঁধে দিয়েছে। বাঁধবার সুবিধার জন্য এগুলির মধ্যে গর্ত করা ছিল। ঝোলানো তাঁতেরও কোনও



চিত্র ১০। ক—টাকুর ওজন, মাটির তৈরি। খ—মিশরী মৃৎপাত্রে প্রায় ৪৪০০ বিসি প্রাচীন তাঁতের ছবি।

অবশিষ্ট নেই এই ওজনগুলি ছাড়া, টাকুর ওজন যেমন নানা অঞ্চলে পাকানো সুতোর নির্দেশ দিচ্ছে, তেমনি এগুলিও বিভিন্ন নবপ্রস্তর ঘাঁটিতে তাঁতের সাক্ষ্য দিচ্ছে। একটি লাঠির গায়ে পড়েন সুতো জড়িয়ে তাঁতী পর পর ঝুলন্ত সুতোগুলির ভিতরে বাইরে তা চালিয়েছে, এমনি করে সম্পূর্ণ হয়েছে কাপড়। চাটালের নমুনাগুলি মাটিতে পাতা বা খাড়া তাঁতের যে কোনও একটিতে বোনা হয়ে থাকতে পারে। চাটাল ও ফাইয়ুমের মত টানা পড়েনের সাধারণ বিন্যাসই শুধু চলতি ছিল প্রায় ২৫00 বিসি পর্যন্ত, যদিও সুতো বিভিন্ন ভাবে সাজিয়ে আজ বস্ত্রের বৈচিত্র্য অনেক বেড়েছে। এই বৈচিত্র্যের এক আদি নমুনা রেখে গিয়েছে সুইৎসার্ল্যানডের হ্রদকূলবাসীরা—জটিল ব্রোকেড জাতীয় বুননে লিনেনের গায়ে তোলা রঙিন নকশা। সে অঞ্চলে নবপ্রস্তর যুগের প্রবেশ মধ্যপ্রাচ্যের চার পাঁচ হাজার বছর পরে।

বয়ন শিল্পের আরম্ভে তার চাহিদা মেটাতে খাদ্য শস্যের পাশাপাশি আঁশালো উদ্ভিদের আবাদও দরকার হল, তিসি দিয়ে তার শুরু। অনির্দিষ্ট চাটালী নমুনা-গুলি বাদ দিলে এই তন্তুই মানুষকে দিয়েছে তার প্রথম কাপড় (ক্ষৌম বস্ত্র), প্রাচীন মিশরীদের তাই ছিল পরিধান, পরে মমিদের গায়ে তারা যে কাপড় জড়িয়েছে তাও লিনেন বলে চেনা গিয়েছে। পক্ষান্তরে মেসোপটেমিয়ার লোকে পছন্দ করত পশুর লোম, ক্রমিক হিসাবে সম্ভবত লিনেনের পরেই পশমের স্থান, তবে পশম টেকে না বলে তার নিদর্শন বড় পাওয়া যায় নি। তার পর তুলার চাষ সিন্ধু নদ তীরে,

মহেনজোদারোতে প্রাপ্ত কাপড়ের অবশিষ্টাংশ অন্তত 4000 বছর প্রাচীন, কিন্তু বন্য তুলার তুলনায় এই আঁশের উন্নত জাত থেকে মনে হয় যে তুলার ফলন তার আগেই আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। মহেনজোদারো হরপ্পায় টাকুর ওজন প্রচুর পাওয়া গিয়েছে, তাও নির্দেশ করে যে তুলা বস্ত্রের বেশ চলন ছিল। রপ্তানিও যে হয়েছে তার ইঙ্গিত মেসোপটেমিয়ায় প্রাপ্ত এক খণ্ড কাপড়, তার গায়ে হরপ্পার সীলমোহরের ছাপ। হিরডটাস তাঁর প্রসিদ্ধ ইতিহাস গ্রন্থে ভারত সম্বন্ধে বলেছেন যে সে দেশে গাছে এক রকম পশম ফলে যা মেষ-জাত রেঁায়ার চেয়েও সুন্দর ও উৎকৃষ্ট। এ সব অবশ্য ঐতিহাসিক কালের কথা। আমরা আগে দেখেছি রেশম কীটের পালন প্রথম হয় চীন দেশে, 3500 বিসি নাগাদ। কৃষি ও পশুপালন আয়ত্ত করে মানুষ যেমন কৃত্রিম নির্বাচনের পথে শস্য মাংস দুধের পরিমাণ বাড়িয়েছে, তেমনি একই পদ্ধতির প্রয়োগে ক্রমে বস্ত্রের উপাদানও বেড়েছে, যেমন তিসির আঁশ বা ভেড়ার লোম।

আজ বস্ত্র শিল্প নানা দিকে বহু দূর এগিয়েছে, এখন আমরা প্রয়োজন মত কৃত্রিম আঁশ সৃষ্টি করি, কাপড়ের কলে হাজার রকম সূক্ষ্ম শোভন বস্ত্র তৈরি হয়, টাকু ও তাঁতের উন্নতি ও কার্য কৌশল চমকপ্রদ। কিন্তু এই যন্ত্র যুগলের মূল-নীতিটি ৮০০০ বছর ধরে এখনও টিকে আছে। ভবিষ্যতে হয়তো কোনও দিন তাঁত বাদ দিয়ে পরিধেয় তৈরি হবে, তা হলে সে দিন আমরা এ ক্ষেত্রে সত্যি করে নবপ্রস্তর যুগকে পিছনে ফেলব।

৭। সমাজ সংসার

এই বিবিধ মৌলিক আবিষ্কারের ফলে ব্যষ্টির ও সমষ্টির জীবনে যে গুরুতর রূপান্তর ঘটেছিল তা বলা বাহুল্য এ বার আমরা সে কালের সমাজ চিত্রটির দিকে মন দিতে পারি। কোনও এক কালের জীবন ধারা নতুন আবিষ্কারের দ্বারা প্রভাবান্বিত বটে, কিন্তু শুধু আবিষ্কারের বর্ণনার থেকে তার সম্পূর্ণ উপলব্ধি হয় না। কি নিয়ে সাধারণ নর নারীর দিন কাটত, দেহ মনের শক্তি কি কাজে কি ভাবনায় ক্ষয় হত, কি ছিল তাদের সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষা এ সবের জ্ঞানে যুগ ধর্মের প্রকৃত পরিচয়, এরই মধ্যে যুগের নাড়ির স্পন্দন, তাই ঐ মানবিক চিত্রটি আমাদের বিশেষ কৌতূহলের বিষয়।

সৌভাগ্যবশত, নবপ্রস্তর কালের মানুষরা পুরামানবদের মত আর অতটা অস্পষ্ট নয়, তাদের সম্বন্ধে আমরা অনেক বেশী জানি, আর অনেকটা অনুমান করে নিতে পারি অন্যদের দেখে। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে এখনও নানা উপজাতি বাস করে, অথবা সে দিন পর্যন্ত করেছে, যাদের সংসার পুরনো ছাঁচে ঢালা, নবপ্রস্তর কালের কয়েকটি আবিষ্কারকে কেন্দ্র করে যাদের জীবন। দক্ষিণ ভারতের টোডা ও উত্তর মেরু অঞ্চলের ল্যাপল্যানডবাসীদের মত কোনও কোনও ছোট গোষ্ঠীর জীবিকা শুধু পশুপালন, তারা চাষ জানে না অথবা তা নিতান্তই সামান্য। ফিনল্যানডের ল্যাপরা বলগা হরিণ থেকে শুধু মাংস পায় না, তার চর্ম তাদের পোশাক ও তাঁবুরও উপাদান। ব্রেজিলের কামায়ুরা ইনডিয়ানরা কেবল অল্প কিছু তামাক ফলায় এবং মাঝে মাঝে কিছু ভুট্টা গজায়। উত্তর জাপানের আইনুরা সামান্য উদ্যান কর্ষণ করলেও তাদের নির্ভর পশু ও মাছ শিকার, পালিত পশু এ কাজে সাহায্য করে। নিউ গিনির কোনও কোনও উপজাতির চাষ এখনও প্রাথমিক ধরনের, মাটির উর্বরতা ফুরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত তারা কচু লাগায়, তার পর নতুন জমিতে সরে যায়; বর্তমান জগতে অল্প যে কয়েক গোষ্ঠী উৎপাদনের কাজে ঘষা পাথরের প্রকৃত নবপ্রস্তর উপকরণ ব্যবহার করে এই উপজাতিরা তাদের অন্যতম। অধিকাংশ আধুনিক নবপ্রস্তর সমাজে, যেমন পলিনেশিয়ায়, বহির্জগৎ থেকে লোহা ও ইস্পাত প্রবেশ করেছে।

উত্তর আফ্রিকায় মরক্কোর অ্যাটলাস পর্বতমালার দক্ষিণ পাশে এক উর্বর উপত্যকায় কয়েক হাজার বারবার আদিবাসীর বাস। লোহার কোদাল বা টর্চ বাতির মত অভিনব বস্তুর সঙ্গে অল্প স্বল্প পরিচয় থাকলেও তাদের প্রাগৈতিহাসিক জীবন ধারা প্রায় অপরিবর্তিত, বহু শতাব্দী ধরে পাহাড়ের আড়ালে বিচ্ছিন্ন থাকার ফলে রীতি নীতি প্রায় অক্ষুণ্ণ থেকে গিয়েছে। এক ছোট নদীকে ঘিরে জীবন বয়ে চলে, নালি বানিয়ে তার জল তারা আনে গম ও যবের খেতে। তা ছাড়া পশু-পালন, গৃহ নির্মাণ, মৃৎপাত্র, বস্ত্র শিল্প ইত্যাদিতে নবপ্রস্তর যুগের ধারা স্পষ্ট প্রতীয়মান। বসন্ত ঋতুর বৃষ্টি যখন শুরু হয় এবং ভেড়ারা বাচ্চা দেয় তখন খেতের কাজ আরম্ভ করে বারবাররা। এক মাসের মধ্যে শস্য বোনা শেষ করে পুরুষ ও বালকরা পশুর পাল নিয়ে পাহাড়ের উচ্চে ওঠে, সেখানে ছাগ-লোমের তৈরি কাপড়ের তাঁবু তাদের আশ্রয়। পশু চরিয়ে গ্রীষ্মটা কাটে, তার পর তারা নিচে নেমে আসে শস্য কাটতে।

এই বারবারদের ধর্ম ইসলাম, কিন্তু বহু শতাব্দীর রীতি অনুসারে প্রাকৃতিক শক্তির পূজা অর্চাও মেনে চলে তারা। লিখন জানা নেই, ইতিহাস বলতে মুখে মুখে প্রচলিত প্রাবাদিক শ্রুতি কথা ও কাহিনী। শিল্প কলার প্রকাশ চিরাগত উপজাতীয় গানে, বস্ত্রে উপজাতীয় নকশা বয়নে, মৃৎপাত্রে তার চিত্রণে। লাঙল অনাবশ্যক মনে করে এরা তা গ্রহণ করে নি, চাষের কাজে কোদাল ও আপন পেশী শক্তিই যথেষ্ট। প্রকৃত চাকা, টানার কাজে পশুর প্রয়োগ বা ঘর বানাতে খিলান জানা নেই। তথাপি এই সমাজ কার্যকর ও দায়িত্বশীল। সভায় বসে গণ-তান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রতি বছর তারা মোড়ল ও বিচারক নির্বাচন করে। জল, সেচ প্রণালী, শস্যাগার এবং পশুর বিচরণ ভূমি সমষ্টির স্বার্থে অত্যাবশ্যক বলে সেগুলি সাধারণের যৌথ সম্পত্তি এবং তাদের সংরক্ষণ সকলের দায়িত্ব। খেত ও পালিত পশু ব্যক্তিগত সম্পত্তি। বেঁচে থাকতে যা যা দরকার তার সবই উৎপাদিত হয় উপজাতির মধ্যে, প্রায়ই পরিবারের মধ্যেই, কিন্তু অল্প স্বল্প অতিরিক্ত রোজগারের পরিবর্তে সভ্য জগৎ থেকে বিলাস দ্রব্যও কিছু কেনা সম্ভব হয়, যেমন চিনি, মেয়ে-দের পোশাকের কাপড় এবং পুঁতি।

সমাজের নানা ভাগ। সবচেয়ে ছোট একই পূর্বপুরুষজাত কয়েকটি পরিবার, একটি গ্রামে তাদের বাস। এমনি কয়েকটি গ্রাম জুড়ে একটি বংশ, কয়েকটি বংশ

মিলে এক উপজাতি (tribe) ; তারা আবার বিশেষ উদ্দেশ্যে একযোগে কাজ করে, যেমন প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে বা বিচরণ ভূমির এজমালি ব্যবহারে। সম্পত্তি বা উত্তরাধিকার নিয়ে বিরোধ দেখা দিলে নির্বাচিত বিচারকরা সাধারণত সকলের সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে সফল হয়, নিষ্পত্তি না হলে বা মেজাজ চড়ে গেলে বিবাদটা মুলতুবি থাকে—দরকার হলে ২০ বছর পর্যন্ত।

বাৎসরিক ভারী কাজ ও প্রাত্যহিক লঘু কৃত্য পুরুষদের। অধিকাংশ সময় তাদের বাইরেই কাটে। ভেড়া ছাগল গরু চরানো, মরুবাসী যে যাযাবর হানাদাররা শস্যাগার লুঠ করতে আসে তাদের বিরুদ্ধে পাহারা, চাষের আগে কোদাল দিয়ে কঠিন পাথুরে মাটি ভাঙা, মাঠে খালের জল আনা, বাড়ি তৈরি ও মেরামত এই নিয়ে দিন কাটে, যদিও তারই মধ্যে আড্ডা, চা ও ধূমপানেরও সময় মেলে। বাড়ির দেয়াল বানাতে বড় বড় কাঠের ছাঁচে কাদা ঢেলে তা চাপে নির্মাতারা, তার পর ছাঁচের কাঠ খুলে কাঁচা মাটি রোদে শুকাতে দেয়, এ ভাবে দেয়াল গড়ে ওঠে কখনও দোতলা পর্যন্ত। ঘর বেশী ঠাণ্ডা না হয় সে জন্য দেয়ালে শুধু অল্প কয়েকটি ছোট্ট জানলা, তা দিয়ে আলো ঢোকে, এক তলায় আশ্রিত গরু ভেড়ার দেহ-তাপ বাড়ি গরম রাখতে সাহায্য করে। বালিকা বয়স থেকেই মেয়েদেরও কঠিন ও হালকা কাজের ব্যস্ততা। জ্বালানী সংগ্রহ করতে রোজ ভোরে তারা বেরিয়ে পড়ে পাহাড়ের দিকে, তার ঢালু গায়ে ঘুরে ঘুরে কাস্তের মত ছুরি দিয়ে কাটে দ্রুত-জ্বলা এক প্রকার আঁশালো ঘাস, তা খুঁজতে ক্রমে দূরে দূরে যেতে হয়, শীতের ঠিক আগে হয়তো ১৫-১৬ কিলোমিটার পর্যন্ত, তার পর মস্ত মোটের নিচে নুয়ে অতটা পথ হেঁটে তারা ঘরে ফেরে, আসন্ন শীতের সম্বল এই ইন্ধনে বোঝাই করে ফেলে সারা বাড়ি। বীজ বোনা আর শস্য কাটার মাঝখানে দারুণ গ্রীষ্মে চাষের দায়িত্বও মেয়েদের। আদিম ধাঁজের টাকুতে পশমের সুতো পাকানো এবং তাঁতে তা বোনা, তা ছাড়া রান্না ও রুটি সেঁকা, দুধ দোহানো, যাঁতায় শস্য পেষা এ সব তো আছেই।

হেমন্তে হাটের উৎসব জমে, সেটা বিয়ের বাজারও বটে। তার পর এক কালে সম্পন্ন হয় অনেকগুলি বিবাহ, নবদম্পতিরা সকলে এক প্রকাণ্ড তাঁবুতে প্রথম রাত্রি কাটায়। বিবাহিতারা নামের সঙ্গে পিতার পদবী রাখে। বিবাহ বিচ্ছেদ খুবই সহজ—স্ত্রী স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে গেলেই হল। বিধবারা সম্পত্তি পেতে পারে, তবে তা দেখাশোনা করতে আদালত নিয়োগ করে স্বামীর এক পুরুষ নিকটা-

স্ত্রীকে, জমি বেচতে তার সম্মতি লাগে। প্রাক্তন ফরাসী ও বর্তমান স্বাধীন মরককো সরকার আধুনিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করে সামাজিক উন্নয়নের চেষ্টা করেছে, কিন্তু তাতে বাধাও দেখা দিয়েছে। যেমন, স্কুল ঘর তৈরি করা সহজ, কিন্তু তাতে ছেলেদের পাঠালে ভেড়া ছাগল চরাবে কে।

এই বারবারদের মত এতটা না হলেও পৃথিবীর নানা অংশে, বিশেষত অনুন্নত দেশগুলিতে, কিছু কিছু প্রাগৈতিহাসিক প্রথা আজও টিকে আছে। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপবাসীরা আদি কালের 'কাটো পোড়াও' পদ্ধতি প্রয়োগ করে নতুন জমি চাষের যোগ্য করে। চতুর্থ সহস্রকের মিশরে যে কাঠের লাঙল চিত্রিত দেখা যায় আজও ইথিওপিয়ায় তদনুরূপ হাল দিয়ে চাষ হচ্ছে। অনেক প্রত্নবিতের বিশ্বাস ভারতে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ৫০০০ বছর আগে ধানের চারা জল-ডোবা জমিতে স্থানান্তরণের ব্যবস্থা সূচিত হয়েছিল, হাতে হাতে পুনঃরোপণ এখনও এই অঞ্চলের নানা স্থানে অপরিবর্তিত। শস্য ছাঁটা, দানা থেকে ভুষি ছাড়ানো, শিল নোড়ায় গম বা ভুট্টা ভেঙে রুটি বানানো, খেতে মাচা বানিয়ে বানর বা পাখি তাড়ানো ইত্যাদি নানা কাজে ইতস্তত আদিম রীতিই চলন্ত। কিন্তু বর্তমান জগতে নানা সূত্রে দ্রুত যোগাযোগ বাড়ছে, দূর দেশ চলে আসছে কাছে, ফলে শিল্পের নানা আধুনিক উপকরণ ও কৌশল সহজে প্রবেশ করছে অনুন্নত অঞ্চলে, যেমন কৃষির ক্ষেত্রে রাসায়নিক সার, কীটনাশক, জল সেচের পাম্প ইত্যাদি পৌঁছাচ্ছে গণ্ডগ্রামে। সেটাই স্বাভাবিক ও কাম্য, কিন্তু এই সব ক্ষুদ্র গবাক্ষ দিয়ে পুরাবিজ্ঞানীরা দেখেন সে কালের সমাজটি, শুধু তাঁরাই হয়তো আক্ষেপ করবেন এই হাওয়া বদলে। এই ধরনের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য ছাড়াও প্রত্নবিজ্ঞানীদের নজির থেকে পুরাকালীন ঘরোয়া জীবনের ছবিটি অনুমান করা যায়। অবশ্য যেমন স্থান ও পাত্র ভেদে নবপ্রস্তর সমাজে বৈচিত্র্য ও বৈষম্য ছিল, তেমনি কালের অগ্রগতির সঙ্গেও এই সমাজের চেহারা বদলেছে, নতুন আবিষ্কারের ছাপ পড়েছে। কিন্তু নির্দিষ্ট কোনও সর্বজনীন সর্বকালীন চিত্র না থাকলেও নবপ্রস্তর সমাজের মৌলিক রূপটি মোটামুটি গড়ে তোলা যায়।

আত্মীয়তার সূত্রে গাঁথা কয়েকটি পরিবার নিয়ে একটি বংশ, কয়েকটি বংশ নিয়ে এক একটি উপজাতি—প্রাথমিক সমাজের এই গঠন আজ পর্যন্ত অনেক পৌরাণিক সম্প্রদায়ে টিকে আছে, যেমন বারবারদের মধ্যে। কখনও কখনও বিভিন্ন

পরিবারের মধ্যে সাময়িক ভাবে জমি ভাগ করে দেওয়া হয় চাষের জন্য, পশু চরাবার ভূমি সর্বজনীন। প্রধানত কৃষিজীবীদের সমাজে স্ত্রীলোকের দান বেশী, তাই তাদের কর্তৃত্ব প্রধান এবং বংশের ধারা গণনা করা হয় মায়ের দিক থেকে, তারা মাতৃতন্ত্রের (matriarchy) অধীন। পশুপালকদের মধ্যে একই কারণে পুরুষের অর্থ-নৈতিক ও সামাজিক প্রতিপত্তি অপেক্ষাকৃত বেশী, তাদের রীতি পিতৃতন্ত্র (patriarchy)। আজ সব 'সভ্য' সমাজই পিতৃতান্ত্রিক, কিন্তু এ দেশেই সাঁওতালদের মধ্যে এখনও মাতৃতন্ত্রের চিহ্ন দেখা যায়। প্রাচীন কালে দক্ষিণ ভারতে দ্রাবিড়রা মাতৃতন্ত্র মেনে চলত, বহিরাগত আর্যরা ছিল পিতৃতান্ত্রিক।

বহু লক্ষ বছর আগে পুরাপ্রস্তর আমলেই স্ত্রী পুরুষের মধ্যে কাজের ভাগাভাগি হয়েছে কিছু, বিশেষত খাদ্য সংগ্রহে—মেয়েরা ও শিশুরা ফল মূল ক্ষুদ্র জন্তু যোগাড় করেছে, শক্তি ও সাহসের কাজ শিকারে গিয়েছে পুরুষ। নবপ্রস্তর সমাজে এই শ্রম বিভাগের অবকাশ বাড়ল, আজকের উদ্যান-কৃষীদের ব্যবস্থায় সাধারণত মেয়েরা খেত চষে, কুমোরের কাজ করে, সুতো পাকায়, তাঁত চালায়, গহনা ও আনুষ্ঠানিক দ্রব্যাদি গড়ে; আর পুরুষরা চাষের আগে জমি পরিষ্কার করে, শিকারে যায়, মাছ ধরে, পালিত পশুর দেখাশোনা করে, ছুতোরের কাজ ও যন্ত্রপাতি তৈরিও তাদের হাতে। সে কালেও এই ব্যবস্থা মোটামুটি চলতি ছিল হয়তো। ক্রমে হস্তশিল্পী-দের মধ্যেই স্বতন্ত্র পেশা দেখা দিল, এই দূর অতীত সূচনা থেকে পরে নানা দিকে বিশেষজ্ঞদের আবির্ভাব হয়েছে—আজ আমরা প্রত্যহ যে হাজার রকম জিনিস ব্যবহার করি তাদের সৃষ্টিতে দরকার হয় নানা শ্রেণীর দক্ষতা।

চাটাল হুয়ুকের চারুশিল্পীরা এমন নিপুণ হাতে অবসিডিয়ান ঘষে মসৃণ করেছে যে কোথাও একটু আঁচড়ও নেই, দেখে মনে হয় এক বিশেষ কর্মী দল এই পার-দর্শিতা অর্জন করেছিল। উৎকৃষ্ট মৃৎপাত্র, প্রাচীর চিত্র, বোনা কাপড় এ সবের নজির থেকেও মনে হয় ৬০০০ বিসিতে সেখানে কর্মীদের মধ্যে বিশেষজ্ঞ দেখা দিয়েছিল। জেরিকোর বিশাল শিলা প্রাচীরগুলিও অনুরূপ নির্দেশ দেয়। বেইধার কারিগররা যে কেউ জানত হাড়ের কাজ, কেউ বানাত মালার পুঁতি, সেখানে যে পৃথক কসাইখানা ছিল হয়তো, তার ইঙ্গিত পেয়েছি আমরা। এমন কি গ্রামীণ শিল্পের তদারকি করতে পরিচালকও দেখা দিয়ে থাকতে পারে সেখানে আজ থেকে ৮৫০০ বছর আগে। অবশ্য যারা এই সব পেশায় হাত পাকিয়েছে তারা যে সর্বদা তা নিয়েই

ব্যস্ত ছিল, কোনও সাম্প্রদায়িক কাজে হাত লাগায় নি—বিশেষত প্রথম দিকে—তা বলা যায় না। খাদ্য উৎপাদন শিখে পেটের চিন্তা কমল, বীজ বোনার পর যখন মাঠের কাজে ছেদ পড়েছে তখন লোকে অবসর সময়ে নিজ নিজ দক্ষতা কাজে লাগিয়েছে যন্ত্রপাতি, অলংকার ইত্যাদি বানিয়ে, যাতে পারিবারিক সচ্ছলতা বাড়ে।

এই সব শিল্পের কাঁচামাল আদান প্রদান হয়েছে দূর দূরান্তরে, গড়ে উঠেছে বিনিময় বাণিজ্য ও যোগাযোগ। স্বভাবতই এ ক্ষেত্রে নবপ্রস্তর যুগের শেষাংশের তুলনায় প্রথম অংশে প্রমাণ কম, তার এক কারণ এই যে তখনকার গৃহস্থালি অনেকটা স্বয়ংসম্পূর্ণ, দৈনন্দিন প্রয়োজন মোটামুটি নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক গণ্ডির মধ্যেই মেটানো সম্ভব হয়েছে। তা সত্ত্বেও কাছাকাছি কেন্দ্রের মধ্যে যোগাযোগের কিছু কিছু চিহ্ন প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়, যথা আলংকারিক বা বিলাস দ্রব্যের বিনিময়ে।

অবসিডিয়ান থেকে নানা বস্তু তৈরি হয়েছে—ক্ষুরধার অস্ত্র, আয়না বা পাত্রের মত কাজের জিনিস অথবা সূক্ষ্ম কারুকার্যমণ্ডিত মনোজ্ঞ আনুষ্ঠানিক উপকরণ। অবসিডিয়ানের প্রাপ্তি স্থান থেকে দূর দূরান্তে উদঘাটিত এ সব বস্তু সে কালে তার সমাদরের প্রমাণ, পদার্থ বিজ্ঞানের বর্ণালী-লিখন (spectiography) পদ্ধতি প্রয়োগ করে বাণিজ্য পথগুলিও চিহ্নিত হয়েছে, কারণ গঠিত সামগ্রীতে অবসিডিয়ানের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে কোন আগ্নেয়গিরিতে তার উদ্ভব তা জানা যায়। ৮০০০-৫৫০০ বিসিতে আনাতোলিয়ার থেকে এই কালো কাচ পশ্চিমে হাসিলার, দক্ষিণে জেরিকো ও বেইধা পর্যন্ত ছড়িয়েছে। যারা উপযুক্ত আগুনে পাহাড়ের কাছে থেকেছে তারা সম্ভবত বস্তুটি সংগ্রহ করে জমিয়েছে, তার বদলে পেয়েছে দুষ্প্রাপ্য মাল, এ ভাবে বাণিজ্য গড়ে উঠেছে।

চাটাল হুয়ুকের উদ্ধারকর্তা জেমস মেলার্ট মনে করেন স্থানটির বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধির কারণ অবসিডিয়ান বাণিজ্য। এই বস্তুর এক প্রধান উৎস অঞ্চলে তা অবস্থিত, সুতরাং এই ঘাঁটিকে কেন্দ্র করে পণ্য দ্রব্য ও বিদেশীদের আনাগোনা চলত। কাঁচামালের পরিবর্তে চাটালীরা পেয়েছে প্রায় ১৬০ কিলোমিটার দক্ষিণে ভূমধ্য সাগরের শামুক ঝিনুকের খোল, আরও পুবে টরাস পর্বতমালার দক্ষিণাঞ্চল থেকে উৎকৃষ্ট চকমকি। তা ছাড়া বাণিজ্য পথের এই কেন্দ্র স্থলে নানা অঞ্চল থেকে আসত মূর্তি গড়বার অ্যালাবাস্টার ও মর্মর শিলা। বাদামী কয়লা লিগ্‌নাইট, নানা জাতের ক্যাল্‌সিদনি—স্বচ্ছ সাদা. অথবা স্বচ্ছ লাল কার্নেলিয়ান, কিংবা লাল অস্বচ্ছ জ্যাস্‌-

পার, স্ফটিক ইত্যাদি মণি। বিদেশী বাদাম ও ফলেরও চিহ্ন আছে। য়োরোপীয় ও এশীয় জাতের কঙ্কালে পরোক্ষ নজির পাওয়া যায় যে চাটালে বিদেশীদের যাতায়াত বা বসবাস ছিল। অবসিডিয়ানের তৈরি আয়না ও তীরের ফলা, চকমকির ছোরা, হাড়ের পিন, ধাতুর অলংকার, পাথরের ও কাঠের পাত্র এ সব এত উৎকৃষ্ট ও প্রচুর যে এদেরও রপ্তানি হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু কারিগরের কর্মশালা বা গুদামের মত বাণিজ্যের সমর্থক কিছু দেখা যায় নি। হয়তো চাটালে যে অংশটুকুর খনন হয়েছে তা কারিগরদের অঞ্চল নয়, অন্যত্র নজির পাওয়া যাবে। খনিত অংশে দেবালয় বা পূজা ঘরের প্রাচুর্য দেখে মনে হয় অন্য এক ধরনের শিল্প গড়ে উঠেছে, তাও আকর্ষণ করেছে কাছের ও দূরের মানুষ—সেই আলোচনা একটু পরে।

তুরস্ক ও উত্তর ইরানের পাহাড় থেকে অবসিডিয়ান পেঁাছেছে পশ্চিম এশিয়ার সর্বত্র, গ্রীসে কৃষি বৃত্তি প্রবেশের পর যন্ত্রশিল্পীরা তা আমদানি করেছে ঈজীয় সাগরের মেলস দ্বীপ থেকে। ৭০০০ বিসির মধ্যে জেরিকোতে বিনিময় বাণিজ্য গড়ে উঠেছিল, শহরটির নিজের ছিল অদূরবর্তী মরা সাগরের আকরিক পদার্থ, বিশেষত লবণ, প্রাচীন জগতে খাদ্য সংরক্ষণের জন্য তা অতীব সমাদৃত। মিশর থেকে জেরিকো এনেছে মনোহর নীল ফিরোজা, উত্তরে আনাতোলিয়ার থেকে সবুজ মরকত মণি ও অবসিডিয়ান, দক্ষিণে বেইধা ও লোহিত সাগর থেকে নানা রঙের নানা রূপের কড়ি ঝিনুক। সে কালের আর এক মূল্যবান বস্তু চিত্র শিল্পে ও প্রসাধনে বহুবাঞ্ছিত লাল হিমাটাইট, তাও জেরিকো আমদানি করেছে বেইধা থেকে। উত্তরে দক্ষিণে স্বাভাবিক বাণিজ্য পথে অবস্থিত বলে সম্ভবত জেরিকোতে নিয়মিত বিদেশীদের আনাগোনা ও বসবাস ছিল।

মিশরের বসতিতে ভূমধ্য ও লোহিত সাগর থেকে ঝিনুকাদি খোলক আমদানি হত, পরবর্তী কালের জার্মেনিতে ভূমধ্যসাগরী খোলকের তৈরি বালা উদ্ধার হয়েছে। মিশরের খনি থেকে চকমকি গিয়েছে অন্যত্র, য়োরোপে সিসিলি পর্টুগাল ইংল্যানড ফ্রানস বেলজিয়াম সুইডেন ও পোল্যানডের চকমকি পাথরও গিয়েছে বাইরে। এ সব অঞ্চলের তৈরি কুড়াল বহু দূর পর্যন্ত পাওয়া যায়। এই পণ্যগুলির পরিবর্তে অধিবাসীরা সম্ভবত শস্য ও মাংস আদায় করেছে। শুধু চকমকি নয়, ধারালো ফলা তৈরির উপযুক্ত অন্যান্য পাথরও দূর দূরান্তরে বয়ে নেওয়া হয়েছে, মাটির পাত্রও যে গ্রামে গ্রামে অদল বদল হত তার চিহ্ন কোথাও কোথাও পাওয়া যায়। বর্তমান

নবপ্রস্তর সমাজে নিজেদের মধ্যে বাণিজ্য দেখা যায়, কখনও কখনও বেশ দূর পর্যন্ত ; প্রশান্ত মহাসাগরে মেলানেশিয়া ও নিউ গিনির কোনও কোনও গ্রাম মৃৎপাত্র সৃষ্টিতে বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে, এরা দূর দূরান্তরে এমন কি সাগর পেরিয়ে পর্যন্ত নিজের মাল পাঠায়।

ব্যক্তিগত বৃত্তি ও শ্রমের ভাগাভাগি সত্ত্বেও সাম্প্রদায়িক স্বার্থে কতগুলি ভারী কাজে সমষ্টির উদ্যোগ ও সহযোগিতা দরকার হয়েছে। বাস বা চাষের জন্য জঙ্গল সাফ করা, শস্য কেটে ঘরে আনা, জল নিকাশের নালি তৈরি, বন্যা কিংবা বন্য জন্তুর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা এ সবের মধ্যে নিশ্চয় কয়েকটি পরিবারের এক-যোগে হাত লাগাতে হত। জেরিকোর প্রাচীর বা চাটালের মন্দির অনেকের সমবেত উদ্যোগ ও শ্রমেই সম্ভব হয়েছে। য়োরোপে স্থায়ী বসবাস আরম্ভ হলে কোনও কোনও গ্রামে বিভিন্ন বাড়ির মধ্যে যোগাযোগের জন্য রাস্তা বা গলি দেখা যায়, আবার কোথাও গ্রামটি খাত বা বেড়া দিয়ে ঘেরা, পশু বা মানুষ শত্রুর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষায় উদ্দেশ্যে। এ সব কাজে সমষ্টির স্বার্থ সংশিষ্ট, সুতরাং বিভিন্ন পরিবারের শ্রম একত্র নিয়োজিত হয়েছিল অনুমান করা যায়।

কুমোরের কাজে গোষ্ঠীর সহযোগিতা না হলেও চলে, কিন্তু আজও দেখা যায় আফ্রিকার গ্রামে মেয়েরা এক জায়গায় জড়ো হয়ে নিজের নিজের ঘটি হাঁড়ি বানায়, একে অন্যকে সাহায্য করে, সকলের তৈরি বস্তুতে একই ধারা বা রীতি। প্রাগৈ-তিহাসিক পাত্রেও তেমনি দেখা যায় এক গ্রামের এক ধারা, তার থেকে মনে হয় সে কালেও ঐ রকম সাম্প্রদায়িক রীতি প্রচলিত ছিল। হয়তো কোনও প্রয়োজনের তাগিদের চেয়ে বেশী জরুরী ছিল মেয়েলি গল্প গুজবের আকর্ষণ।

সে কালের দৈনন্দিন ঘরকন্নার একটি চিত্র আমরা কল্পনা করতে পারি। এক বারোয়ারি আঙিনাকে ঘিরে কয়েকটি মাটির ঘর, এই আঙিনাই প্রধান কর্ম ক্ষেত্র। মেয়েরাই যেন বেশী ব্যস্ত—কেউ সুতো পাকাচ্ছে, কেউ গম ভাঙছে শিল নোড়াতে, কেউ রুটি সেঁকছে, এ দিকে ও দিকে অন্যরা মাটি মাখছে ঘটি বাটি তৈরির জন্য, দুধ দোহাচ্ছে বা পশম বার করছে ভেড়ার গা থেকে। এরই মধ্যে অবশ্য গল্প গুজব, বিভিন্ন ঘরের খবর আদান প্রদান চলছে। বেইধার মত জায়গায় তরুণীরা হয়তো গিয়েছে দোকানে পুঁতির মালা বা অন্যান্য অঙ্গ সজ্জার খোঁজে। পুরুষরা কেউ ঘরের চাল মেরামত করছে ডালপালা খড় কাদা দিয়ে,

অথবা কাটারিতে শান দিচ্ছে। কেউ হয়তো শিকারে বেরিয়েছিল সকাল বেলা, এখন একটা হরিণ কাঁধে করে ফিরছে, ছেলেরা দৌড়ে গিয়েছে তাকে অভ্যর্থনা করতে, শিকারীর কুকুরটিও লেজ নাড়ছে খুশিতে। শিশুরা নানা রকম দুষ্টামিতে ব্যস্ত—একটা ছাগল ঘুরতে ঘুরতে চলে এসেছে উঠনে, কেউ হয়তো তার কান ধরে টানছে, ধমক খাচ্ছে মায়ের কাছে। দু একটি বৃদ্ধ ঝিমাচ্ছে কোণে বসে। দূরে গরু চরছে মাঠে, তার পিছনে সোনালি শস্য খেত চকচক করছে দুপুরের রোদে।

কর্ম কৌশলের আদান প্রদানে, ভারী কাজে যৌথ সহযোগিতায় যেমন সহজ হয়েছে জীবন, তেমনি কাছাকাছি বসবাসে মানুষ পেয়েছে নিরাপত্তা ও সাহচর্য। সবাই সবাইকে জানত, একই গ্রামে স্থায়ী সান্নিধ্যে থেকে সমষ্টির মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বেড়েছে, পারিবারিক উৎসব অনুষ্ঠানে ডাক পড়েছে প্রতিবেশীদের। আবার এই সান্নিধ্যের ফলে পরিবারের স্বার্থ নিয়ে মাঝে মাঝে গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধ ও কলহ দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। মৃত পূর্বপুরুষরা যে কাছেই সমাধিস্থ তাও দৃঢ়তর করেছে পারিবারিক সংহতি, দিয়েছে সান্ত্বনা। স্থায়ী জীবনে ব্যক্তিগত সম্পত্তি সঞ্চয়ের উৎসাহ বেড়েছে, ভিটে মাটি খুঁড়ে উদ্ধৃত নানা বস্তু তার সাক্ষী—মেয়েদের ঘরোয়া কাজের বিবিধ উপকরণ, যেমন শিল নোড়ার মত ভারী জিনিস যা যাযাবর জীবনে বয়ে বেড়ানো যেত না, পুরুষদের যন্ত্র, অস্ত্র ও আরও অনেক কিছু। কোনও কোনও খাদ্য দ্রব্যও ঘরে অনেক দিন জমিয়ে রাখা গিয়েছে। সম্পত্তি বাড়তে বাড়তে ক্রমশ বৃহত্তর আবাস দরকার হল, তেমনি পারিবারিক খাদ্য সংগ্রহ দুর্বল করল গোষ্ঠীর সকলে সমান ভাগ করে খাওয়ার চিরাগত রীতি।

খাদ্য সমস্যা সহজ হয়ে জন্মহার ও আয়ু দুইই অনেকটা বেড়েছিল, সুতরাং পরিবারের এক প্রান্তে শিশু অন্য প্রান্তে বৃদ্ধ বেশী চোখে পড়ে। মানব ইতিহাসের এই পর্যায়ে শিশুরা যেন বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে। এ যাবৎ তাদের থেকে বড় কোনও কাজ পায় নি বাপ মা, বড় না হওয়া পর্যন্ত তারা পরিবারের বোঝা হয়েই থেকেছে। কিন্তু শিশুরা খেত থেকে আগাছা তুলতে পারে, শস্যনাশক পশু পাখির বিরুদ্ধে পাহারাদারি করতে পারে, ছাগল ভেড়া চরাতে পারে মাঠে, সুতরাং ঐ সময়ে তারা কাজে লেগেছিল নিঃসন্দেহে।

ইতিপূর্বে চল্লিশের বেশী বাঁচত কম লোকই, কিন্তু নবপ্রস্তর সমাজে বৃদ্ধ বৃদ্ধারা আর আশ্চর্য কিছু নয়, ঘরে ঘরে প্রায়ই দেখা যেত তাদের। জীবন যাত্রা

সহজ হলে যে মৃত্যুহার কমে এবং আয়ু দীর্ঘতর হয় তা মানুষের ইতিহাসে বার বার দেখা যায়, নবপ্রস্তর বিপ্লবের পরেও যে বয়স্ক ব্যক্তির সংখ্যা অনেক বেড়ে উঠেছিল তার যথেষ্ট প্রমাণ মেলে। যাযাবর জীবনে তারা ছিল বোঝা, প্রায়ই অনাদৃত, কিন্তু প্রবীণরা অভিজ্ঞতা ও স্মৃতির ভাণ্ডার, তাদের পরামর্শ এখন ব্যবহারিক ক্ষেত্রে গৃহস্থদের কাজে লাগত। প্রবীণদের এই সম্পদ বাচ্চাদেরও কাছে টেনেছে বাস্তব ও কল্পনায় মেশানো উপকথা শুনতে. দাদু দিদিদের ঘিরে বসেছে তারা 'এক যে ছিল' গল্পের লোভে, শিশু ও বৃদ্ধের সহজ মিতালি নিবিড় হয়েছে মোহময় কথা ও কাহিনীর আকর্ষণে।

উদর চিন্তা থেকে মুক্তি ও সহজতর জীবন ছাড়াও লোকসংখ্যা বৃদ্ধির আর এক কারণ হয়ে থাকতে পারে শিশুদের কার্যকারিতা। আজও আমাদের চাষীরা খেতে না পেলেও ছেলে চায় খেতে কাজ করবার জন্য।

নবপ্রস্তর যুগে লোক বৃদ্ধির প্রমাণ আছে দেশে দেশে, যেমন মিশরে নীল নদের উপত্যকায় বর্ধিষ্ণু গ্রামের বা উত্তর য়োরোপের সমতল ভূমিতে কবরের সংখ্যায়। য়োরোপে এ যুগের দৈর্ঘ্য পুরাপ্রস্তর যুগের ১০০ ভাগেরও কম, তবু সেখানে এরই মধ্যে যত কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছে আগের তুলনায় তা কয়েক শো গুণ বেশী। মিশর ও পশ্চিম এশিয়াতেও এ যুগের বহু কঙ্কাল আবিষ্কৃত হয়েছে।

পুরাপ্রস্তর ঘাঁটির তুলনায় নবপ্রস্তর সম্প্রদায় সংখ্যায় বেশী ছিল, আকৃতিতে বড় ছিল। তবু আমাদের মাপে সে কালের গ্রাম যে খুব বৃহৎ ছিল না তা অনুমান করা যায় কবরের সংখ্যা দেখেই। আধুনিক উদ্যান-কৃষীদের মধ্যেও যুবকরা মাঝে মাঝে নিজেদের স্ত্রী পুত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়ে, নতুন জায়গায় গিয়ে নতুন গ্রামের পত্তন করে। প্রথমত, সাবেক গ্রামে ঘরের কাছাকাছি আবাদী জমি ফুরিয়ে গিয়ে থাকতে পারে, নতুন ভূমিতে নিজের আঙিনাতেই ফসল ফলানো চলবে। তা ছাড়া, প্রবীণদের কর্তৃত্ব এড়িয়ে চলতে চেয়েছে নবীনরা সব দেশে সব কালে। যাযাবর রাখাল বা শিকারীদের কাছে দূর দেশের গল্প শুনেও হয়তো ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছা করেছে। সম্পূর্ণ স্থায়ী চাষ ব্যবস্থার আগে হয়তো এই রকম কারণে নবপ্রস্তর বসতি কোনও দিন খুব বাড়ে নি। য়োরোপ ও পশ্চিম এশিয়ার গ্রামের আকৃতি সাধারণত আধ থেকে আড়াই হেকটেআর; অন্যত্র ২০-২৫ কি মোটে আট দশটি ঘর পাওয়া গিয়েছে এক একটি বসতিতে। পরে বসতির আকৃতি ক্রমেই বেড়ে চলেছিল;

৫০০০ বিসিতে এক একটি গ্রামে বোধহয় দু শো'র বেশী লোক বাস করত না, পরবর্তী হাজার বছরে লোকসংখ্যা ১০ গুণ বেড়ে গ্রামগুলি প্রায় শহর হয়ে দাঁড়াল। সেই পরিণতির আলোচনা পরে, কিন্তু একটা বিষয় এখানে লক্ষ্য করা চলে—যদিও আজ আমাদের শহরে কোটি লোকের বাস, তবু সমাজের মৌলিক উপাদান এখনও সেই গ্রাম—প্রায় ১০,০০০ বছর আগে যা প্রথম গড়ে উঠেছিল।

আমরা আগে লক্ষ্য করেছি ৬৮০০ বিসির বেইধাতে ছোট ছোট বাড়ির মধ্যে তিনটি প্রশস্ত গৃহ ধনী দরিদ্র শ্রেণী বিভাগের, ব্যক্তিগত সম্পদের নির্দেশ হতে পারে। সম্পত্তি থেকে আসে প্রভাব প্রতিপত্তি, কিন্তু সাধারণ ভাবে নবপ্রস্তর যুগের প্রথম দিকে গ্রামের প্রধান বা সর্দার জাতীয় কোনও ব্যক্তির বাস্তবিক চিহ্ন বিরল, যেমন প্রাসাদোপম গৃহ, বা কবরে অত্যধিক আড়ম্বর আয়োজন চোখে পড়ে না। সম্পত্তি নিয়ে বা অন্য কারণে হয়তো কোথাও কোথাও কলহ ঘটেছে, চাটাল হুয়ুকে অনেক খুলিতে ক্ষত দেখা যায়, কিন্তু এক জেরিকোতে ছাড়া বড় রকম দলীয় সংঘর্ষের স্পষ্ট নজির পাওয়া যায় না। হানাহানির নানা কারণ দেখা দিয়ে থাকতে পারে। আবাদী জমি ফুরিয়ে গেলে বা অনুর্বর হয়ে পড়লে খাদ্য সমস্যা প্রকট হয়ে উঠতে বাধ্য। বন্যা অনাবৃষ্টি ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ফসল ও পশু ধ্বংস হলে সামান্য সঞ্চয় বেশী দিন টিকত না, আক্রমণ ছাড়া তখন প্রায়ই উদর পূর্তির পথ থাকত না, যদিও দুর্ভিক্ষ-পীড়িত শরণাগতদের সঙ্গে অহিংস মিশ্রণও ঘটে থাকতে পারে। কখনও বা শুধু শ্রম লাঘবের তাগিদে লোকে দল বেঁধে অন্যান্য সম্প্রদায়ের উপর হানা দিয়েছে হয়তো, তাদের শস্য পশু কেড়ে নিয়ে খাদ্যোৎপানের কষ্ট বাঁচিয়েছে, কেউ বা তার পর সেখানে জায়গাও দখল করে থেকে গিয়েছে। এর জন্য সে যুগের লোক নীতিকে ধিক্ দেওয়ার কারণ নেই এ যুগে এত নীতি ধর্ম তত্ত্ব কথা শেখার পরেও সুসভ্য জাতিরা পরের সম্পত্তির লোভে বিনা লজ্জায় যুদ্ধ চালিয়ে থাকে।

পক্ষান্তরে চিত্র, অলংকার ও অন্যান্য সৃষ্টিতে মানুষের চিরকালীন শিল্প প্রীতির অনেক সাক্ষ্য আছে। চাটালের কোনও অজ্ঞাত শিল্পী এক দেয়ালের গায়ে লাল রঙে স্থানীয় ঘর বাড়ির প্রকাণ্ড ছবি এঁকে রেখে গিয়েছে, তাতে দেখা যায় লাগালাগি চতুষ্কোণ খোপগুলি আকাশের গায়ে উঠেছে নেমেছে। দূরে এক আগ্নেয়গিরি, তার দুটি চূড়ার থেকে কতগুলি রেখা তোলা হয়েছে উপর দিকে

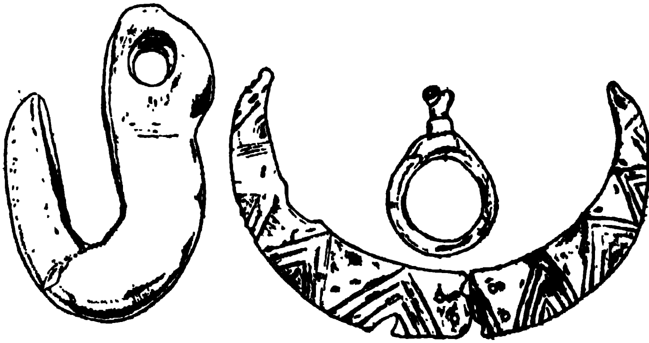
উদ্‌গিরণ বোঝাতে। মধ্য আনাতোলিয়ায় এই গিরির নাম হাসান ডাগ, বিগত ৪০০০ বছর তা ঘুমিয়ে আছে, কিন্তু সে কালে যে খুবই জাগ্রত ছিল তার প্রমাণ ঐ রেখাগুলি। তেজী কারবন মেপে জানা গিয়েছে ছবির তারিখ ৬২০০ বিসি। আরও কয়েক হাজার বছর আগে পুরাপ্রস্তর মানুষের আঁকা দু একটি গুহাচিত্র বাদ দিলে এই বোধহয় প্রাচীনতম দৃশ্যজ্ঞাপক আলেখ্য। ছবিটি প্রায় নকশা বা মানচিত্রের মত, তাতে শিল্প বেশী কিছু নেই। আর একটি দেয়ালে দেখা যায় প্রায় ৮০০০ বছর আগে লাল, ধূসর ও হালকা নীল রঙে অঙ্কিত এক মানুষের মুখ, সম্ভবত কোনও মৃত ব্যক্তির। মুখটি প্রায় গোল, চোখের রেখা দেখে মনে হয় তা বন্ধ।



চিত্র ১১। চাটালের দেয়ালে ৮০০০ বছর আগে অঙ্কিত মুখ।

কিন্তু ছবির তুলনায় চাটালে আরও চমৎকার কারুকাজের নজির আছে বিলাস ও প্রসাধনের উপকরণে। মৃতের সমাধি থেকে উদ্ধার হয়েছে ফাঁপা হাড় কেটে চকচকে পালিশ করা আংটি ; পর পর সাদা ও কালো চুনাপাথরের পুঁতি গেঁথে গলার হার, নিচের দিকে ঝুলন্ত আরও বড় দুটি হরিণের দাঁত বৈচিত্র্য এনেছে তাতে ; শামুকের খোল এমন করে কেটে হাতের বালা তৈরি হয়েছে যাতে ভিতরের পাকানো

চেহারাটা দেখা যায় ; বন্য বরাহের লম্বা দাঁত দুটি দিয়ে কেউ গড়েছিল গলার গহনা, গায়ে খোদাই করা নকশা এবং দুটি ফুটো, তা দিয়ে দাঁত দুটিকে আটকে পুঁতি জোড়া হত। ঝিনুক জাতীয় খোলকে রাখা ছিল চর্বির সঙ্গে লাল গেরিমাটি মিশিয়ে রং, তা দিয়ে মুখে লালিমা এনে তার উপর স্থানে স্থানে নীল বা সবুজ রং চড়াতে ব্যবহার হয়েছে এক দিকে সরু করা হাড়ের কাঠি, পালিশ করা অবসিডিয়ানের গোল আয়নায় প্রসাধন সাধনার ফলাফল লক্ষ্য করেছে কোনও সুন্দরী। পুরুষ কর্মীরা হাড় থেকে বানিয়েছে ছোট খাটো উপকরণ, কারও ভিতরে ফুটো, কারও বা একটি সরু বাহু, সম্ভবত পোশাকে বোতামের কাজ করেছে এরা। তা ছাড়া চমৎকার একটি চকমকির ছোরা উদ্ধার হয়েছে, তার হাতলটি হাড়ের তৈরি এক সাপ, সে পাক খেয়ে দুটি গোল ছিদ্র সৃষ্টি করেছে ; জিনিসটি এত অক্ষয়িত যে হয়তো সযত্নে শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্যবহার হয়েছে। নবপ্রস্তর কালের ভাস্কর্য ও চিত্র কলার পরিচয় আরও পাওয়া যাবে মন্দির শিল্প প্রসঙ্গে।



চিত্র ১২। চাটালে প্রাপ্ত নানা আভরণ। বাঁয়ে পুরুষদের পোশাক আটকাবার উপকরণ (হাড়), ডাইনে গলার অলংকার (বরাহ দন্ত), তার মধ্যে ফাঁপা হাড়ের আংটিতে অস্বাভাবিক বৃদ্ধিকে কাজে লাগানো হয়েছে।

৮। মনের কথা

মন্দির বলতে বোঝায় প্রত্যক্ষ বস্তুময় জগৎটার নেপথ্যে এক ভাবের জগৎ। অবশ্য প্রথমটির প্রয়োজনেই দ্বিতীয়টির উৎপত্তি—এখনও আমরা ঠাকুর দেবতার কাছে মানত করি এটা সেটা পাওয়ার আশায়, যদিও এই অদৃশ্য অগোচর জগতের থেকে আজ সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ভাবনার দর্শনও গড়ে উঠেছে। সে কালের ধ্যান ধারণায় চিন্ময়ের তুলনায় মৃন্ময়ের উপাদান স্বভাবতই বেশী ছিল। মানুষের মনে নানাবিধ সংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস সূচিত হয়েছে কয়েক লক্ষ বছর আগে, তখন থেকে সেগুলি তার দলগত জীবনে ওতপ্রোত রূপে জড়িত। নবপ্রস্তর কালে সমাজের জটিলতা ও আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পুরাপ্রস্তর যুগের এই বৈশিষ্ট্য যে আরও ব্যাপক হয়ে উঠবে—বিশেষ করে চাষ আবাদকে ঘিরে--তাই আমরা অনুমান করি। এই করলে এই হয়, এই বিধি বিধান মেনে চললে অমুক দেবতা তুষ্ট হয়ে বৃষ্টি দেবেন, তাতে ভাল ফসল ফলবে, কিংবা এই কৃত্যের ফলে ভাল বাছুর হবে, গরু বেশী দুধ দেবে, এমনি অনেক সংস্কার নিশ্চয় গড়ে উঠেছিল, তার সঙ্গে অধিষ্ঠাতা অপদেবতার সংখ্যাও। অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টি শিলাবৃষ্টি বন্যা শস্যের রোগ ইত্যাদির পরিণামে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা সদাজাগ্রত ছিল মনে. তাই এ সব বিপদের অন্তরালবর্তী বজ্র বিদ্যুৎ প্রভৃতি শক্তিদেরও তোষণ করা দরকার।

নবপ্রস্তর যুগে এবং পরবর্তী কালেও অনেক দিন পর্যন্ত সব আবিষ্কার মানুষ দেবতার দান বলেই নিয়েছে, তার কিছু ইঙ্গিত আমরা আগে পেয়েছি। নানা দেশের পুরাণেও এই কৃতজ্ঞ স্বীকৃতি দেখা যায়। যেমন মেকসিকো অঞ্চলে মানুষ রূপার নিষ্কাশন বা জহুরীর বিদ্যা শিখেছে দেবশ্রেষ্ঠ কেট্‌জালকোআট্‌লের থেকে। অনতিদূরে পেরু দেশে সূর্যদেবের সন্তানরা তাকে শিখিয়েছে কেমন করে বীজ বুনতে হয়, কেমন করে পথ কেটে পাহাড়ের জল আনতে হয় খেতে বাগানে। সে দেশের প্রধান পালিত পশু লামাকে পোষ মানানো, চরানো, তার থেকে পশম সংগ্রহ, সেই পশম দিয়ে কাপড় তৈরি, কাপড় রং করা এ সবের রহস্য তারাই উদঘাটন করেছে, তেমনি কুমোর সেকরার কাজ থেকে আরম্ভ করে বাড়ি গ্রাম শহর মন্দির সৃষ্টির

বিদ্যাও। এই সব নতুন জ্ঞানের প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ নতুন রূপ নিল, জটিলতা দেখা দিল তার মধ্যে, সেখানেও দেবতার হাত মানুষকে পথ দেখিয়ে নিয়েছে সুশৃঙ্খল সংহত জীবনের দিকে—স্ত্রী পুত্র পরিবার নিয়ে বাস করা, প্রবীণদের নেতাদের মেনে চলা (বিশেষ করে শাসকদের) সে জীবনের ভিত্তি। পারস্যে তেমনি হোশাং দেব শিখিয়েছে ভূমির কর্ষণ, নদী থেকে খাল কেটে তার সেচের ব্যবস্থা, ধাতুর সন্ধান ও ব্যবহার, পশুর পালন ও প্রজন—উপরন্তু ন্যায় বিচার ও আচার। সে দেশের ধর্মরাজ যামশিদ কয়েক শতাব্দী ধরে মানুষকে ভাগ করেছে চার শ্রেণীতে—পুরোহিত, যোদ্ধা (যারা আর্য জাতির শত্রুকে প্রতিরোধ করবে), কৃষক ও কর্মকার ; এই শ্রেণীবিভাগ যদি আমাদের ঈষৎ পরিচিত মনে হয় তো এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে যামশিদের প্রাচীন নাম যিম, বৈদিক দেবতা যম আর সে অভিন্ন। পারসীক পুরাণে আমাদেরই মত সুর অসুর ধর্ম অধর্মের সংগ্রাম দেখা যায়—বস্তুত সে দেশের আর এক রাজা তমুরথ অসুরদের যুদ্ধে হারিয়ে তাদের থেকে আদায় করে নিয়েছিল মানুষের অতি প্রয়োজনীয় লিখন বিদ্যা। চৈনিক পুরাণে মানুষকে এত সব বিদ্যা শিখিয়েছে পর পর তিন সম্রাট, তারাও প্রায় দেবতার অবতার। প্রথমেই সম্রাট ফু-হি সামাজিক জীবনের গোড়া পত্তন করলে, বোঝালে বিবাহের গুরুত্ব। মাছ ধরা, শিকার, পশুপালন, যজ্ঞে হোম, এমন কি বাদ্য যন্ত্র তৈরি পর্যন্ত তার কাছ থেকে শেখা। তার পর এল শুন্, সে কৃষির জনক, সেই সংক্রান্ত নানা যন্ত্র ও পদ্ধতি তার দান, নানা তরু লতার, বিশেষত ভেষজ উদ্ভিদের গুণও সেই শিখিয়ে দিলে। এর পরে যা যা বাকি থাকল পরবর্তী কালে প্রসিদ্ধ যোদ্ধা সম্রাট হুয়াং-টি তার অভাব পূরণ করলে, যেমন চাকার গাড়ি, ঋতু অনুসারে চাষ, ধাতু বিদ্যা, মণি রত্নের ব্যবহার, ইটের বাড়ি, রেশমের চর্চা ও বয়ন, জ্যোতিষ এবং লিখন ; শাসন ব্যবস্থা এবং পয়সার ব্যবহারও এরই দান। এই রাজারা অবশ্য ঐতিহাসিক নয়, প্রাবাদিক, কিন্তু কথা আছে যে সব পুরাণ কাহিনীর নেপথ্যে পাওয়া যাবে অন্তত এক কণা সত্য।

মানব ইতিহাসে দেব দেবীর মূর্তির মধ্যে নিঃসন্দেহে তথাকথিত জননী দেবী বা ভিনাস প্রাচীনতম, আজ থেকে প্রায় ২৫০০০ বছর আগে তার দেখা মেলে। পুরাপ্রস্তর সমাজে গজদন্ত, পাথর ও অন্যান্য বস্তু থেকে দেশে দেশে ঘরে ঘরে নানা আকার আকৃতিতে এই সব প্রতিকৃতি তৈরি হয়েছে। বিগ্রহগুলি প্রায়ই স্থূলাকার

ও নগ্ন, তাদের স্তন নিতম্ব ও উরু অত্যধিক স্ফীত ও প্রকট। এর থেকে সন্দেহ দেখা দিয়েছে যে তারা নারীর উর্বরতার প্রতীক।

প্রাচীন কালের মত নবপ্রস্তর যুগেও সব দেব দেবীর মধ্যে এই সর্বশক্তিমতী আদিমাতারই আধিপত্য। বিভিন্ন অঞ্চলের ঢিবি খুঁড়ে হাজার হাজার জননী দেবী উদ্ধার হয়েছে, তাদের সংখ্যা অন্য কোনও আনুষ্ঠানিক বস্তুর চেয়ে বেশী। কেউ কাঁচা মাটির তৈরি, কেউ বা আকস্মিক আগুনে পুড়ে শক্ত হয়েছে, অন্যরা ঘটি বাটির মতই চুলায় পোড়ানো। সাবেক রীতি অনুসরণ করে সাধারণত এই যুগের সৃষ্টিতেও যৌন বৈশিষ্ট্য বেশী প্রকট, অনেকে গর্ভবতী মনে হয়। কারও কারও বিচারে এদের গড়নে সৌন্দর্য ও চারুশিল্পের আভাস আছে, অন্যদের চোখে তারা কুশ্রী ও উদ্ভট—মাঝে মাঝে নবপ্রস্তর ভাস্করদের কোনও কোনও কাজে যেন আজকের সৌন্দর্য রুচি প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু নির্মাতারা শিল্প সৃষ্টি করতে চায় নি, স্ফীত অঙ্গে অঙ্গে তারা নারীত্ব ও জন্মদাত্রী রূপ ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছে। নব চাষী গ্রামের লোকসংখ্যা ও শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কোনও যাদুকরী প্রথায় দরকার হয়ে থাকতে পারে এই সব ছোট ছোট মূর্তি।

জার্মোয় প্রাপ্ত মৃন্ময় বিগ্রহগুলি কিছু কিছু বাস্তবধর্মী, অনেকের মুখে নাক চোখ ঠোঁট দেখা যায়, তবে কারও কারও আবার সে সব নেই, মাথাটি শুধু এক দলা চ্যাপটা মাটি, আবার কখনও কখনও বদনটি সংক্ষেপে গড়া, তার নিচে হাত পা ধড় কিছু নেই, কেবল একটি মাটির স্তম্ভ ক্রমশ মোটা হয়ে নেমেছে। তুরস্কে প্রায় সমসাময়িক হাসিলার গ্রামে কখনও দেখা যায় হস্তপদমস্তকবিহীন বিকৃত পাকানো ধড় শুধু, কেউ কেউ প্রসবের ভঙ্গিতে গঠিত। কিন্তু এই ঘাঁটির আর কতগুলি মূর্তি স্থূলা বা গর্ভবতী নয়, সুগঠিতা তরুণী সস্নেহে নিজের শিশুকে কোলে ধরে আছে। চাটালেও এই শ্রেণীর কৃশাঙ্গী বিগ্রহ দেখা যায়। এই সব প্রতিকৃতিতে সৌন্দর্য বা শিল্প কৌশল প্রকাশিত না হলেও তারা অমার্জিত নয়, তা ছাড়া তাদের সংকেত যৌন মিলন বা প্রজনন নয়, তাদের মধ্যে রূপায়িত মাতৃত্ব। কোন দূর অস্পষ্ট অতীতে সূচিত হয়ে মাতৃত্বের স্তুতি ও উপাসনা পরে দেশে দেশে বিভিন্ন সমাজে শিল্পীদের প্রণোদিত করেছে, আজও করছে। আবার নারী রূপকে উপলক্ষ করে উর্বরতার সাধনা ও সন্তান প্রার্থনা পুরাপ্রস্তর যুগে প্রথম খাঁটি মানুষের সমাজে আরম্ভ হয়ে সব আদি ঐতিহাসিক সভ্যতাগুলির মন্দিরে মন্দিরে স্থান পেয়েছে, এই



চিত্র ১৩। আনাতোলিয়ায় প্রাপ্ত জননী দেবীর মৃন্ময় মূর্তি, তারিখ প্রায় ৫৪০০ বিসি (বাঁয়ে) ও ৫৬০০ বিসি।

মহামাতাকে মূর্তি দিয়েছে মেসোপটেমিয়ায় ইশটার, কানানে আশটোরথ, গ্রীসে অ্যাফ্রোডাইটি, রোমে ভিনাস। কোথাও কোথাও সে উর্বরতার প্রতীক না হয়ে বরং প্রেম প্রতিমা। আদি সভ্য জগতের সৃষ্টিতে প্রায়ই কৃশাঙ্গী তন্বী রূপ দেখা যায়, যেমন ফিনিশিয়ায় গজদন্ত ও কাঁসার তৈরি বিগ্রহে, মহেনজোদারো ও হরপ্পার মৃৎমূর্তিতে৭

নবপ্রস্তর সমাজে হয়তো বিশ্বাস ছিল জননী দেবীর দাক্ষিণ্যে ঘরে ঘরে শিশু জন্ম নেবে, তাদের গর্ভধারিণীরা যেমন চরিতার্থ হবে তেমন সম্প্রদায়ের লোক বেড়ে

তার শক্তি সমৃদ্ধি বাড়াবে। সন্তানকামিনীরা হয়তো পুরোহিতদের থেকে প্রথানুসারে গ্রহণ করেছে এই সব ক্ষুদ্র দেবী প্রতিমা কোনও মাঙ্গলিক ব্রত পালন করতে অথবা বাস্তুদেবীকে সযত্নে সসম্ভ্রমে ঘরের নির্বাচিত পবিত্র স্থানটিতে রেখে প্রত্যহ প্রার্থনা জানিয়েছে। নব কৃষী সমাজে এই রকম ঐশ্বরিক শক্তির উপাসনা নিশ্চিত বলে অনুমান করা যায়। বস্তুত এখনও বীজ বোনা, বৃষ্টি কামনা, ফসল সংগ্রহ ইত্যাদি নিয়ে নানা দেশে গ্রামাঞ্চলে কত পূজা পার্বণ।

পুরা কালে ভূমির উর্বরতা ও ফলন আশ্রয় করে স্থানে স্থানে একাধিক দেব দেবীও দেখা যায়, তা ছাড়া এই সব ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে ধর্মের নামে অমানুষিক নৃশংসতা। মেকসিকোর অ্যাজটেক সমাজে মকাই দেবীকে তুষ্ট করতে এক তরুণীকে তার মত সাজিয়ে বলি দেওয়া হত, তার পর তার চর্ম দেহে ধারণ করে এক পুরোহিত সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠান চালাত। বীজ বপনের পর বৃষ্টি দেবীর দাক্ষিণ্য প্রয়োজন, সমাজের অনুশাসনে তার জন্য চাই শিশু বলি, মায়েরাই তাদের বয়ে নিয়ে যেত যথাস্থানে, ক্রন্দনরত বাচ্চাদের চোখের জল বৃষ্টির চিহ্ন বলে গণ্য ছিল। অবশ্য অনুষ্ঠাতারা এই ধরনের হত্যাকে তুচ্ছ জ্ঞান করেছে বৃহত্তর মহত্তর পরমার্থ লাভের আশায় --ভারতে গুরুর প্ররোচনায় বাপ মা আপন সন্তানকে বিসর্জন দিল এমন খবর এখনও পড়া যায়।

ভূমির উর্বরতা ও শস্য উৎপাদনের সঙ্গে নারীর উর্বরতা ও যৌন মিলনও মিশে গিয়েছে নানা দেশে নানা কালে। পশ্চিম এশিয়া ও ভূমধ্য সাগর এলাকার প্রাচীন জাতিদের পুরাণ কাহিনী, বিশ্বাস ও লোকাচার থেকে অনুমান করা হয়েছে যে প্রথম দিকে এক জোড়া বিশেষ মেয়ে পুরুষের মধ্যে সাংকেতিক বিবাহ অনুষ্ঠিত হত; পুরুষটি শস্যের বা সাধারণ ভাবে উদ্ভিদের প্রতীক বলে তাকে বলা হয়েছে শস্যরাজ। শস্য বা বীজকে আবার মাটির নিচে ফিরে গিয়ে নতুন করে জন্ম নিতে হয়—অর্থাৎ শস্যরাজের হত্যা ও তার জায়গায় তরুণ ও বলিষ্ঠ আর এক উত্তরাধিকারীর অধিষ্ঠান। হয়তো এই রকম কোনও ধারণার থেকেই বীজ বপনের সঙ্গে রক্ত দান বা মানুষ বলির সম্পর্ক নবপ্রস্তর মানুষের মনে প্রথম দেখা দিয়েছে, এর ক্ষীণ চিহ্ন আজও অনেক জায়গায় লক্ষ্য করা যায়। শিশু বা বৃদ্ধের নিস্তেজ রক্তে যে উর্বরতার প্রার্থনা সফল হত না, প্রাণ দিতে হত কোনও যুবকের—কখনও বা যুবতীর—তা অবশ্য স্বাভাবিক। কিন্তু তাদের প্রতি হিংসা তো দূরের কথা বরং প্রগাঢ়

ভক্তি ও শ্রদ্ধাই ছিল সকলের মনে, তারা রাজা ও দেবতার যুগ্ম প্রতিভূ অনেকটা। নিষ্ঠার সঙ্গে, প্রবীণদের বিধান অনুসারে, প্রতি বছর নানা রকম আচার অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে দেশে দেশে দশের কল্যাণে তাদের উৎসর্গ করা হত দেবতার তুষ্টিতে।

কালে কালে এই অনুষ্ঠান আরও সাংকেতিক হয়ে উঠে থাকতে পারে। স্বর্গের লোভেও সহজে কেউ মর্ত লোক ত্যাগ করতে চায় না, এমন হতে পারে যে নিজের প্রাণ বিসর্জনের পরিবর্তে কোনও বন্দীর হত্যা বা হয়তো শুধু মন্ত্র পাঠ দিয়ে সমাজকে তুষ্ট করে শস্যরাজ ক্রমে সর্বশক্তিমান ঐহিক রাজা হয়ে উঠেছে, ঐতিহাসিক কালের শুরুতে যাদের দেখতে পাই আমরা। এ সম্বন্ধে জোর করে কিছু বলা যায় না, কিন্তু মিশর, ইরাক ও গ্রীসে ঐতিহাসিক রাজারাই উর্বরতা অনুষ্ঠানের অনেক অংশ সম্পন্ন করেছে। আজকের অনেক প্রাচীন সমাজেও এমন এক জন সর্দার দেখা যায় যে বংশ পরম্পরায় সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী, কি যাদু বিদ্যায় কি যুদ্ধে।

উর্বরতা বা ফলন সম্পর্কিত অনুষ্ঠানে যে সব বিশ্রুতি আজ পুরাণ কাহিনীতে পাওয়া যায় তার সঙ্গে নাচ গান প্রায়ই অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। রক্তপাত বা বলির চিহ্ন বেশী না থাকলেও যুবক বা যুবতীর (বিশেষত কুমারী কন্যার) প্রধান অংশ, এবং তাদের মধ্যে যৌন আকর্ষণের ইঙ্গিত অনেক ক্ষেত্রে লক্ষিত হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিমে পুএব্‌লো ইনডিয়ানদের বাস, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার প্রসিদ্ধ প্রাচীন সভ্যতাগুলির (অ্যাজ্‌টেক, টল্‌টেক, মায়া) সঙ্গে এদের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। এই আদিবাসীদের এক শাখা জুনি নামে পরিচিত, তাদের কৃষ্টি বহু পুরা কাল থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় অপরিবর্তিত। জুনিদের সনাতন জীবনধারা ও ধর্মের কেন্দ্র স্থলে যে শস্যটি তা হল মকাই, এই আবশ্যিক উপজীব্যটিকে ঘিরে গড়ে উঠেছে অনেক সুন্দর প্রাচীন উপাখ্যান, উদাহরণ স্বরূপ তার একটি সংক্ষেপে বর্ণনা করা যেতে পারে এখানে। বহু পুরা কালে এদের পিতৃপুরুষদের কাছে দেখা দিয়েছিল শিশির ও ভোরের দেবতা পেইয়াতুমা, তার হাতে বাঁশী, তার সঙ্গী কুয়াশা, সঙ্গে এনেছিল সাতটি শ্বেতবসনা পালিতা কন্যা, আকাশের তারার চেয়েও তারা মনোমুগ্ধকর, হাতে তাদের যাদু-কাঠি। মানুষের হাতে তাদের দান করে সেই সঙ্গে সাতটি মকাই গাছও রেখে গেল দেবতা।

তার পর প্রতি বছর শস্য ঋতুতে সে দিনের পিতৃপুরুষরা তাদের জন্য বানিয়ে

দিত কুঞ্জ, রাত্রে আগুন জ্বালত তাদের সামনে। শুরু হত ঢাক ও ঝুমঝুমির বাদ্য, প্রবীণরা ধরত গান। সংগীতের তালে তালে এগিয়ে পিছিয়ে সাত কন্যা সাত শস্যতরুকে ঘিরে নাচত তরঙ্গায়িত নাচ, বার বার যাদু-কাঠি উপরে তুলে বাড়তে ইশারা করত তাদের। শেষে একে একে আলিঙ্গন করত গাছগুলিকে, সেই সেই মুহূর্তে জ্বলে উঠত আগুনের বিভিন্ন রং বা মূর্তি, সপ্তম কন্যার আলিঙ্গনে বহুবর্ণ শিখা জ্বলন্ত থাকত। তার পর ভোরের কুয়াশা যখন নেমে আসছে তখন কুঞ্জে গিয়ে যাদু-কাঠি, রঙিন পালক আর মনোরম কোমল পোশাক পরিহার করে তারা গ্রামবাসীদের মধ্যে ফিরে আসত।

একদা কোনও কোনও যুবকের কানে ভেসে এল আরও মনোহর কিসের এক সুর, অনেক দূরে বজ্র-পর্বতের ও পার থেকে, এই সংগীতের সঙ্গে চলে যে নৃত্য তাও নিশ্চয় তাদের নাচের চেয়ে সুন্দর। সেই ধ্বনির অনুসরণ করতে করতে গ্রামবাসীদের দুই দূত এসে উপস্থিত হল পেইয়াতুমার নিজেরই ঘরে, রামধনু-গহ্বরে। তারা দেখলে সুর আসছে বাঁশীর থেকে, আর তার তালে নাচছে আর সাতটি অপরূপ কন্যা, তাদের দেখলে মনে হয় যেন আগের সেই সাত কুমারীর ছায়া পড়েছে জলে। দূতদের ইচ্ছা বুঝতে পেরে তাদের হাতে বাঁশীবাদকদের দান করলে পেইয়াতুমা, তারা ফিরে এল গ্রামে, এ বার শ্বেতবসনা শস্যকন্যারা নাচল বাঁশীর সুরে। বাজাতে বাজাতে আগন্তুক সুরকারদের চোখ কামাতুর হয়ে উঠল, তা দেখে কন্যারা চোখ নামাল। কিন্তু বাঁশীবাদকদের লক্ষ্য করে গ্রামের তরুণদেরও হৃদয় চঞ্চল হল, নর্তকীরা ঘুরে ঘুরে কাছে এলে তারা তাদের কাপড় ধরে আকর্ষণ করতে লাগল। অবশেষে তারা এবং বাদকরা লাফিয়ে উঠে চিৎকার করে নর্তকীদের অনুসরণ করলে, শ্বেত-বসনাদের গায়ে লাগল তাদের হাতের কলুষ স্পর্শ। তবু তারা শেষ করলে নাচ, আলিঙ্গন করলে সাত তরু—কিন্তু ভোরের সঙ্গে সঙ্গে বসন ভূষণ ত্যাগ করে কুয়াশার আড়ালে কোথায় উধাও হয়ে গেল। কুয়াশার পর্দা ভেদ করে দেখা দিল পেইয়া-তুমা, বাঁশীবাদকদের নিয়ে চলে গেল সে।

কন্যাদের অন্তর্ধানে সকলে বিহ্বল ও মুহ্যমান হয়ে পড়ল। ঢাক বাজল ঝুমঝুমি বাজল, তবু কেউ ফিরে এল না, কুঞ্জে ঢুকে দেখা গেল পড়ে আছে শুধু যাদু-কাঠি, পালক ও বস্ত্র। কন্যারা ছাড়া শস্যতরু বাড়বে না, ফসল না ফললে মানুষের দেহে মাংস শুকিয়ে যাবে। সকলের অনুরোধে একে একে ঈগল, বাজপাখি

ও দাঁড়কাক আকাশে উঠল, কিন্তু অনেক খুঁজেও শস্যকুমারীদের দেখা পেল না। অবশেষে আবার পেইয়াতুমাই ত্রাণ করলে, কিন্তু তার আগে দরকার হল গ্রামবাসী-দের পাপ মোচন। তার পর নতুন অভিযানে পেইয়াতুমার সঙ্গী হল এমন চারটি যুবক যাদের দেহ কখনও কলুষিত হয় নি। সাত কন্যার দেখা পেল তারা গ্রীষ্ম দেশে এসে, প্রজাপতি আর পাখির রাজ্য সে দেশ। কন্যারা ফিরে এল, আবার নাচল সারা রাত ধরে গান ও বাজনার তালে তালে, নিজের নিজের শস্যতরুকে ঘিরে দু হাত তুলে আকাশের দিকে বৃদ্ধির বাণী জানালে, তার পর আলিঙ্গনের মধ্য দিয়ে কি এক রহস্য-পথে, নিজের দেহ-বস্তু সঞ্চারিত করলে, সেই সঙ্গে আগুন তার সাত মূর্তি দেখাল একে একে। অবশেষে গভীর রাতের অন্ধকারে চির কালের মত মিলিয়ে গেল মেয়েরা। ভোরের আলোর দেখা গেল শুধু পেইয়াতুমাকে, সে জানালে শস্যকুমারীরা যা দান করে গিয়েছে তারই ফলে ফসল বাড়বে প্রতি বছর, কিন্তু এর পরে শস্য ঋতুতে গ্রামকুমারীদের থেকে সাত জনকে বেছে নিতে হবে, তারাই নাচবে বাঁশী আর ঢাকের তালে তালে। সপ্ত কন্যা বিদায় নিল, কারণ মানুষের মধ্যে থাকলে মানুষের ভালবাসা, মানুষ শিশুর আকাঙ্ক্ষার মধ্যে তারা হারিয়ে ফেলত বীজ বৃদ্ধির মহত্তর আকাঙ্ক্ষা। মানুষ চাইত তাদের পার্থিব ক্ষেত্রে নামাতে, মরে যেত প্রাণদায়ক দৈব শক্তি।

সেই থেকে মকাইর বীজ অতি পুণ্য বস্তু। কত চাঁদ আসে যায়, এই বীজ রক্ষা করা হয় সযত্নে। অবশেষে একদা তাকে মাটিতে নিমজ্জিত করা হয় শ্রদ্ধা সহকারে, যেমন প্রিয় জনকে সমাধিস্থ করে সমাজের লোকে। বীজের অন্তরে সাড়া দেয় সেই আদিমাতাদের প্রাণ-বস্তু। শিশির ও ভোরের দেবতা অঙ্কুরকে উজ্জীবিত করে তার নিঃশ্বাসে, কাল ও ঋতুর দেবতা সম্পূর্ণ করে বৃদ্ধি, শেষে তাপ-দেবতা দেয় পরিপক্ব পূর্ণ যৌবন। আর সাত কন্যা নাচে তাদের পাশে পাশে, দু হাত তুলে তুলে আকাশের দিকে ইশারা করে।

চাষ আবাদ ও প্রয়োজনীয় উদ্ভিদ সম্পর্কিত বিবিধ আরাধ্য দেব দেবীর দেখা পাওয়া যায় দেশে দেশে। বস্তুত এমন বিশ্বাসও আছে যে নবপ্রস্তর যুগের প্রথম দিকে দেব দেবীরা ছিল ভূমি বা পৃথিবীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, আকাশ দেবতারা এসেছে পরে কাংস্য যুগে। জুনিদের যেমন পেইয়াতুমা, তেমনি মধ্য আমেরিকাতেই অ্যাজটেক সভ্যতার দেব শ্রেষ্ঠ কেট্‌জালকোআট্‌ল মানুষকে প্রথম ফসল মকাই দান করেছিল

বলে কথিত আছে, তার আগে তাদের একমাত্র নিরামিষ খাদ্য ছিল মূল। উদ্ভিদ জগতে মৃত্যু ও পুনরুজ্জীবনের প্রতীক মিশরের ওসাইরিস, ব্যাবিলনের তামুজ, গ্রীসের এডোনিস। আয়ার্ল্যানডে প্রাচীন সেল্‌টীয় ধর্মের প্রধান আরাধ্য ছিল প্রাণ ও বৃদ্ধির যত শক্তি, তাই তাদের প্রাচীন কিংবদন্তীর কেন্দ্র স্থলে কৃষি ও ফলনের স্থান। সেলটীয়ের সঙ্গে গ্রীসীয় ও বৈদিক পুরাণের ঘনিষ্ঠ যোগ, কারণ সবগুলিই একই ইনদো-য়োরোপীয় কাণ্ডের শাখা। আবাদ ও ফলনের শক্তি যে কত রকম হতে পারে তার একটি দৃষ্টান্ত রোমীয় পুরাণের পরী পোমোনা. সে শুধু ফলতরুর ধাত্রী; শস্য, ফুল এমন কি বন্য গাছের সঙ্গে পর্যন্ত তার কোনও সম্পর্ক নেই—বস্তুত গ্রীসীয় ও রোমীয় উপাখ্যানের প্রকৃতি-কন্যাদের মধ্যে একমাত্র সেই বোধহয় বনের প্রতি বিরূপ। তার ভাল লাগে ফল গাছের নানা রকম যত্ন ও শুশ্রূষা—তাদের ছাঁটা, কলম তৈরি করা, শিকড়ের কাছে মাটি আলগা করে দেওয়া, জলের ব্যবস্থা করা পোকার নাশ করা ইত্যাদি। পলিনেশীয়রা দুটি বিভিন্ন দেবতার সৃষ্টি করেছে আবাদী ও অনাবাদী খাদ্যতরুর জন্য। পুরা কালের কবিদের কল্পনায় যে দেব দেবীরা কত সহজে মূর্তি পেত তার একটি সুন্দর উদাহরণ মেলে অ্যাজটেক উপাখ্যানে; প্রথমে ছিল আকাশ পিতা ও পৃথিবী মাতা, সে প্রসব করল এক চকমকির ছুরি. শূন্যে নিক্ষিপ্ত সেই ছুরি নিমেষে পরিণত হল ১৬০০ পার্থিব দেবতায় (এদের দাসত্ব করতেই পারে মানুষের সৃষ্টি)। এই হারে দেব দেবীর সৃষ্টি করে চললে সংখ্যাটা যে দেখতে ৩৩ কোটি ছাড়িয়ে যাবে তা আর আশ্চর্য কি।

পোমোনার তুলনায় মিশরের সূর্যদেব রা অবশ্য অনেক বড়, তার উপাসনা মন্ত্রে দেখা যায়—"তুমিই মানুষকে দিয়েছ ফলতরু আর গরুকে দিয়েছ ঘাস" (কথাটি বৈজ্ঞানিক অর্থে নির্ঘাত সত্য, কারণ উদ্ভিদ কুলের প্রাণ সূর্যালোক)। মানুষ যখন ফলের আবাদ করতে আরম্ভ করলে তখন ক্রমশ এই সব কাহিনী কল্পনা অঙ্কুরিত হয়ে উঠল তার সরল মনের উর্বর জমিতে।

বিভিন্ন জাতির দেব দেবীর মধ্যে সাদৃশ্য আমরা আগে লক্ষ্য করেছি, এই প্রসঙ্গে আর একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ আমাদের ইন্দ্র ও জাপানী পুরাণের সুসা-নো-য়ো। পৃথিবীর মাটিতে যা কিছু ফলে তা জাপানী সূর্যদেবীর যত্নে, ফসল উৎসবের জন্য মানুষ যে সব মন্দির গড়ে তার প্রতি তার বিশেষ মমতা, কিন্তু তার দুরন্ত দুর্মতি ভাই সুসা-নো-য়ো সব কিছু ভণ্ডুল করে দেয়। এ দিকে ইন্দ্রের

ক্ষমতাও অনেকটা অনুরূপ। বৈদিক দেবতাদের মধ্যে তার প্রধান স্থান, ঋগ্‌বেদে তার বিস্তৃত বর্ণনা আছে। বজ্র বিদ্যুৎ তার প্রহরণ, তা দিয়ে সে অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টির অনাসৃষ্টি সৃষ্টি করে, জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ করে; নিজের খুশিতে সে মানুষের খাদ্য নাশ করে দিতে পারে, তাকে চটালে প্লাবন বয়ে যায়, আবার খুশী করলে মেঘ দীর্ণ করে সে যথা পরিমাণ জল মুক্ত করে। সুসা-নো-য়ো আর ইন্দ্র দুয়েরই বিশেষত্ব উড়ন্ত লম্বা দাড়ি—বস্তুত এই দাড়ি কেটেই শেষ পর্যন্ত ঐ জাপানী দেবতার ক্ষমতা খর্ব করা হয়েছিল। আর ইন্দ্রকে ঠাণ্ডা করত কৃষ্ণ; ব্রজবাসীরা উপাসনা ত্যাগ করায় ইন্দ্র রেগে প্লাবন আনলে কৃষ্ণ তাদের রক্ষা করে। গোকুলে নন্দ প্রমুখ প্রবীণরা ইন্দ্র পূজার আয়োজন করছে, কারণ জল না হলে কৃষি হয় না, কৃষি বিনা দুর্ভিক্ষ। কৃষ্ণ বললে এই সব বৈদিক দেবতার পূজায় কিছু হয় না, প্রকৃতির স্বভাবেই মেঘ হয়, তার থেকেই বারিপাত ও সাফল্য, ইন্দ্রের কি ক্ষমতা?

রজসা চোদিতা মেঘা বর্ষত্যম্বূনি সর্বতঃ।
প্রজাস্তৈরেব সিধ্যন্তি মহেন্দ্রঃ কিং করিষ্যতি॥

(ভাগবত পুরাণ, ১০, ২৪, ২৩)

পণ্ডিতরা বলেন ভাগবত পুরাণের রচনা কাল হয়তো যিশুর আগে—খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের পরে কখনও নয়। এমন কথা এ যুগের বিজ্ঞানীর মুখে আশা করা যায়, অথচ তা স্থান পেয়েছে এই দেশের ভক্তিপ্রধান গ্রন্থে. সেই কারণে কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক হলেও বিষয়টির উল্লেখ করা গেল এখানে।

মৃতের সংকার পদ্ধতি থেকে মৃত্যু ও পরলোক সম্বন্ধে সমাজের কল্পনা ও বিশ্বাসের ইঙ্গিত মেলে। কবর প্রথার সূচনা দেখা যায় অন্তত ৬০,০০০ বছর আগে নেআনডার্টাল মানবের কালে, তারা গুহার মাটি খুঁড়ে সযত্নে শব রক্ষা করেছে, কোথাও পুব পশ্চিম বরাবর, কখনও হাঁটু মুড়ে, সঙ্গে দিয়েছে পশুর হাড়, চকমকির ফলক, এক জায়গায় বুনো ফুল তুলে এনে রেখেছে কাছে। নবপ্রস্তর সম্প্রদায়েও সাধারণ ভাবে কবর প্রথা প্রচলিত ছিল, অনেক জায়গায় বিগত যুগের মতই দেহটি হাঁটু ভাঁজ করে শায়িত। খাদ্য পানীয় ও বিবিধ সাজ সরঞ্জাম সঙ্গে দেওয়ার রীতি ক্রমশ বেড়েছে। মিশরে মৃতের সঙ্গে ব্যবহারের উপকরণ, অস্ত্র, খাদ্য, পানীয়, প্রসাধন সামগ্রী ইত্যাদির সঙ্গে বিবিধ পশু ও বস্তুর ছবি আঁকা ঘট ঘটিও রাখা হত। পরবর্তী ঐতিহাসিক কালে এ সব চিত্র সমাধি গৃহের দেয়ালে আঁকা হয়েছে এবং

সঙ্গের লিখিত পাঠ থেকে উদ্দেশ্যটি জানা যায়—ঐ সব চিত্রিত সামগ্রী যাতে পর-জীবনে মৃতের সেবায় লাগে তার ব্যবস্থা করা। প্রিয় জন ও পিতৃপুরুষের সুখ সুবিধা ও তুষ্টির এই সযত্ন চেষ্টা পুরাতনী ধারাই বজায় রেখেছিল। নানা দেশে নবপ্রস্তর ঘাটির সমাধিতে রক্ষিত বস্তুর মধ্যে যে অস্ত্র পাওয়া যায় তা পরলোকে শিকার বা যুদ্ধের উদ্দেশ্যে হতে পারে, যদিও সমাজে যুদ্ধ বিগ্রহের তেমন সাক্ষ্য নেই।

বর্তমান ইরাকের টেল্ এস্-সওআন ঘাঁটিতে ৮০০০ বছর প্রাচীন গোটা চব্বিশ ছোট ছোট স্ত্রী মূর্তি আবিষ্কার হয়েছে, অধিকাংশই শিশুদের সমাধিতে, তার থেকে মনে হয় যেন তারা প্রকৃত জননীদের প্রতিনিধি রূপে স্থাপিত, অজানা দেশের যাত্রা পথে দুর্বল অসহায় যাত্রীদের শক্তি ও সান্ত্বনা যোগাবে বলে। অ্যালাব্যাসটার পাথরের তৈরি এই মূর্তিগুলির গড়নও কৌতূহলের বিষয়, বিস্ফারিত চোখ জোড়া তৈরি হয়েছে ঝিনুক জাতীয় খোলক দিয়ে, চোখের মণি ও ভ্রূ রঙ দিয়ে আঁকা—তিন হাজার বছর পরবর্তী ঐ অঞ্চলের সুমের রাজ্যে বিভিন্ন শহরে প্রাপ্ত পাষাণ প্রতিকৃতির সঙ্গে এই চেহারার ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য ইঙ্গিত করে যে প্রাচীন ধারার প্রভাব পড়েছিল পরবর্তী ভাস্করদের উপর। টেল এস-সওআনের কল্পিত জননীরা অনেকেই মোটাসোটা এবং সাধারণত যেন বিবসনা, যদিও কারও কারও গলায় মালা, কারও বা মাথায় চূড়ো করে তোলা কেশ বিন্যাস। আদি কৃষিবাসী সমাজে একাধারে চারুশিল্প ও ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে জল্পনার উদ্রেক করেছে এই ক্ষুদ্র মূর্তিগুলি।

জেরিকোতে কারও কারও খুলি ও অস্থি বাড়ির আশেপাশে অথবা ভিতরে মেঝের নিচে সমাধিস্থ হয়েছে। রহস্য সৃষ্টি করেছে প্রায় ৮০০০ বছর প্রাচীন কতগুলি খুলি, তাদের উপর পলস্তারার প্রলেপ লাগানো। ১৯৫৩ সালে ক্যাথলিন কেনিয়নের দল কাজ করতে করতে হঠাৎ দেখতে পায় এক খনিত খাতের গা থেকে সাদা চকচকে একটি খুলি উঁকি দিচ্ছে, বার করে দেখা গেল হাড়ের উপর সযত্নে মাটির পলস্তারা লাগিয়ে মুখ গড়ে তোলা হয়েছে, চোখের গহ্বরে কড়ি—প্রত্নতত্ত্বে এমন আবিষ্কারের নজির আর নেই। অনুসন্ধানে খুলিটির পিছনে মিলল আরও এক জোড়া, তার পিছনে আবার তিনটি, সব শেষে একটি—সব নিয়ে সাতটি। প্রতিটির ভিতরে মাটি ভরা, একটিতে যেন পলস্তারার উপর রং দিয়ে গোঁফের রেখাও টানা হয়েছে, কয়েকটির মাথার উপরে রঙের মোটা মোটা আঁচড়। পুন-

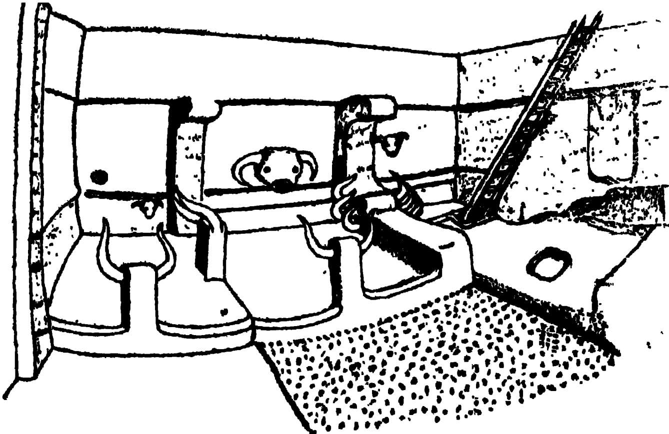


চিত্র ১৪। জেরিকোতে প্রাপ্ত এই খুলির উপর পলস্তারা দিয়ে মুখ পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল।

গঠিত মুখগুলি দেখতে অনুরূপ নয়, সুতরাং হয়তো মৃত লোকটির চেহারা ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা হয়েছে। আমরা যেমন দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তির বা পরিবারের কারও ছবি, আলোকচিত্র বা মর্মর মূর্তি রাখি তেমনি হয়তো এই প্রথারও উদ্দেশ্য ছিল স্মৃতি রক্ষা করা, অথবা পুনরুদ্ধৃত খুলিগুলি ব্যবহার হয়ে থাকতে পারে পিতৃপুরুষের তর্পণে—মুখাবয়ব অক্ষুণ্ণ থাকলে মৃতরা অমরত্ব পাবে হয়তো এমন বিশ্বাস থেকে। যাই হক, ব্যক্তি বিশেষের প্রতিকৃতি হলে এগুলি তার আদিতম

নিদর্শন। য়োরোপের কোথাও কোথাও আজকের মত গোরস্থান দেখা যায়, তবে মধ্যপ্রাচ্যে সাধারণত বারোয়ারি কবরখানা ছিল না, যার যার বাড়ির নিচে বা পাশে গোর দিত।

আদি কাল থেকে ধর্মবিশ্বাস ও ললিত কলার ঘনিষ্ঠ যোগ, প্রায়ই প্রথমটিকে আশ্রয় করে দ্বিতীয়টির সূচনা ও প্রসার, আজও বিখ্যাত চিত্র, ভাস্কর্য ও সংগীতের উদ্দীপনা আসে ধর্মীয় বিষয় থেকে। চাটাল হুয়ুকের মন্দিরে মন্দিরে আমরা একাধারে পরিচয় পাই শিল্প, অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া ও দেব দেবীর। মেলার্টের মতে তাঁর পরীক্ষিত গৃহের মধ্যে চল্লিশটি হল সমাধি মন্দির। অধিকাংশই সাধারণ বাসগৃহের চেয়ে বড় হলেও গঠনে অনুরূপ—শয্যার বেদী, উনন, ছাতের সঙ্গে মই বর্তমান। কিন্তু মস্ত পার্থক্য হল চিত্রে ও ভাস্কর্যে প্রাচীরের সাজ সজ্জায়। আশ্চর্য এই যে মৃত্যুর রূপক অধিকাংশ ছবি আঁকা হয়েছে পুব দিকের দেয়ালে, ঠিক সমাধি বেদীগুলির উপরে, আর প্রাণের প্রতীক চিত্র স্থান পেয়েছে পশ্চিম প্রাচীরে। ছবির মাঝে মাঝে স্থাপিত হয়েছে মূর্তি, যেমন ষাঁড়ের মুণ্ডাস্থির উপর মাটি মাখিয়ে তার সঙ্গে প্রকৃত শিং জুড়ে, কখনও বা দেয়াল থেকে বেনূচির মত বেদী বেরিয়ে এসেছে, তার পাশে পাশে শিং লাগানো। এই রিলিফ মূর্তি ও বেদীর প্রায় সবই চিত্রিত।



চিত্র ১৫। চাটালের তথাকথিত বৃষ দেব মন্দির, ষণ্ড মুণ্ডের দু পাশে ক্ষুদ্রতর মেষ মুণ্ড।

নানা রঙে বহু যত্নে সজ্জিত এই সব ঘরে কি ধরনের ক্রিয়া কলাপ অনুষ্ঠিত হয়েছে তা জীর্ণ ছবি ও মূর্তিগুলির বিষয় ও কাছাকাছি প্রাপ্ত বস্তুর থেকে কখনও শুধু অনুমান করা চলে, কখনও তাও না। শিল্পীরা সরু বুরুশ দিয়ে উজ্জ্বল তাজা রং লাগিয়ে এই সব প্রাচীর চিত্র এঁকেছে, আগে কোনও বহির্‌রেখা টেনে নেওয়ার দরকার হয় নি। রং বানিয়েছে নানা গেরিমাটির থেকে, তাদের উপাদান বিভিন্ন ধাতুর যৌগিক পদার্থ দিয়েছে বর্ণ বৈচিত্র্য; লোহার অকসাইড বা ওকার থেকে লাল বাদামী ও হলদে, তামাযুক্ত পদার্থ থেকে নীল ও সবুজ, ম্যাংগানিজ্‌ থেকে ফিকে লাল বা বেগনি, সীসা থেকে ধূসর, তা ছাড়া ঘরোয়া আগুনের কালি দিয়েছে কালো। শিল্পী সম্ভবত চর্বির সঙ্গে মিশিয়ে নিয়েছে রং।

একটি দেয়ালে পাশাপাশি তিনটি ষণ্ড মুণ্ডের গায়ে লাল রঙের নকশা আঁকা, তার নিচে লম্বা করে জালি-কাটা নকশা, তারও নিচে দেয়ালে হাত চেপে বাকি অংশে তুলি বুলিয়ে ছাপ রাখা হয়েছে। অনুরূপ ছাপ কয়েক হাজার বছর আগেও পুরাপ্রস্তর মানুষের গুহাচিত্রের আশেপাশে দেখা যায়, তাদের সাংকেতিক তাৎপর্য কিছু থাকলে তা রহস্যময়। আরও এক ঘরে দেয়াল জুড়ে শিকারের দৃশ্য, কোমরে চিতা-বাঘের চামড়া জড়ানো শিকারীর দল ধনুক হাতে ছুটোছুটি করছে, মাঝে মাঝে কয়েকটি হরিণ ও অতি প্রকাণ্ড এক ষাঁড়, মানুষ এবং জন্তুর রং লাল; তবে এক শিকারীর শুধু বাঁ হাত পা ও বাঁ দিকের দেহাংশ সঙের মত রঞ্জিত, আর এক জনের তাও না। ছবির নিচে মাদুর-ঢাকা বেদী, পাশের দেয়াল ঘেঁষে রান্নার জায়গা। হয়তো শিকারীরা পশু পাখি মেরে বিধি অনুসারে এইখানে এনেছে, মেয়েরা রান্না করেছে, রুটি ফল মদ্যের সঙ্গে মাংস ভোজন হয়েছে।

কোথাও কোথাও পলস্তারার গায়ে উৎকীর্ণ অথবা কিছুটা উঁচু করে তোলা চিতাবাঘের সাংকেতিক মূর্তি অথবা চিতাবাঘের স্তন যার থেকে পশুর মস্ত দাঁত বা চোয়াল প্রসারিত। এক ঘরে দেয়ালের গায়ে বেশ বড় দুটি চিতাবাঘের রিলিফ মূর্তি, তাদের চেনা যায় কেবল গায়ে বড় বড় গোল চাকা চাকা দাগ দেখে, দাগের ভিতরে কালোর নকশা, মুখে ও থাবায় লালের ছোঁয়া। এরা হয়তো উর্বরতা দেবীর পশু-প্রতীক, নিচে এক বেদীতে গম ও শরষে জাতীয় বীজের পোড়া অবশিষ্ট পাওয়া গিয়েছে। হয়তো গ্রীষ্মের শেষে মাঠে যখন শস্য পেকেছে তখন চাষীরা প্রথম ফসল ঘরে এনে আগে এখানে দেবীকে সকৃতজ্ঞ উৎসর্গ করেছে, তার সঙ্গে বেদীর উপর

রেখেছে মহামাতার ছোট ছোট মূর্তি। বেদীর গায়ে নিয়মিত নতুন পলস্তারা ও রং পড়েছে। চিতাবাঘদের উপরও চল্লিশটি প্রলেপ দেখা যায়—সম্ভবত নতুন উৎসবের বা অনুষ্ঠানের আগে বারে বারে এই নবীকরণ দরকার হয়েছে। তথাকথিত শকুনি মন্দিরের চিত্রে এই প্রকাণ্ড পাখির দল কতগুলি বিমুণ্ড মনুষ্য দেহের উপর উড়ন্ত, তাদের পাখা চিরুনির মত, মানুষ ও পাখির রং লাল। ঘরের মাটি খুঁড়ে ৮০০০ বছর প্রাচীন সমাধিস্থ অস্থি উন্মুক্ত হয়েছে ছ' জনের, তাদের সঙ্গে দেওয়া অলংকার ও অন্যান্য ব্যবহারিক জিনিস পত্র সাধারণ গার্হস্থ্য কবরের তুলনায় অনেক মূল্যবান, তার থেকে মনে হয় শুধু সমৃদ্ধিশালী ও সম্মানিত ব্যক্তিদের—যেমন পুরোহিত শ্রেণীর —এই মন্দিরে শেষ নিদ্রার অধিকার ছিল।

খনিত অংশটুকুতে এতগুলি সমাধি মন্দির এবং তাদের ভিতরে এই সব নজির দেখে মনে হয় এই অঞ্চলটি ছিল পবিত্র কেন্দ্র এবং অভিজাত বা সম্ভ্রান্তদের জন্য সংরক্ষিত, যেমন পুরোহিত সম্প্রদায় যারা মন্দির পরিচালনা করেছে এবং কাছাকাছি বাড়িতে বাস করেছে। সাধারণ চাষী মজুর মিস্ত্রীরা থেকেছে এই সম্ভ্রান্ত স্থলের থেকে দূরে, বছরের নির্দিষ্ট সময়ে উৎসবে পূজা পার্বণে এখানে সমবেত হয়েছে। হয়তো এসেছে পুণ্যার্থী ভক্তরা, করুণার্থী রুগ্ন পঙ্গুরা, প্রতিবেশী অঞ্চল থেকেও পরদেশীরা এসেছে তীর্থ করতে, দেব দেবীকে অর্পণ করতে সঙ্গে এনেছে উপরত্ন (semi-precious) পাথর বা দূরতর দেশ থেকে বাণিজ্যের আমদানী সামুদ্রিক খোলক ও চকমকি। চাটাল হুয়ুক যদি এমন পীঠস্থান হয়ে থাকে তা হলে তার আকর্ষণ শুধু অবসিডিয়ান বা হাতে গড়া বস্তু নয়, তার প্রতি ছিল আত্মার টান।

চাটালের অধিবাসীরা নিজেদের ঘরে ঘরেও মৃতের অস্থি সমাধি দিয়েছে, শয্যার বেদী খুঁড়ে তার নিচে। কি করে অস্থি প্রস্তুত করা হয়েছে তার ইঙ্গিত আছে প্রাচীর চিত্রে। সমাধিস্থ কঙ্কালগুলির কিছু সোজা চিত হয়ে শুয়ে, কেউ পাশ ফিরে হাঁটু ভাঁজ করে, ঠিক ছবিতে যেমন আছে, যদিও অধিকাংশেরই খুলি বর্তমান। মেলার্ট মনে করেন শিল্পীরা শুধু মৃত্যু বোঝাতে কিছু খুলি বাদ দিয়েছে এবং শকুনির কাজ ছিল মাংস খেয়ে হাড় পরিষ্কার করা, কারণ ঘরে সম্পূর্ণ শবের কবর দেওয়া অস্বাস্থ্যকর। কুকুর বা হায়না হাত পা ছিঁড়ে অন্যত্র নিয়ে তা খাবে, শকুনি তা করে না বলে তাঁর অনুমান লোকালয়ের বাইরে উঁচু কাঠের মঞ্চে শব রাখা হত, শকুনি রোদ বৃষ্টি বাতাস মিলে কাজ উদ্ধার করত। প্রতি বছর গৃহস্থরা

যখন ঘর দোর মেরামত ও রং করেছে তখন হয়তো কঙ্কাল নিয়ে এসেছে বাড়িতে, কারণ একই সময়ে তাদের কয়েকটি সমাধিস্থ হয়েছে মনে হয় এবং কেউ কেউ যে অন্যদের আগে প্রাণ হারিয়েছে তার চিহ্ন আছে। অন্ত্যেষ্টিকারীরা অস্থির উপর কাপড় পরিয়েছে বা জড়িয়েছে, পরলোকে ব্যবহারের জন্য নানা বস্তু দিয়েছে সঙ্গে। পুরুষরা সর্বদা স্থান পেয়েছে উত্তর-পুব শয্যা বেদীর নিচে, মেয়েরা ও সন্তানরা রান্নার জায়গার কাছে পুব দিকের বেদীর তলায় ; এর থেকেই মেলার্টের ধারণা যে জীবন কালে শয়ন ব্যবস্থা ঐ রকম ছিল, যে যার জায়গায় চিরনিদ্রায় শুয়েছে।

চাটালের মন্দিরে প্রাপ্ত নানা স্ত্রী মূর্তির মধ্যেও তন্বী তরুণী রূপ দেখা যায়, যথা চুনাপাথরের গড়া এমন এক নারী একটি চিতাবাঘের পিছনে দাঁড়িয়ে, গলায় তার রুমালের মত কিছু জড়ানো, তাতে ঐ জন্তুটির দেহের মত গোল গোল দাগ—যেন আমাদের কোনও দেবী ও তার বাহন। অন্যত্র এক স্থূলাঙ্গীর মাথাটি খসে গিয়েছে, সিংহাসনে বসে সন্তান প্রসব করছে সে, আসনের দুই হাতলে গার্হস্থ্য পশুর মুখ। মাপে প্রায় ১৭ সেনটিমিটার এই পুতুলটি রাখা ছিল ভাঁড়ারের এক শস্য ভাণ্ডের মধ্যে, যেন অন্নপূর্ণা সুপ্রচুর ফসল দেবে এই বিশ্বাসে। তা ছাড়া দেখা যায় এক প্রস্তর ফলকে উঁচু করে তোলা দুটি দৃশ্য, বাঁ দিকে দুই দেব দেবীর আলিঙ্গন যেমন ভারতের অনেক মন্দির গাত্রে, ডান দিকে তার পরিণতি—জননীর কোলে শিশু। আরও পাওয়া গিয়েছে চুনাপাথরে গড়া চিতাবাঘে চড়া এক ছিন্নমস্তক দেব, অন্যান্য মূর্তিতে একেই দেখা যায় শিব ঠাকুরের মত ষাঁড়ের পিঠে, কখনও বা সে নিজেই ষণ্ডরূপী। কিন্তু মূর্তি ও চিত্রের সংখ্যা থেকে মনে হয় চাটালের প্রধান আরাধ্য ছিল দেব নয়, দেবী ; দেয়ালের রিলিফ বা ছবিতে বার বার তার দেখা পাওয়া যায়, তা ছাড়া ৪১ মাটির বা পাথরের ছোট ছোট মূর্তির মধ্যে স্ত্রীর সংখ্যা ৩৩, পুরুষের মাত্র আট। পুরুষ দেব বা পুরুষের প্রতীক অন্যত্রও লক্ষিত হয়েছে, যেমন তুরস্কের আনাতোনিয়ায়, য়োরোপের বলকান অঞ্চলে ও ইংল্যানডে মাটির লিঙ্গ (বা শুধু পাথর) পুং শক্তির প্রতিভূ রূপে লোকাচারে প্রতিষ্ঠিত ছিল। জননী দেবীর পরে সূচিত হলেও এই ধারার প্রভাবও সুদীর্ঘ, ভারতে আজও বর্তমান।

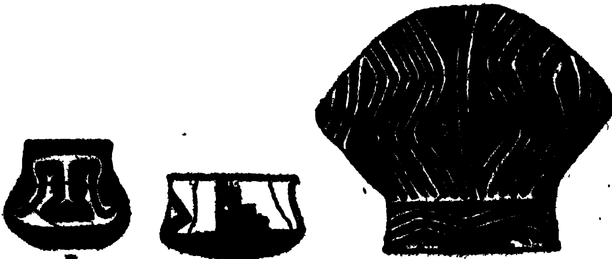
য়োরোপে অবশেষে যখন নবপ্রস্তর যুগ প্রবেশ করল তখন অধিবাসীরা মেগা-লিথ (গ্রীসীয় ভাষায় 'বিশাল শিলা') নামক আশ্চর্য সব সমাধি গৃহ গড়েছে। প্রথমটি এখন প্রায় ৫৫০০ বছর প্রাচীন, তার পর দুই সহস্রক ধরে এগুলি তৈরি

হয়েছে পশ্চিমে পর্টুগাল থেকে পুবে পূর্ব জার্মেনি এবং ব্রিটেনের উত্তরে শেট্‌ল্যানড দ্বীপপুঞ্জ থেকে দক্ষিণে ইটালি পর্যন্ত। বড় বড় প্রস্তর খণ্ড চাপিয়ে দেয়াল, তার উপর চ্যাপটা পাথরের পাটা ফেলে ছাত, তর পর সবটা মাটি দিয়ে বা ছোট ছোট পাথর দিয়ে ঢেকে ঘর সম্পূর্ণ হত। এই নির্মাণের কাজ যে কতটা শ্রমসাধ্য ছিল, এতে যে কতখানি গোষ্ঠী সহযোগিতা দরকার হয়েছে তা বোঝা যায় সেই সমাজের সহায় সম্বল, উপকরণ ও পদ্ধতি বিবেচনা করলে। প্রথমে ভারী ভারী পাটা কর্ম স্থলে টেনে আনতে হয়েছে মাঠ থেকে ; যেখানে তা অপ্রাপ্য সেখানে মাল সংগ্রহ করতে স্বাভাবিক গণ্ডশিলার (boulder) গায়ে আগুন জেলে তা তপ্ত করা হত, যাতে পরে ঠাণ্ডা জল ছুঁড়ে দিলে পাথর ফেটে টুকরো হয়। হাতুড়ির চেয়ে উৎকৃষ্ট যন্ত্র ছিল না মিস্ত্রীদের। ইংল্যানডে রড্‌মার্টন ঘাঁটির এক মেগালিথ বানাতে প্রায় ৫000 টন পাথর লেগেছে, অনুমান করা হয় এগুলি সংগ্রহ থেকে স্থাপন পর্যন্ত কাজে ২০০ লোক এক বছর ধরে খেটেছে। ফ্রানসে লোআর নদী উপত্যকায় ছাত তৈরিতে ব্যবহার হয়েছে ৮৬ টন ওজনের এক পাষাণ পাটা এবং সেটিকে তিন মিটারেরও বেশী উঁচুতে তুলতে হয়েছে। কোথাও কোথাও সমাধি গৃহ সম্পূর্ণ ভূগর্ভে নিমজ্জিত, সাধারণত শিলা যন্ত্রেই নরম পাথর কেটে সেগুলি নির্মিত।

সে সময়ে বিভিন্ন উপজাতি সম্ভবত ভিন্ন ভিন্ন বংশে ভাগ হয়েছে, তাদের বিশ্বাস ছিল অর্ধ-প্রাবাদিক কোনও পূর্বপুরুষ থেকে নিজ নিজ বংশের উৎপত্তি। পুরাবিজ্ঞানীদের ধারণা মেগালিথগুলি বংশের বড় কর্তা এবং তার নিকট আত্মীয় ও সহচরদের একাধারে সমাধি ও স্মৃতি সৌধ। কোনও কোনও ঘাঁটিতে একাধিক পৃথক প্রকোষ্ঠ তৈরি হয়েছে, বিভিন্ন বংশ বা গোষ্ঠীর জন্যও হতে পারে সেগুলি। মেগালিথ পরিকল্পনায় ও গঠনে নিশ্চয় নির্মাতাদের মত পুরোহিতদেরও গুরুতর অংশ ছিল এবং দুইয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগ দরকার হয়েছে। গৃহটি তৈরির অপেক্ষায় মৃতদেহ অন্যত্র থাকতে থাকতে হয়তো শেষ পর্যন্ত শুধু অবশিষ্ট হাড় ভিতরে রাখা হয়েছে—সংকারকারীরা পরলোকের পথে সঙ্গে দিয়েছে মাটির পাত্র, পুঁতি, কুড়াল, অস্ত্র ইত্যাদি। তার পর মেগালিথের প্রবেশ পথ পরবর্তী সমাধির সময় পর্যন্ত বন্ধ করে রাখা হয়েছে পাথর বা মাটির স্তূপ দিয়ে, এই পথটি গোপন রাখতে কখনও কখনও প্রচুর যত্ন আয়োজন দেখা যায়। হয়তো উদ্দেশ্য ছিল হাড় চুরি বন্ধ করা, কোনও কোনও সমাধি গৃহে প্রধান অস্থিগুলি অনুপস্থিত,

তার থেকে মনে হয় দুষ্ট বাদুর ক্রিয়া কলাপে তারা ব্যবহার হয়ে থাকতে পারে।

সে কালের মানুষ মৃৎপাত্রের গায়েও তাদের ধ্যান ধারণার চিহ্ন রেখে গিয়েছে। হাসিলারে ভাণ্ডের উপর শিল্পীরা মোটা রঙিন আঁচড়ে বিচিত্র চিত্র এঁকেছে, কিন্তু তারা এতই সাংকেতিক যে সহজে ছবির বিষয়টি চেনা যায় না, নজর করে দেখলে প্রায়ই নানা রকম মুখ ধরা পড়ে। চাটালের উদ্ঘাটক জেমস মেলার্ট এখানেও এমন অনেক ছবির ব্যাখ্যা করেছেন মহামাতা বা তার পুরুষ প্রতিরূপের প্রতীক বলে, যথা বাটির গায়ে সিঁড়ির মত তিনটি ধাপ আসলে দেবীর হাঁটু, স্তন ও মাথা—দেবী বসে আছে, তাকে পাশ থেকে দেখা যাচ্ছে (চিত্র ১৬খ)। কালো রঙে চিত্রিত একটি হাঁড়ি ব্যবহারের পর যখন উলটো করে রাখা হত তখন তা হয়ে পড়ত এক স্ত্রী মস্তক, প্রকাণ্ড দুই চোখ মেলে সর্বদর্শী জননী চেয়ে আছে (চিত্র ১৬গ), আবার কোনও পাত্রে শুধু বিস্ফারিত দুই নেত্র। হাসিলারে মৃৎশিল্প সূচিত হওয়ার মাত্র এক শতাব্দী পরেই (৫৬৫০ বিসি) কেউ গেলাসের আকারে গড়েছে এক অলংকৃত পাত্র, ছবির উদ্দেশ্য অনুরূপ হলেও এটি অনেক উৎকৃষ্ট শিল্প; লাল রঙের পাত্রটির গায়ে তুলির আঁচড়ে মুখাবয়ব ফুটিয়ে তোলা হয় নি, উলটো করলে স্পষ্ট হয় খোদাই করা টানা টানা দুই চোখ বিশালাক্ষী দুর্গার মত, তার মধ্যে নাকটি উঁচু করে তোলা। এর থেকে হয়তো ঢালা হয়েছে কোনও পবিত্র উপচার। চাটালের মত এখানেও ষাঁড় বর্তমান, হয়তো পুং উর্বরতার প্রতীক রূপে, ঘটি বাটির গায়ে তার মাথা ও শিং দুটি সংকেতে রূপায়িত (চিত্র ১৬ক) অথবা চারটি



চিত্র ১৬। হাসিলারের সাংকেতিক চিত্রাঙ্কিত মৃৎপাত্র।

মাথা গোল করে সাজানো। কোনও কোনও ভাণ্ডের নকশায় ঝুড়ির বুনন বা ফুলের ইঙ্গিত—হয়তো শুধু অলংকার, হয়তো ফলন বা পরিপূর্ণতার চিহ্ন।

ইরাকেও মাটির ঘট পাওয়া গিয়েছে যার গলায় আঁকা স্ত্রী মুখ, তার চোখের নিচে তিনটি দাঁড়ি টানা, তা হতে পারে বংশগত বা দলগত সাংকেতিক উলকি, অনেকটা টোটেম চিহ্নের মত। টোটেম এখনও দেশে দেশে আদিবাসী সম্প্রদায়ের সামাজিক ক্রিয়াকলাপে ওতপ্রোত রূপে জড়িত, সাধারণত কোনও প্রাণীর প্রতীক এই বহু গোষ্ঠীকে মৈত্রীর সূত্রে বাঁধে। মিশরে যে সে কালে টোটেম তন্ত্র প্রচলিত ছিল তার কিছু ইঙ্গিত মেলে, বিভিন্ন পল্লী টোটেম চিহ্ন ধারণ করত, ঘটের গায়ে সে সব সংকেত আঁকা হয়েছে।

হাসিলারে ভাণ্ডের গায়ে আরও দেখা যায় হাতের ছবি. তার থেকেও মনে পড়ে পুরাপ্রস্তর যুগের গুহাচিত্র। গুহাচিত্রে গুহার দেয়ালে হাত রেখে তাকে ঘিরে তুলি চালানো হয়েছে, যেমন চাটালের মন্দির প্রাচীরে আমরা দেখেছি। গুহাচিত্রে মাঝে মাঝে একটি আঙুল বা অংশ অনুপস্থিত, যেমন এখনও নাকি কোনও কোনও অনুন্নত সমাজে দেবতা বা আত্মার তুষ্টির জন্য এই উৎসর্গ দেখা যায়। হাসিলারের হাতগুলি বাস্তবিক ছাপ নয়, হালকা জমির উপর রঙিন ছবি, কিন্তু এখানেও চিত্রকর একটি বা দুটি আঙুল বাদ দিয়েছে। এবং ভূমধ্য সাগর সংলগ্ন অনেক অঞ্চলে অপদেবতা বা অমঙ্গল দূরে রাখতে তিন আঙুলের মুদ্রা এখনও প্রচলিত। প্রাচীন মানুষের ভাবনায় ভিড় করে ছিল প্রবল অশুভ শক্তির দল, তাদের তোষণ করতে অথবা দলে নিতে অনেকটা উদ্যোগ ব্যয় হত, নতুবা সমূহ বিপদ—আজও আদিবাসী সমাজে তা দেখা যায়, সভ্য মানুষও এই আশঙ্কা ও তার প্রতিকারের চেষ্টা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়।

পুরাপ্রস্তর সম্প্রদায়ে যাদুর প্রভাব অতীব বদ্ধমূল ছিল. ব্যবহারিক ও কাল্পনিক উদ্দেশ্য সাধনে. যেমন শিকার ধরতে, শত্রু দমনে অথবা দেবতাকে খুশী রাখতে প্রতি দিন তুকতাক ব্যবহার হয়েছে। যা ছিল আধিভৌতিক, মানুষের মনে তাই ছিল আধিদৈবিক, ভূমিকম্প বা দাবানল দেবতার রোষ, তা থামাতে পারে কেবল যাদু বল। পরবর্তী কালে যে অনুরূপ বিশ্বাস একেবারে মিলিয়ে যাবে না তাই স্বাভাবিক এবং তার অসংখ্য নজির আছে। ভূমধ্য সাগর অঞ্চলেই কবচ জাতীয় বস্তুর চিহ্ন মেলে, এক জায়গায় আদি

কৃষি সমাজে অতি ক্ষুদ্র পাথরের কুড়াল ছিদ্র করে গলায় ঝোলানো হত, হয়তো এই সনাতন হাতিয়ারের শক্তি আহরণের উদ্দেশ্যে। ঐতিহাসিক কালের সুসভ্য জ্ঞানী গ্রীসীয়রা পর্যন্ত ভয় করত এক লক্ষ্মীছাড়া দানবকে যার কাজ ছিল পোড়াবার সময়ে মাটির পাত্র ফাটিয়ে দেওয়া, একে দূরে রাখবার উদ্দেশ্যে তারা চুলার গায়ে এক ভয়ংকর মুখোস লাগিয়ে রাখত। নবপ্রস্তর সমাজে যাদুতে বিশ্বাস ও নির্ভরতা যে প্রবল ছিল তা কিছুটা অনুমান করা যায় পৃথিবীর সব দেশের পুরাণে উপকথায় তার প্রভাব লক্ষ্য করে। কোথাও মায়াদণ্ডের চালনায় ফসল ফলে উঠেছে (মধ্য আমেরিকা), মন্ত্র বলে বৃষ্টি আনা তো সহজ (দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগর), এমন কি মড়া পর্যন্ত জেগে উঠেছে (আইসল্যানড) ; কঠিন কাজ সম্পন্ন করতে এক ভাইয়ের নির্ভর নিজের বাহু বল, আর এক ভাইয়ের যাদু বল (মিশর)। যাদু অবশ্য অনিষ্টও করতে পারে—পারসীক পুরাণে দেখা যায় অসত্যের আধিপত্য কালে ধর্ম যখন মরে গেল, তখন যজ্ঞে পবিত্র উৎসর্গ বলে কিছু ছিল না, অপদেবতাদের থেকে শেখা যাদু ও কুহক ফলিয়ে মানুষ নানা পাপ কাজ করে চলল, সৎ কাজ করতে হত গোপনে। যাদু ও মন্ত্রের ক্ষমতা প্রসঙ্গে ভারতীয় পুরাণ কাহিনীর থেকে উল্লেখ বাহুল্য। এই সব সাহিত্যের আজ যা চেহারা তা হয়তো এক দুই হাজার বছরের বেশী প্রাচীন নয়, কিন্তু কোন অতীতে তাদের উন্মেষ তা কে বলতে পারে। ভারতেই অনেক ভাবধারার আমদানি ইরান থেকে আর্যদের সঙ্গে, তাদের অঙ্কুর দেখা দিয়েছে আরও দূর দেশে দূর কালে—তার আলোচনা পরে।

চাষ ও পশুপালন শিখেই শিকার ও সংগ্রহ বন্ধ হয় নি, চাটালবাসীরাও বন্য পশু মেরেছে। তাদের মন্দিরের কাছাকাছি গর্তে অনেক পোড়া মাটির তৈরি পশু মূর্তির খণ্ড পাওয়া গিয়েছে, যেমন ষাঁড় বা বুনো শুয়োর, এই প্রাণীটির কর্কশ লোম মাটির গায়ে নখের রেখায় রূপায়িত দেখা যায়। ষাঁড়, চিতাবাঘ ও অন্যান্য প্রাণী অবশ্য উর্বরতা বা আর কিছুর প্রতীক হতে পারে, কিন্তু ঐ ভাঙা খণ্ডগুলির ইঙ্গিত মাংস এবং উদর পূরণের দিকে হওয়াও অসম্ভব নয়। এই সব ছোট ছোট মূর্তিগুলি স্মৃতি জাগায় আরও অনেক হাজার বছর আগে য়োরোপে ক্রোমানীয় (Cro-magnon) মানবের স্থাপত্য ও গুহাচিত্রের,

বর্শার আঘাতে নিহত পশুর ছবি এঁকে মূর্তি গড়ে তারা মনে সহজ শিকারের আশ্বাস পেয়েছে। তেমনি চাটালের বাসিন্দারা হয়তো লক্ষ্য পশুর প্রতিকৃতি বানিয়ে পুরোগামীদের মত যাদু বলের বিশ্বাসে এবং পুরোহিতদের নির্দেশ অনুসারে তা ভেঙেছে, তারাও হয়তো আনুষ্ঠানিক নাচে গানে মত্ত হয়েছে।

মধ্যপ্রাচ্যের সব আদি গ্রামেই ভিনাস বা জননী দেবীর মূর্তি পাওয়া যায় নি, কোথাও কোথাও ধর্মীয় রীতি নীতির প্রায় কোনও নজিরই দেখা যায় না। সে কালের কোনও সমাজে এই ধরনের বিধি বিধানের একেবারেই স্থান ছিল না এমন সম্ভাবনা প্রায় অকল্পনীয়, এ সব জায়গায় হয়তো তার চিহ্ন এখনও উদ্ঘাটিত হয় নি অথবা আবিষ্কারের ধর্মাত্মক তাৎপর্য এখনও ধরা পড়ে নি। বেইধাতে পাঁচ শতাব্দী কাল বসবাস থেকে মাত্র একটি মাতৃদেবী মূর্তি পাওয়া গিয়েছে, হয়তো সেখানে তার উপাসক বেশী ছিল না। তবে বেইধা আরও কৌতূহলজনক কিছু বস্তু ও রহস্য রেখে গিয়েছে ; গ্রামের ৪৬ মিটার পূর্বে আছে বিভিন্ন কালে পুনর্গঠিত তিনটি ডিমাকার বাড়ির ধ্বংসাবশেষ, মধ্যস্থ বাড়িটি সবচেয়ে বড়, প্রায় ৬×৩.৭ মিটার, মেঝে গাঁথা হয়েছে ছোট ছোট চোথা শিলা খণ্ড দিয়ে, তার উপর ইতস্তত ছড়ানো হাড়ের তৈরি অস্ত্রের অগ্রাংশ। ঘরের কেন্দ্র স্থলে রক্ষিত ছিল কাছাকাছি পাহাড় থেকে সংগৃহীত লম্বা চতুষ্কোণ মস্ত এক বালুপাথরের পাটা, প্রায় এক মিটার উঁচু। মেঝেতে আরও দুটি পাথরের পাটা বসানো, বাড়ির বাইরে আর একটি, তাকে ঘিরে যে নিচু এক পাষাণ প্রাচীর ছিল তার নজির রয়েছে। অদূরে পাওয়া গিয়েছে মোটামুটি ত্রিকোণ এক চুনাপাথরের পাটা, তার লম্বা দিকটার মাপ ৩.৭ মিটার, ভিতরটা খুবলে নিচু করা।

এ সবের গূঢ় অর্থ কি হতে পারে তা নিয়ে পণ্ডিতরা মাথা ঘামাচ্ছেন, পলস্তারা ও রঙের কাজ জানা থাকলেও বেইধার নির্মাতারা তা দিয়ে এই পাথরগুলির শোভা বাড়াতে চেষ্টা করে নি। এই কঠোর আড়ম্বরহীনতার তুলনায় ইসলাম ও ইহুদী ধর্ম মতের উল্লেখ করা হয়েছে যাতে কোনও রকম মূর্তি পূজা বা পৌত্তলিকতা নিষিদ্ধ। ইসলামের কেন্দ্র-পীঠ মক্কার প্রসিদ্ধ কালো পাথর (আসলে উল্কা খণ্ড), মহম্মদের থেকে অনেক প্রাচীন তা। জল্পনা হয়েছে বেইধার মূর্তিশূন্য পুণ্য গৃহের মধ্যস্থানীয় পাথরটি তার সুদূর পুরোগামী হতে পারে।

এটা হয়তো খাপছাড়া অনুমান. তবে বিভিন্ন নবপ্রস্তর ঘাঁটিতে এমন নানা জিনিস দেখা দিয়েছে যার উদ্দেশ্য তিমিরাবৃত—অদ্ভুত আকারের পাথর, বস্তুর গায়ে চিহ্ন বা আঁচড় যা কেবল আলংকারিক বলে মনে হয় না, অপ্রত্যাশিত স্থানে রক্ষিত নরকপাল। এরা কোনও না কোনও বিলুপ্ত ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে জড়িত মনে হয়, যদিও তাদের তাৎপর্য কখনও জানা যাবে না।

কিন্তু মানুষের মন বোধহয় কখনও শুধু দেব দেবী, সংস্কার ও লোকাচারের গণ্ডির মধ্যে সম্পূর্ণ আবদ্ধ থাকতে চায় না. নবপ্রস্তর যুগের এত বড় একটা বিপ্লবের পর তা থাকা নিশ্চয় আরও কঠিন হয়ে পড়েছিল। উপরে যা বর্ণিত হল তা যদি হয় ধ্যানের জগৎ তবে এ বার একটি জ্ঞানের জগৎও ধীরে ধীরে উনমোচিত হচ্ছিল, এক নতুন আলোয় অস্পষ্ট ধরা দিচ্ছিল প্রকৃতি। আজ যাকে আমরা উদ্ভিদ বিদ্যা ভূতত্ত্ব রসায়ন জ্যোতিষ ইত্যাদি বলি তার অনেক কিছু মানুষকে শিখতে হয়েছে নিতান্ত প্রয়োজনের দায়ে। গম বা যবের খেতে আগাছা কি করে চেনা যায়, কোন মাটিতে ফসল ভাল হবে. কোন কাদা ঘটি বাটি তৈরির উপযুক্ত, তার সঙ্গে আর কি মেশালে ভাল হয়, কোন ঋতুতে ফসল বোনা দরকার, কখন বৃষ্টি নামবে, কবে শস্য পাকবে—এই সব জিজ্ঞাসার মধ্যে অনেক শাস্ত্রের বীজ নিহিত। ঋতুচক্রের হদিস রাখতে হল আকাশের তারার দিকে চেয়ে, বিশেষ নক্ষত্র মণ্ডলের অবস্থান লক্ষ্য করে। প্রতি বছর একই দিনে নীল নদের দু কূল ভেসে যেত, এরই থেকে সৌর ক্যালেনডার বা বর্ষ-পঞ্জীর জন্ম—সে কাহিনী পরে আলোচ্য। এতে এক দিকে যেমন প্রকৃত জ্যোতিষ বিদ্যার সূচনা হয়েছে, অন্য দিকে তেমনি বিবিধ গ্রহ নক্ষত্র ভাগ্যনিয়ন্তা বলে গণ্য হয়েছে—কেউ আবির্ভূত হয়ে জানায় এ বার বীজ বোনার সময় এসেছে, কেউ দেখা দিলে নদীতে বান ডাকে, ঘর বাড়ি খেত খামার ভেসে যায় (আজও আমরা কথায় বলি গ্রহের ফের)। অন্তরীক্ষের পটে একই ঘটনার থেকে গণিতকার ও গণৎকারের উদ্ভব --এমনি করেই বিজ্ঞান ও অন্ধসংস্কার মানুষের চলার পথে তার দুই পাশে আজ পর্যন্ত চলেছে। নতুন আবিষ্কারের ফলও যে সর্বদা ভাল হয়েছে তা নয় ; কৃষির রহস্য উদঘাটনের পর প্রাথমিক উনমাদনায় প্রকৃতির স্বাভাবিক সাম্য (balance of nature) ব্যাহত করেছে মানুষ. নির্বিচার চাষের ফলে ভূমি ক্ষয় হল, বৃহৎ ভূখণ্ড মরুতে পরিণত হল। সংগ্রাহক বৃত্তির শেষে উৎপাদক বৃত্তির শুরুতে জমির প্রতি যে

মমতা ও মালিকানার দাবি গড়ে উঠল পরবর্তী যুগে তা ব্যক্তি পরিবার পল্লী দেশ ইত্যাদির গণ্ডির মধ্যে কত সংঘর্ষ ও যুদ্ধ বিগ্রহের কারণ হয়েছে, আজও হচ্ছে। বস্তুত নবপ্রস্তর যুগের অনেক আবিষ্কার যেমন এখনও আমাদের সভ্যতার ভিত্তি, তেমনি সে কালে যে সমাজ ব্যবস্থার সূত্রপাত হয়েছিল আধুনিক জগতে তা নিতান্ত অকুলান প্রতিপন্ন হলেও আজও আমরা প্রকৃত পক্ষে তার ঊর্ধ্বে উঠতে পারি নি।

দ্বিতীয় পর্ব

ইতিহাসের দরজায়

৯। পাথর থেকে ধাতু

আজ ধাতুহীন জীবন আমাদের কল্পনার অতীত, জল স্থল ও আকাশ যান অধিকাংশে ধাতুনির্মিত, প্রায় সব দৈনন্দিন কাজে কোনও না কোনও ধাতুর অংশ আছে। অস্ত্রে যন্ত্রে সামান্যতম উপকরণেও নবাগত প্লাসটিক ধাতুর সম্ভ্রম ও আভিজাত্য ব্যাহত করতে পারে নি, আগে যেমন লক্ষ লক্ষ বছর ধরে পাথর, হাড় ও কাঠের আধিপত্য অক্ষুন্ন ছিল। তার কারণ ধাতু শ্রেণীর সামগ্রিক ও বিভিন্ন গুণ। এখন লোহার ব্যবহার সবচেয়ে ব্যাপক, কিন্তু ইতিহাসের দলিলে তার দেখা মেলে অন্য কয়েকটির অনেক পরে।

ধাতুর সঙ্গে মানুষের পরিচয় অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালের কথা হলেও সে হাজার হাজার বছর ধরে ধাতুবাহী বস্তু ব্যবহার করেছে। লক্ষ বছর প্রাচীন নেআনডার্টাল মানব বিবর্ণ শবে রক্তিমা ফিরিয়ে আনতে মাখিয়েছে লোহার অকসাইড হিমাটাইট, এখন যেমন মেয়েরা ঠোঁটে গালে রং মাখে তেমনি পুরাপ্রস্তর যুগের মানুষও মরচে-লাল হিমাটাইট, মরকত-সবুজ ম্যালাকাইট ও অন্যান্য গেরিমাটি গুঁড়ো করে দেহ সাজিয়েছে এবং তা দিয়ে গুহার দেয়ালে নিপুণ হাতে আশ্চর্য ছবি এঁকেছে, তার পর নবপ্রস্তর যুগের শিল্পীরা মৃৎপাত্র চিত্রিত করেছে। কিন্তু তারা জানত না ম্যালাকাইটে লুকিয়ে আছে নবোদিত জবাকুসুমসংকাশ সূর্যের মত রাঙা তামা বা হিমাটাইটে অটুট কঠিন লোহা।

উত্তর-পুব ইরাকের বৃহৎ শানিডার গুহায় পুরাপ্রস্তর মানুষের বসবাসের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে আজ থেকে লক্ষ বছর আগে, ১৯৬০ সালে ফসিল উদ্ধারের কাজে মার্কিন অনুসন্ধানী রাল্‌ফ সলেকি সেখানে পেলেন প্রায় আড়াই সেনটিমিটার লম্বা তামার একটি অলংকার। বস্তুটির আকার চোখের মত, দুই কোণে ফুটো কোনও সুতো ঢোকাবার জন্য, হয়তো তা ছিল কোনও সুন্দরীর কণ্ঠহারের মধ্যমণি অথবা শোভা পেয়েছে অন্য কোনও অঙ্গে। জিনিসটি তৈরি হয়েছিল ৯৫০০ বিসিতে যখন নবপ্রস্তর যুগের সূচনাই হয় নি। পরবর্তী নজিরের বয়স প্রায় ২৩০০ বছর কম, কয়েক শো কিলোমিটার দূরে দক্ষিণ-পুব আনাতোলিয়ায় কাইয়নু ঘাটিতে রবার্ট

ব্রেইডুড ও তাঁর এক সহকর্মী ১৯৬৪ সালে চারটি তাম্র বস্তু আবিষ্কার করেন। দুটি দেখতে আলপিনের মত, এক দিক চ্যাপটা আর একদিক চোখা, তৃতীয়টি বঁড়শির মত বাঁকানো, চতুর্থ বস্তুটি কেউ গড়েছিল এক খণ্ড তামা হাতুড়ি মেরে সরু করে, সম্ভবত তা ব্যবহার হয়েছে ফুটো করতে বা খোবলাতে। সবগুলিরই সৃষ্টি তারিখ প্রায় ৭২০০ বিসি। তার পর অনেকগুলি বছর বাদ দিয়ে আমরা ৬৫০০ বিসির পরে মধ্যপ্রাচ্যের নানা স্থানে তাম্র বস্তুর দেখা পাই, এই সব নজির থেকে বোঝা যায় যে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ সহস্রকে তামার খবর চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, যথা আমাদের পরিচিত চাটাল হুয়ুকের নিম্নতম স্তরে উপস্থিত ছিল পিটিয়ে তৈরি পাত গোল করে মুড়ে নির্মিত ছোট ছোট নল এবং তার সঙ্গে লাল ক্যালসিদনির পুঁতি, মনে হয় যেন ধাতু ও পাথর পর পর গেঁথে গলার হার গড়া হয়েছিল। আলি কশ আর হাসিলারেও তামার পুঁতি উদ্ধার হয়েছে।



চিত্র ১৭। প্রাচীন মুক্ত তামার বস্তু। শানিডার গুহায় প্রাপ্ত মধ্যমণির মত অলংকার ও আদিতম ধাতব ব্যবহারিক বস্তুর অন্যতম পিন (ইরান)।

হয়তো আদি কৃষিবাসীরা পাত্র গড়তে বিশেষ গুণের মাটি বা প্রসাধনের উপযুক্ত গেরিমাটি খুঁজতে খুঁজতে পেয়েছে বিশুদ্ধ তামা বা সোনা, দেখেছে ঘা মেরে কাদা মাটির মতই তাদের আকৃতি বদলানো যায়, অথচ সহজে ভাঙে না তারা। হাতুড়ির আঘাতে উপরের মলিন প্রলেপটি সরে গিয়ে ভিতরের চকচকে চেহারা চমক লাগিয়েছে। এ ভাবে প্রথম ধাতু আবিষ্কার হয়ে থাকতে পারে, অথবা মাটি বা

পাথরের তুলনায় মুক্ত তামা বা সোনার বিশিষ্ট রূপ তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, কৌতূহলও জাগিয়েছে। যুগ যুগ ধরে পাথর দিয়ে কাজ করেছে মানুষ, সুতরাং এগুলিও নিশ্চয় নতুন জাতের শিলা বলেই ভেবেছে সে। মুক্ত ধাতুর আদিতম ব্যবহার প্রকৃত ধাতু যুগের কয়েক হাজার বছর আগেই দেখা যায়।

সবচেয়ে আগে মানুষ কি ধাতু ব্যবহার করেছে তা জানবার উপায় নেই, কেউ বলেন তামা, কেউ বলেন সোনা। সোনা প্রায়ই মুক্ত অবস্থায় থাকে এবং বেলাভূমির বালিতে বা পাহাড়ের গায়ে বৃষ্টিধৌত পাথরে তার চকচকে দানা সহজেই চোখে পড়ত, সুতরাং মনে হতে পারে কাঞ্চনই অগ্রদূত। কিন্তু এই ধারণার প্রমাণ পাওয়া কঠিন, তার প্রধান কারণ ধাতুটি প্রথম থেকেই মূল্যবান বিবেচিত হয়েছে এবং অল্প তাপে নমনীয় বলে সে কালের মানুষ সহজেই তা কাজে লাগিয়েছে গহনা বা অন্যান্য বিলাস দ্রব্য গড়তে। কিন্তু আদি সুবর্ণ বস্তুর অধিকাংশই মানুষ গলিয়ে ফেলেছে, হয় নতুন কিছু বানাতে অথবা চোরাই মাল গোপন করতে। এই রূপান্তরের ফলে লোপ পেয়েছে প্রাথমিক তারিখ। প্রায় অবিনাশী বলে শতাব্দীর পর শতাব্দী এ ভাবে একই সোনা নব নব রূপ নিয়ে টিকে আছে—হয়তো যা একদা কোনও প্রাগৈতিহাসিক নবোঢ়া কন্যার চিরুনিতে শোভা পেয়েছে তার অংশ আজ আমাদেরই কারও ফাঁপা দাঁতের গহ্বর পূরণ করছে।

প্রাচীন ভারতীয়দের সোনা সংগ্রহ সম্বন্ধে হিরডটাসের ইতিহাসে এক মজার গল্প আছে। ভারতের উত্তরে তখন নাকি এক মরুভূমি ছিল, তার বালিতে অনেক সোনা। সেখানে এক জাতের পিঁপড়ের বাস, তারা আকারে "শেয়ালের চেয়েও বড়"। দুপুরের গরমে তারা যখন ঘুমিয়ে পড়ত তখন ভারতীয়রা উটে চড়ে গিয়ে সংগ্রহ করে আনত বালি। ঘুম থেকে উঠে পিঁপড়ের দল অতি দ্রুত তাড়া করত তাদের, তখন মর্দা উটগুলিকে ফেলে তারা মাদীগুলিকে নিয়ে কোনও গতিকে ঘরে ফিরত। সন্তানের আকর্ষণে মাদীরা যেমন ছুটত মর্দারা তেমন পারত না বলেই তারা এই অতিকায় পিঁপড়ের পেটে যেত। হিরডটাসের পুরাবৃত্ত এক এক সময়ে রূপকথায় পরিণত হয়েছে।

রূপাও আদি কাল থেকে মানুষকে আকৃষ্ট করেছে, সোনার মত বিশুদ্ধ অবস্থায় তা বড় পাওয়া যেত না, বিরল বলে কোথাও কোথাও তার সমাদর ছিল ঐ হলদে ধাতুর চেয়েও বেশী। বাইরের ঔজ্জ্বল্য ছাড়াও তাদের আকর্ষণের আর এক কারণ

ছিল যে দুটিই পিটিয়ে গড়া যায়। দুইয়ের সংযোগে এক স্বাভাবিক সংকর ধাতুর (alloy) নাম ইলেক্ট্রাম, তার রং প্রায় সোনার মত, মনে হয় সে কালে কাঞ্চন বলে বিবেচিত বস্তুর অনেকটা আসলে এই যুগ্ম ধাতু। এরা সব আলংকারিক, কিন্তু তামা ক্রমে প্রধানত ব্যবহারিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হয়েছে। এই কারণে পুরাবিৎরা প্রকৃত ধাতু যুগের প্রথম পর্যায়ের নাম দিয়েছেন তাম্র যুগ বা তাম্রপ্রস্তর যুগ (ক্যাল্‌কোলিথিক, দুটি গ্রীসীয় শব্দ থেকে), কারণ তামার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে পাথুরে উপকরণের ব্যবহার বন্ধ হয় নি. বেশ কিছু কাল পাশাপাশি চলেছে। তামার নিয়মিত প্রচলন থেকে তাম্রপ্রস্তর যুগের সূচনা ৬০০০ বিসি নাগাদ, তা নবপ্রস্তর ও পরবর্তী কাংস্য যুগের মধ্যবর্তী বলা যায়। তামা ও টিনের (রাং) সংকর ধাতু কাঁসা, তা সাধিত হয়েছে ইতিহাসের উষায় ৩৫০০-৩০০০ বিসির মধ্যে, অবশ্য তার সঙ্গেও প্রায়ই পাথরের অস্ত্র উপকরণ চলেছে অনেক দিন পর্যন্ত। কেউ কেউ কাংস্য যুগকে পৃথক বলে দেখেন না, তা তাম্র যুগেরই অংশ মনে করেন।

বলা বাহুল্য, যেমন নবপ্রস্তর যুগ সর্বত্র যুগপৎ শুরু হয় নি তেমনি তামা ও কাঁসার চলনও না। সমকালীন দুই সম্প্রদায় হয়তো কোথাও অস্ত্র যন্ত্র বানাচ্ছে প্রধানত কাঁসা দিয়ে, অন্যত্র পাথরই চলছে। চীন ও ব্রিটেন পাথর থেকে তামা পেরিয়ে প্রায় সোজাসুজি লাফ মেরেছে কাঁসায়। জাপানে কাঁসা ও লোহা প্রায় একই সঙ্গে দেখা দিয়েছে, যদি না লোহা আরও আগে এসে থাকে। আমেরিকা মহাদেশে ১৬শ শতাব্দে য়োরোপীয়দের আগমন পর্যন্ত প্রধান উপাদান ছিল শিলা, যদিও মেকসিকো এবং মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার অন্যত্র ধাতু জানা ছিল এবং সুদক্ষ স্বর্ণকাররা চমৎকার অলংকার বানিয়েছে।

পাথরের সঙ্গে ধাতুর তুলনায় নিশ্চয় মানুষ তার কতগুলি গুণ লক্ষ্য করেছে। তামার কুড়াল বা বর্শা ফলকে ধার বেশী দিন টেকে, তাদের মুখ অত সহজে চটে যায় না, ক্ষয়ে যায় না। ধাতব উপকরণের পরিকল্পনায় স্বাধীনতা বেশী এবং তার মূর্তি দান আরও সহজ, যেমন কাস্তে তৈরি হবে একটি খণ্ডে—আগে এক এক করে যে চকমকির টুকরো হাড়ের গায়ে পাশাপাশি বসাতে হত তা সহজে খুলে যেত, ভোঁতা হয়ে যেত। ধাতুর বস্তু কখনও একেবারে ফেলে দেওয়ার দরকার করে না, অকেজো হয়ে পড়লে গলিয়ে আবার নতুন কিছু বানিয়ে নিলেই হল। তামার সরঞ্জাম বানাতে আলাদা আলাদা খণ্ড তাতিয়ে জুড়ে দেওয়া চলে। এত

সুবিধা সত্ত্বেও যে ধাতু যুগে পাথর বা হাড়ের ব্যবহার অবিলম্বে বন্ধ হয় নি তার একটা কারণ সম্ভবত এই যে উপযুক্ত তাম্রবাহী পাথর সাধারণ পাথরের মত সর্বত্র সহজলভ্য নয়, বিশেষত পলিবাহী আবাদী জমির কাছাকাছি। দ্বিতীয়ত, মানুষ সহজে সনাতনকে ছাড়তে চায় না।

মধ্যপ্রাচ্যের নানা জায়গায়, ইরাক ও ইরানে, সিরিয়া, সাইনাই মরু এবং আনাতোলিয়ার প্রান্তর ও পাদপর্বতের স্থানে স্থানে পাথরের কোলে ছিল বিশুদ্ধ মুক্ত তামা এবং তার আকরিক। যুগ যুগ ধরে রোদ বৃষ্টি তাপের প্রভাবে পাথর ক্ষয়ে ক্রমে তা দৃষ্টিগোচর হয়েছে, কখনও বা মুক্ত তামা খসে মাটিতে পড়েছে। তামাকেও পিটিয়ে কিছুটা রূপ দেওয়া চলে. অনেক দিন পর্যন্ত এই মুক্ত তামা দিয়েই কাজ হয়েছে, তা পিটিয়েই কাইউনু ঘাঁটির মত ছোট ছোট উপকরণ তৈরি হয়েছে। পাথরের গায়ে যে ধাতু লেগে আছে তা খুঁটেই বার করা যায়, কিন্তু ক্রমে আভ্যন্তরিক তামার উদ্ধারে কিছুটা বুদ্ধি খাটাতে হয়েছে, পাথরের ধারে আগুন জেলে তাতিয়ে তাতে ঠাণ্ডা জল ঢেলে পাথর ফাটিয়েছে অনুসন্ধানীরা। সোনা রুপার মত তামার বস্তুও বহু কাল ধরে মুক্ত ধাতু হাতুড়ি পিটিয়ে বানিয়ে ধাতুকর্মীরা সম্ভবত আকস্মিক ভাবে শিখেছে যে কিছুটা গরম করে নিলে এই রূপ দানের কাজটা সহজ হয়, তামা না ভেঙে আরও পিটুনি সইতে পারে, পাতলা পাত্র বানিয়ে ফেলা চলে। আগুনের তাপে সম্পূর্ণ গলনীয়তাও একদা ধরা পড়েছে—কি করে কে জানে। উৎকৃষ্ট মৃৎপাত্র বানাতে কুমোররা উচ্চ তাপের চুলা বানিয়েছিল, হয়তো তাতে কেউ ধাতুর খণ্ড ফেলেছে পাত্রে নতুন রং আনা যায় কিনা তা পরীক্ষা করতে, অবাক হয়ে দেখেছে এই অদ্ভুত 'পাথর' তরল হয়ে গেল. পরে চুলা ঠাণ্ডা হলে আবার পাথর বনে গেল। এই কঠিন থেকে তরল, আবার তরল থেকে কঠিনে রূপান্তর নিশ্চয় এক অলৌকিক ঘটনা বলে মনে হয়েছে।

কিন্তু শুধু মুক্ত ধাতু দিয়ে চির দিন চলতে পারে না, প্রকৃত ধাতু বিজ্ঞানের শুরু আকরিক বস্তু থেকে ধাতুর নিষ্কাশনে। কোনও কোনও বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে স্বাভাবিক তামা দুর্লভ হয়ে পড়ার পরেই সম্ভবত আকরিকের যৌগিক ধাতুটির নিষ্কাশন আরম্ভ হয়েছে, কিন্তু এ সম্বন্ধে স্পষ্ট প্রমাণ কিছু নেই। যাই হক, নিষ্কাশনের রহস্য কি করে প্রথম ধরা পড়ল সেটা আরও আগ্রহজনক।

এখানে আমরা আপাতত ধাতুর প্রসঙ্গ থেকে সরে গিয়ে একটু মণি রত্নের আলোচনা করি। বহু পুরা কালেই মানুষ দূর দূরান্তর থেকে কড়ি শুক্তি শাঁখার মত মণি জহরও সংগ্রহ করেছে; প্রায়ই সে সব দূর দেশ থেকে দুর্গম পথ বেয়ে আনা। মিশরের কবরে ম্যালাকাইট, লাজাবর্দ, জামীরা, ফিরোজা, অবসিডিয়ান ও রজনজাত রত্ন উপরত্নের সাক্ষাৎ মেলে। সিরিয়া, অ্যাসিরিয়া ও সুমের অঞ্চলেও মণি রত্নের আমদানি প্রাচীন কাল থেকে ক্রমশ বেড়ে চলেছিল। সম্ভবত স্থায়ী বসতির মধ্যে মধ্যে বেদুইনদের মত যাযাবর ব্যাপারীদের আনাগোনা চলত, এ সব পণ্যের পরিবর্তে চাষী সম্প্রদায় থেকে খাদ্য সংগ্রহ করত তারা।

রূপ ও বর্ণের গুণে পুরাপ্রস্তর যুগ থেকে মণি রত্ন সম্পূর্ণ বিলাসের সামগ্রী হিসাবে সংগৃহীত হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু পরে তারা যে নিতান্ত প্রয়োজনের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। আবার এমন সম্ভাবনাও উল্লেখ করা হয়েছে যে অলংকার রূপে ব্যবহারের আগে তারা ছিল যাদু বস্তু। কোনওটা হয়তো বৃষ্টি আনত মাঠে, কারও প্রভাবে সন্তান আসত ঘরে। গ্রীসীয় নারীরা 'দুগ্ধশিলা' গুলে খেত দুগ্ধবতী হবে বলে। এ বিষয়ে বেশী বলবার প্রয়োজন নেই—আজও আমরা নীলার আংটি পরি রোগ সারাতে, কবচ ধারণ করি শত্রুর দ্বেষ কাটাতে বা রেসের ঘোড়াকে জেতাবার আশায়। মণি রত্নের ক্ষমতা সম্বন্ধে এ ধরনের সংস্কারের জন্ম হয়তো নবপ্রস্তর সমাজে, যদিও এর পূর্বাভাস পাওয়া যায় আরও প্রাচীন কালে কড়ির মত অল্পমূল্য বস্তুকে ঘিরে। শুধু পাথর জহর কিংবা কড়ি ঝিনুকের নয়, সোনা রূপারও এই রকম সাংকেতিক অর্থ নিশ্চয় গড়ে উঠেছিল সে কালে। এদের মোহিনী বর্ণচ্ছটা ও রূপবৈচিত্র্যের থেকেই হয়তো জন্মেছে অলৌকিকতার ধারণা, কিন্তু কখনও কখনও সংস্কারের আড়ালে যুক্তির ইশারাও মেলে; মিশরের লোকে ম্যালাকাইটের সবুজ রং লাগাত আঁখি পল্লবে, তাতে চোখের শোভা বাড়ত নিশ্চয়, কিন্তু দেখা গেল সে অঞ্চলের এক চক্ষু রোগও সারে। ম্যালাকাইটের অন্তর্গত তামা যে জীবাণুনাশক তা অবশ্য তারা জানত না, যা ছিল প্রসাধনের বস্তু মাত্র তা হয়ে দাঁড়াল দৈব শক্তির আধার।

এই সব আশ্চর্য বস্তুর ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা আরও বাড়াবার উদ্দেশ্যে তাদের নানা রকম মূর্তি দিয়েছে সে কালের মানুষ, এর থেকেই বিবিধ কবচ তাবিজের সৃষ্টি। মণি কেটে ষাঁড়ের প্রতিকৃতি বানিয়ে তা ধারণ করলে ঐ জন্তুটির শক্তি

সঞ্চারিত হবে দেহে। জহর কাটার কঠিন শিল্পটি গড়ে উঠল। মূর্তি বা সংকেত কখনও বা খোদাই করে আঁকা হত মণির গায়ে—সৌভাগ্যের প্রতীক স্বরূপ বিখ্যাত স্বস্তিকা চিহ্ন তখনই এ ভাবে ব্যবহার হয়েছে। পরে সম্পত্তির স্বত্ব বোঝাতে বা তার নিরাপত্তার জন্য এগুলি বা পাথরে কাটা সংকেত দিয়ে সীলমোহরের কাজও হত জিনিসের গায়ে কাদা লেপে এর ছাপ দিয়ে দিলে তখন দৈব শক্তি তার রক্ষক, তা অন্যের অধিকারের বাইরে—যাকে বলে 'ট্যাবু'। দৈব শক্তির উপর নির্ভরতা এ যুগে কমে গিয়ে থাকলেও সীলের এই ব্যবহার এখনও অপরিবর্তিত। আমরা পরে দেখব সীল থেকে প্রথম লিপির উদ্ভবও হয়ে থাকতে পারে।

কথায় কথায় আমরা কয়েক হাজার বছর এগিয়ে ঐতিহাসিক যুগে চলে এসেছি, প্রশ্ন ছিল কি করে মানুষ সম্পূর্ণ ভিন্নরূপী আকরিকে যুক্ত ধাতুর খোঁজ পেল, যার ফলে তার নিষ্কাশন সম্ভব হয়েছে। অনেক মণি রত্ন ধাতুর যৌগিক পদার্থ, কিন্তু ধাতুবাহী পাথর বা স্ফটিক আর শুদ্ধ ধাতুটির রূপ গুণ এতই পৃথক যে মনে হয় এই আশ্চর্য আবিষ্কারটিও সম্পূর্ণ আকস্মিক। এ সম্বন্ধে শুধু অনুমানই সম্ভব, এক জল্পনা অনুসারে সে কালের লোকে নানা মণি রত্নের সঙ্গে তাম্রবাহী ম্যালাকাইট ও ফিরোজাও সংগ্রহ করেছে। কোনও দিন হয়তো তার একটা পড়ল চুলার মধ্যে, আগুন আর জ্বালানি কাঠের সংস্পর্শে আত্মপ্রকাশ করল লালাভ তামা। আফ্রিকার কাটাংগা অঞ্চলে আগুনের ছাইয়ে মুক্ত তামার দানা আবিষ্কৃত হয়েছে, একদা কোনও নিগ্রো সম্প্রদায় রান্না করতে জ্বেলে থাকবে সে আগুন। অথবা কেউ চুলা বানিয়েছে ভিতরে তাম্রবাহী পাথর গেঁথে, পরে ছাইয়ের মধ্যে দেখেছে তামার দানা, এই আশ্চর্য রহস্য নিয়ে ভাবতে ভাবতে মনে পড়েছে চুলার পাথর যেখান থেকে এনেছে সেখানে মুক্ত তামাও পাওয়া গিয়েছে আগে, তখন সন্দেহ করেছে দুইয়ের মধ্যে সম্পর্ক। কিন্তু এই ধরনের জল্পনার অসুবিধা হল যে রান্নার আগুনের তাপ যথেষ্ট নয়, তামার নিষ্কাশনে ন্যূনতম তাপমাত্রা দরকার ৮০০ ডিগ্রি সেনটিগ্রেড, ১১০০ ডিগ্রির কাছাকাছি তামা ভাল করে গলে। ঘটনা স্থলে যদি জোর হাওয়া বয়ে থাকে তো তাপমাত্রা হয়তো ৮০০ ডিগ্রির উপরে উঠেছে, কিন্তু নিষ্কাশনের আর এক প্রয়োজন প্রায় অক্সিজেনহীন পরিমণ্ডল, তা হলে কাঠকয়লা পুড়ে কারবন মনক্সাইড হবে এবং তার সঙ্গে আকরিকের অক্সিজেন জুড়ে ধাতুকে মুক্তি

দেবে (চুলায় অক্সিজেন থাকলে কারবন মনকসাইড না হয়ে আগেই কারবন ডাই-অকসাইড তৈরি হবে)।

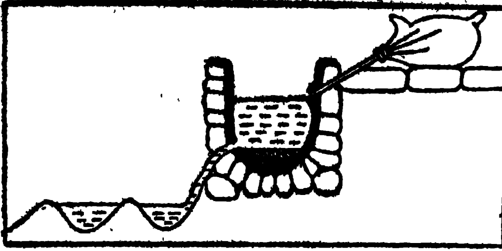
সুতরাং অনেকের মতে আবিষ্কারটি ঘটেছে পাচকের উনুনে নয়, কুম্ভকারের চুল্লীতে, তার তাপ বেশী, সেখানেও দৈবাৎ ম্যালাকাইটের মত পাথর পড়ে থাকতে পারে ; অথবা মৃৎশিল্পী হয়তো তার পাত্রে নীল রং আনতে তামার অকসাইড গুঁড়ো করে তা দিয়ে জলুস বানিয়েছে, পরে চুলায় মুক্ত ধাতুর চিহ্ন পেয়েছে, বিস্মিত উত্তেজিত মানুষের মনে তখন বিজ্ঞানী সাড়া দিল, ঘটি বাটি বাদ দিয়ে আবার অকসাইড নিয়ে পরীক্ষা করে সে সফল হল। চিত্রিত মৃৎপাত্র পোড়াতে ঢাকা চুলা দরকার, তাতে তাপ ওঠে বেশী এবং বাতাস চলাচল এড়ানো যায়, যে সব সম্প্রদায় ঘটে নকশা আঁকত তাদের ঘরেই নাকি তামা নিষ্কাশনের প্রথম চিহ্ন মিলেছে। আকরিক থেকে তামার আবির্ভাব যে ভাবেই ঘটে থাকুক, অনুমান করা যায় যে দৃশ্যটি সে কালের মানুষকে স্তম্ভিত চমৎকৃত করেছে বারে বারে ; কালো ছাই, জ্বালানি আর কঠিন সবুজ মণি অথবা নীল প্রস্তর চূর্ণ থেকে রক্তবর্ণ তরল তামা আত্মপ্রকাশ করেছে, এই 'অনৈসর্গিক' ঘটনাটি চোখ ঝলসে দিয়েছে তার। পাথরের এই রূপান্তর দেখে তার বিস্ময় আর শেষ হয় নি। এই আবিষ্কার অবশ্য কিছুটা বিভিন্ন ভাবে একাধিক স্থানে ঘটে থাকতে পারে।

বর্ণচোরা আকরিকে তামার সন্ধান পাওয়া প্রকৃত ধাতু বিজ্ঞানের দিকে প্রথম পদক্ষেপ। মুক্ত ধাতু একদা ফুরিয়ে যায়, সুতরাং শেষ পর্যন্ত আকরিকের উপরই নির্ভর, এদের মধ্যে রুপা, সীসার অমার্জিত নিষ্কাশন হয়েছে ৪০০০ বিসিতেই, টিনের ৩০০০ বিসি নাগাদ এবং লোহার আকরিক বিগলনের উপযুক্ত চুলা তৈরি হয়েছে তার ৩০০ বছর পরে। আপাতত আমরা তাম্র নিষ্কাশনের অগ্রগতি অনুসরণ করি। নতুন নতুন আকরিকের আবিষ্কার, উন্নত চুলা ও কর্ম দক্ষতার ফলে ৪০০০ বিসি নাগাদ তামা অনেক প্রচুরতর হল। কিউপ্রাইট, অ্যাজিউরাইট ইত্যাদি শিলার রং সবুজ নয়, তাদের মধ্যে যে তামা আছে তা নতুন করে শিখতে হয়েছে। তা ছাড়া সব রকম আকরিকের এক ব্যবস্থা নয়, অকসাইড জাতীয় পাথরকে বাতাসের আড়ালে কাঠকয়লার সঙ্গে পোড়ালেই তামা বেরিয়ে আসে, কিন্তু সালফাইড থেকে ধাতু মুক্ত করতে তাকে আগে বাতাসে তাতিয়ে গন্ধক তাড়িয়ে নিতে হয়েছে। কামাররা ক্রমে কুমোরের চুলার চেয়ে উন্নত ঢাকা চুলা বানাল, তাতে তাপ চড়ে

আরও উপরে, অকসিজেন আরও কম, ৩২০০ বিসির মধ্যে এই রকম ঢাকা চুলায় তামার বিগলন ও নিষ্কাশন হয়েছে। সুতরাং ধাতু উদ্ধারের রাসায়নিক নীতিগুলি আমাদের কাছে একেবারে এ কালে স্পষ্ট হয়ে থাকলেও তার রীতি জানা হয়ে গিয়েছে বহু কাল আগে। এ যাবৎ তামা নিষ্কাশনের আদিতম নজির পাওয়া গিয়েছে ইরানের তাল-ই-ইব্লিস ঘাঁটিতে, ৪০০০ বিসির অল্প আগে সেখানে প্রথম গ্রামটির পত্তন হয়েছিল।

বিগলন ও নিষ্কাশনের মত মধ্যপ্রাচ্যের প্রাচীন ধাতুকর্মীরা ঢালাইও শিখেছে। আবিষ্কারটি হঠাৎ নানা ভাবে ঘটে থাকতে পারে, যেমন কেউ হয়ত ঢাকা চুলা থেকে গলিত ধাতু অন্যত্র নিতে নিতে পাথর-গাঁথা মেঝেতে ফেলেছে, ঠাণ্ডা হয়ে তামা ঐ পাথরের আকৃতি নিয়েছে। আবিষ্কারের পর প্রথম ছাঁচগুলি তৈরি হল পাথর দিয়েই, আগে এক খণ্ডের খোলা ছাঁচ, তার পর অবিলম্বে ঢাকা ছাঁচ, তা কখনও পাথর কেটে কিন্তু প্রায়ই মাটি দিয়ে গড়া দুই অংশে—যেমন কুড়ালের মাথা তৈরি হয়েছে দুই অর্ধ বেঁধে তার মধ্যে তরল ধাতু ঢেলে। কুড়াল ছাড়া বর্শা ও তীরের ফলা, ছোরা ছুরি, বাইস, বাটালি পর্যাপ্ত পরিমাণে এ ভাবে বানিয়েছে তামার কামার। ছাঁচ থেকে বার করে আবার গরম করে বস্তুটির শক্তি আরও বাড়ানো যায়। তার পর বাকি থাকে জায়গায় জায়গায় কিছু ঘষে মেজে নেওয়া ও অস্ত্র যন্ত্র পাথরের গায়ে ঘষে ধার আনা। ঢালাইর সঙ্গে সঙ্গে দরকার হয়েছে অন্যান্য উদ্ভাবন; যথা প্রায় ১১০০ ডিগ্রি উষ্ণ বিশেষ চুলা এবং তাতে ফুঁ দিয়ে তাত বাড়াবার জন্য নল; এই নল বানাতে উপযুক্ত তাপসহ মাটির খোঁজ দিয়ে কুমোর সাহায্য করেছে কামারকে, তা ছাড়া দেখা দিল তরল ধাতু ঢালবার পাত্র, তা ধরবার সাঁড়াশি ইত্যাদি। বায়ু নল পরে পরিণত হয়েছে ছাগচর্মের তৈরি হাঁপরে, এই উন্নত উদ্ভাবনের সাহায্যে চুলার তাপ বাড়ানো সম্ভব হয়েছে এমন মাত্রায় যাতে লোহার পর্যন্ত নিষ্কাশন সম্ভব, অন্যান্য অধিকাংশ ধাতু তার আগেই গলে। মিশরী প্রাচীর চিত্রে দেখা যায় ধাতুকর্মীরা হাঁপরের বাঁধা দড়ি টেনে তাতে বাতাস ভরছে আর থলির উপর দাঁড়িয়ে সেই বাতাস চুলায় পাঠাচ্ছে।

আধুনিক কারখানায় যেমন সুনিয়ন্ত্রিত ধাপে ধাপে এক দিক থেকে আর এক দিকে জিনিস গড়ে ওঠে, ঢালাই শিখে কর্মকাররা অনেকটা যেন সেই পদ্ধতিতে তামার উপকরণ বানাতে লাগল। প্রকৃত ধাতু যুগের আগে দুই সহস্রাধিক বছর



চিত্র ১৮। এই ধরনের উন্নত চুলায় মিশরীরা নেগেভ মরুর টিম্‌না অঞ্চলে তামা নিষ্কাশন করেছে ; পাথরের গায়ে মাটি মাখানো, হাঁপর থেকে বাতাস ঢুকছে মিশ্রিত আকরিক ও কাঠ কয়লায়, ১১০০ ডিগ্রির কাছাকাছি তরল তামা তলায় জমছে ও ধাতুমল বেরিয়ে যাচ্ছে।

ধরে তামা ছিল সোনা রুপার মতই কৌতূহলের বস্তু, প্রধানত অলংকারের উপাদান এক নতুন জাতের পাথর, নিষ্কাশন ও ঢালাই আবিষ্কারের পর 4000 বিসি নাগাদ ঐ বিদ্যা হল অস্ত্র যন্ত্র সরঞ্জামের বৃহত্তর ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রবেশিকা। দেখা দিল বিবিধ ঘরোয়া উপকরণ ও গাছ কাটা, আকরিকের সংগ্রহ ইত্যাদি সাম্প্রদায়িক কাজের অমূল্য যন্ত্রপাতি। এগুলির যথেষ্ট চাহিদা সত্ত্বেও তামা যে পাথরের স্থান অনেক দিন পর্যন্ত সম্পূর্ণ দখল করতে পারে নি তার এক কারণ তারা সহজে বেঁকে যেত এবং ধার হারাত ; দ্বিতীয়ত দুর্মূল্যতার কারণে কেবল ধনীদের ঘরেই তারা স্থান পেয়েছে. ধনীরা তামার থালা বাটিতে খেয়েছে, তামার পাত্র থেকে পান করেছে।

তবু নানা গুণে তামা যে অনেক পরেও সমাদৃত ছিল, এমন কি রুপাকেও হার মানিয়েছে. ২000 বিসির এক সুমেরী দলিলে তার কৌতুকজনক নজির আছে। এক নাটকী বিতর্ক বা কবির লড়াইতে তাম্র ফিরিস্তি দিচ্ছে রৌপ্যের অক্ষমতার—শস্য খেতে সেচের সময় এলে সে মানুষকে দিতে পারে না মাটি ঢিলে করবার এবং বসন্তে হাল গড়বার যন্ত্রপাতি, শীত কালে জ্বালানি কাঠ কাটবার কুড়াল, শস্য পাকলে তা কেটে ঘরে আনবার কাস্তে। তার পর ধিক্‌কার : "হে রজত, প্রাসাদ না থাকলে তুমি কোথাও আশ্রয় পেতে না এক চিরমুক্তির

স্নান কবর ছাড়া। তুমি যেন ঠাকুর দেবতা, কোনও দরকারী কাজে হাত লাগাও না।...যাও আঁধার মন্দিরে বা কবরে গিয়ে শুয়ে পড় যাও।"

কিন্তু বিশুদ্ধ তামাও হার মানল সংকর ধাতু কাঁসার কাছে, তার আবির্ভাবে ধাতু ব্যবহারের প্রশস্ততর ভবিষ্যতের দরজা খুলে গেল। কাংস্য যুগের প্রাচীন সূত্র অনুসরণে আমাদের যেতে হবে ইজরেলে, সেখানে মরা সাগর প্রান্তবর্তী পর্বতের এক গুহায় ১৯৬১ সালে হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রত্নবিজ্ঞানী দল কাঁসার এ যাবৎ আদিতম নজির উদঘাটন করেন। জায়গাটি এতই দুরধিগম যে উপর থেকে দড়ির মই ঝুলিয়ে তাঁদের গুহায় পৌঁছাতে হয়েছিল, যদিও ৫000 বছর আগে একটা সংকীর্ণ পায়ে চলার পথ ছিল হয়তো। গুহাটি এত দুর্গম বলেই বিভিন্ন কালে সেখানে পলাতক গোষ্ঠী আশ্রয় নিয়েছে মনে হয়, মেঝেতে আবিষ্কার হয়েছে গ্রীসীয় ও হিব্রু লিপিবাহী প্যাপাইরাস, আর খোলামকুচি, পাথরের প্রদীপ, কাপড়, চর্ম বস্তু ইত্যাদি; তাদের প্রাচীনতা অনুসারে ধারণা হয় যে ৭০ খ্রীষ্টাব্দে রোমীয় সাম্রাজ্য যখন ইহুদীদের দ্বিতীয় মন্দির ধ্বংস করে তখন যারা জেরুসালেম থেকে পালিয়ে এসেছিল এ সব তাদের সম্পত্তি।

গভীরতর স্তরে প্রায় ৩000 বিসি প্রাচীন বসবাসের চিহ্ন ছিল। এক পাথর পাটার নিচে অনুসন্ধানীরা আবিষ্কার করেন খড়ের মাদুরে জড়ানো চার শতাধিক বস্তু, তাদের উপাদান কাঁসার অনুরূপ তামা ও আর্সেনিকের এক সংকর ধাতু। অনেকগুলি কর্তৃত্বসূচক দণ্ডের অলংকৃত মুণ্ড, মিছিলে বাহিত দণ্ডের মত বস্তু, মুকুট ইত্যাদি দেখে সেগুলির ধর্মীয় বা আনুষ্ঠানিক ব্যবহার সন্দেহ করা হয়, হয়তো মন্দিরের সম্পত্তি ছিল তারা। আর ছিল নানা আকার আয়তনের কুড়াল, বাটালি ইত্যাদি। গহ্বরটির নাম হয়েছে রত্ন গুহা, রত্ন সম্পদের মালিকরা কোনও বিপদের সময়ে তা এখানে এনে লুকিয়ে রেখে থাকতে পারে, কিন্তু তারা কারা বা উদ্ধার করতে ফিরে এল না কেন তা কেউ জানে না।

আজ অধিকাংশ কাংস্য তৈরি হয় তামা ও টিনের সংযোগে, টিনের অনুপাত প্রয়োজন মত কম বেশী—মৃদু কাঁসায় মাত্র তিন শতাংশ থেকে তথাকথিত বেল-মেটালে ২৫ শতাংশ পর্যন্ত। প্রাথমিক কাঁসায় যে টিনের বদলে ছিল

আর্সেনিক এই সত্যে ধাতুর সংকরীকরণ কি করে শুরু হল তার ইঙ্গিত থাকতে পারে। এই প্রসঙ্গে দুটি বিষয় মনে রাখা দরকার, বিশুদ্ধ তামার ঢালাই খুব ভাল হয় না, ভিতরে বুদবুদ থেকে যায় তাতে বস্তুটির শক্তি কমে। দ্বিতীয়ত, সব তামার আকরিকেই অল্প বিস্তর অন্যান্য পদার্থ আছে, যেমন লোহা, আর্সেনিক, সীসা, নিকেল ইত্যাদি। নিষ্কাশিত ধাতুতে কে কতটা আছে তার উপর ধাতুর দোষ গুণ অনেকটা নির্ভর করে—একটা সামান্য পরিমাণ থাকলে তামা ভঙ্গুর হয়, সীসার আধিক্য তাকে নরম করে। আকরিকে আর্সেনিক থাকলে তামা বেশী গ্যাস শোষে না, ফলে ভিতরে ছিদ্রও থাকে কম।

৩৫00 বিসি নাগাদ কোনও সূক্ষ্মদর্শী কর্মকার এই সব দোষ গুণ লক্ষ্য করে কারণ না বুঝেও যে সব আকরিক থেকে নিষ্কাশিত তামার ঢালাই ভাল হয় সেগুলিই বেছে নিতে আরম্ভ করেছে। উপরোক্ত গুণের জন্য সর্বাগ্রে স্থান পেয়েছে আর্সেনিক-যুক্ত আকরিক, তা ছাড়া তা মধ্যপ্রাচ্যের সর্বত্র সহজলভ্য ছিল। সুতরাং প্রথম কাঁসা দুই ধাতুর ইচ্ছাকৃত কৃত্রিম মিশ্রণ নয়, স্বাভাবিক সংযোগ। কিন্তু এই কাঁসারও দোষ ছিল—আর্সেনিক তো বিষ, নিষ্কাশনী চুল্লীর নির্গত ধোঁয়া নিশ্চয় অনেক কামারের মরণ ঘটিয়েছে। এর ফলে তৈরী কাঁসাটির প্রতিও লোকের মনে সন্দেহ ও সংস্কার দেখা দিয়ে থাকতে পারে। আরও এক কারণ ছিল হয়তো যে বিভিন্ন আকরিকে আর্সেনিকের পরিমাণে অনেক প্রভেদ, কিন্তু বাইরের থেকে তা বুঝবার উপায় ছিল না, সুতরাং কাঁসার গুণাগুণও অনিশ্চিত। কিন্তু আর্সেনিক-কাঁসার গুণ টের পেয়ে ধাতুকর্মীরা তামার সঙ্গে অন্যান্য পদার্থ যোগ করে পরীক্ষা করতে চেয়েছে। তার মধ্যে টিন অতি উৎকৃষ্ট প্রমাণিত হল। যদিও প্রকৃতির খেয়ালে মধ্যপ্রাচ্যে টিনের অভাব।

আর্সেনিকের বদলে টিন থাকলে তামা বেশী কঠিন ও কম ভঙ্গুর হয়। ধাতু-বিজ্ঞানীর মাপে ১০ শতাংশ টিন যুক্ত কাঁসা ঢালাইর পর তার কাঠিন্যের মাত্রা ৯০, তা পিটিয়ে ২২৮ পর্যন্ত বাড়ানো যায়। এর সঙ্গে তুলনীয় বিশুদ্ধ তামার কাঠিন্য যথাক্রমে ৫০ ও ১২৮। বস্তুত, টিন-কাঁসার শক্তি মৃদু ইস্পাতের কাছাকাছি এবং তার আবির্ভাবে কামাররা বিভিন্ন বস্তু গড়তে তামা বা পাথরের চেয়ে অনেক বেশী টেকসই উপাদান পেল। উপরন্তু, বেঁকে বা দুমড়ে গেলে কাঁসার সংস্কার সম্ভব হয়েছে, কুড়াল বা ছুরিতে সহজে ধার দেওয়া গিয়েছে। কাঁসার বাইস বাটালি

হাতুড়ি ছিদ্রকর শলা ইত্যাদি ছুতোরের কাজে বিপ্লব ঘটাল, ধনীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা লেগে গেল ঘরে কাঁসার পাত্র জমাতে, প্রহরীদের হাতে কাঁসার অস্ত্র দিতে—এমন কি পরলোকেও তা সঙ্গে নিয়ে যেতে।

প্রায় ৩০০০ বিসি থেকে মধ্যপ্রাচ্যের সর্বত্র শাসকদের সমাধিতে সোনা রুপা ও কাঁসার বস্তুর আড়ম্বর দেখা যায়, তার মধ্যে সমৃদ্ধতম সংগ্রহ উদঘাটিত হয়েছে ইউ-ফ্রেটিস নদীর দক্ষিণাঞ্চলে আর (Ur) রাজ্যের রাজকীয় সমাধি ক্ষেত্রে। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রকে সেখানে সাড়ম্বর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া অনুষ্ঠান সহ সুমেরী রাজবংশীয়দের মরদেহ কবরে রাখা হয়েছে। কোনও এক রাজার প্রয়াণ হলে তার অধিকাংশ সেবক সেবিকাদেরও ডাক পড়ত। উর্দিপরা সৈনিকরা, শ্রেষ্ঠ পোশাকী সাজে সজ্জিতা সভানারীরা, প্রসাদের দাস দাসী, বলদে-টানা গাড়ির চালকরা, বাদ্যযন্ত্র সহ সংগীত-কাররা রাজ্যাধিপতির শব দেহের সঙ্গে সমাধিতে প্রবেশ করত, তার পর সংকেত পেলে বিষ পান করত। এমন এক সমাধিতে ষাটটি নর নারীর কঙ্কাল উপস্থিত ছিল। আরের রাজকীয় সমাধিতে যে সব কাংস্য বস্তু পাওয়া গিয়েছে তাদের মধ্যে কাঁসারীদের কর্ম কৌশল ছাড়াও লক্ষণীয় যে তারা খাঁটি কাঁসা, অর্থাৎ মানুষের হাতে তৈরি তামা ও টিনের মিশ্র ধাতু, তাতে তামার পরিমাণ ১০ থেকে ১৫ শতাংশ।

প্রশ্ন উঠেছে মধ্যপ্রাচ্যে টিন নেই তো এই ধাতু এল কোথা থেকে। পরে সেই অঞ্চলে ধাতুটি এসেছে য়োরোপের হাংগেরি ও বোহিমিয়া অঞ্চল থেকে কিন্তু খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রকে সুমের থেকে অত দূর পর্যন্ত বাণিজ্য পথের কোনও নজির নেই, যদিও কারও কারও বিশ্বাস ২৫০০ বিসিতেই এই বাণিজ্য গড়ে উঠেছিল। কোনও কোনও প্রত্নবিৎ মনে করেন যে মেসোপটেমীয় প্রান্তরের পুব প্রান্তে জাগ্রস গিরিমালায় তখন মুক্ত টিনের আকর ছিল, তা এখন ফুরিয়ে গিয়েছে। সবচেয়ে সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হল যে বর্তমান আর্মিনিয়ার ককেশাস অঞ্চল থেকে টিন এসেছে। ককেশীয় পার্বত্য ভূমিতে তামার খবর সুমেরীরা জানত এই ভূমি টিনেও সমৃদ্ধ ছিল। দুই অঞ্চলের মধ্যে বাণিজ্যের চিহ্নও দেখা যায় আরের সমাধিতে প্রাপ্ত ককেশাসে তৈরি বিশেষ আকারের পিন থেকে যা ব্যবহার হত পোশাক আটকাতে, সুতরাং অন্যান্য পণ্যের সঙ্গে সেখান থেকে টিন দক্ষিণে চালান হয়ে থাকতে পারে। আকরিক উদ্ধার ও ধাতু নিষ্কাশনে ককেশীয়দের প্রচুর অভিজ্ঞতা ছিল, পণ্ডিতদের মধ্যে এমন কথাও শোনা যায় যে এই গিরিবাসীরাই টিনযুক্ত কাঁসার আবিষ্কর্তা;

এই ধারণার কারণ যে তামা ও টিনের সাধারণ দুটি আকরিক ম্যালাকাইট ও ক্যাসি-টেরাইট প্রায়ই ককেশীয় উচ্চভূমিতে একত্র উপস্থিত, সুতরাং সেই অঞ্চলের কোনও কামারের চুলায় দৈবাৎ দুটির যৌথ বিগলন হয়ে থাকতে পারে।

'আর' রাজ্য ছাড়াও অন্যান্য সুমেরী শহর-রাজ্য এবং মধ্যপ্রাচ্যের অন্যত্র ইতি-হাসের উষায় রাজা রাজড়ারা কাঁসার কদর বুঝেছিলেন এবং তার ফলে টিনের চাহিদা বেড়ে চলেছিল। কোনও জিনিস বানাতে কতটা টিন যোগ করলে শ্রেষ্ঠ ফল পাওয়া যাবে ২000 বিসির মধ্যে সুমেরী কাঁসারীরা তার নিয়মন আয়ত্ত করেছে। অন্যত্র কাংস্য শিল্পের দৃষ্টান্ত রূপে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হোমার কাব্যের বিখ্যাত ট্রয় শহর, গত শতাব্দে জার্মেনির হাইনরিশ্‌ শ্লিমান পশ্চিম আনাতোলিয়ায় এই শহরের দ্বিতীয় স্তরে (২৪00 বিসি) বিশাল রত্ন সম্ভার উনমোচন করেন, সোনা রুপা তামার বস্তু ছাড়া তার মধ্যে ছিল মূল্যবান মণি হাতির দাঁত ইত্যাদির কাজ করা বহু কাঁসার পাত্র ও অস্ত্র। মধ্যপ্রাচ্যে এত টিনযুক্ত কাঁসার সমাবেশ বাড়ন্ত বাণিজ্যের নির্দেশ দেয়। ২000 বিসির মধ্যে জল ও স্থল পথে এই অঞ্চলের বাণিজ্য য়োরোপের উত্তর দক্ষিণে এবং পুবে স্পেইন পর্যন্ত জাল বিস্তার করেছে, তার মধ্যে গুরুতর অংশ ছিল টিনের। এই যোগাযোগ এবং য়োরোপীয়দের দক্ষতার ফলে সেই মহাদেশে কাংস্য যুগ স্বকীয় উৎকর্ষ অর্জন করেছিল, তাদের বিভিন্ন কেন্দ্রে কাঁসা শিল্পের নানা সৃষ্টি আজ বিস্ময়ের বস্তু।

ছাঁচ তৈরি ও ঢালাইর এক কঠিন ও মার্জিত পদ্ধতি আগের তুলনায় অনেক সূক্ষ্ম ও মনোরম বস্তুর সৃষ্টি সম্ভব করে কামারের কাজকে তুলল চারুশিল্পের পর্যায়ে, আজও এই লুপ্ত মোম' পদ্ধতি ব্যবহার হয়। সে কালের কর্মী প্রথমে মোম দিয়ে এক নমুনা বা প্রতিকৃতি বানিয়ে তার উপর আঠালো মাটি মেখে পুড়িয়েছে, তখন খোলটি কঠিন হয়ে গেল, গলিত মোম ছোট ছোট ছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে গেলে সে গলিত ধাতু ঢালল ভিতরে, ধাতু ঠাণ্ডা হয়ে জমে যাওয়ার পর মাটির খোলটি ভেঙে প্রায় অবিকল বস্তুটি পেয়েছে সে, বাকি রইল সামান্য ঘষা মাজা। কৌশলটি প্রায় যান্ত্রিক হলেও তাতে শিল্পীর হস্ত নৈপুণ্য ও কারুকাজের অবকাশও আছে। এই উপায়ে কাজের জিনিস ছাড়াও তৈরি হয়েছে সোনা রুপা তামা কাঁসার অলংকার, ঘর সজ্জার টুকিটাকি, ছোট বড় মূর্তি ও প্রতিমূর্তি – তাদের সৌকর্য ও মার্জনা আজও বিশ্বের বিস্ময়। লুপ্ত মোম পদ্ধতি কার আবিষ্কার—না কি অনেকের প্রতিভায় খেলা

ছিল তাতে তা গুপ্ত থাকবে অতীতের তিমিরে, তবে এই ধরনের কৌশল ও চাতুরির প্রয়োগ দেখে লোকে নিশ্চয় কর্মকারদের আশ্চর্য রহস্যজ্ঞানী বলে গণ্য করেছে।

মিশরী ধাতুকর্মীদের দক্ষতা আদি কাল থেকেই বিখ্যাত, সমাধির দেয়ালে অঙ্কিত বা উৎকীর্ণ ছবিতে দেখা যায় সূক্ষ্ম স্বর্ণালংকার থেকে প্রকাণ্ড কাংস্য কপাট পর্যন্ত তৈরির দৃশ্য। কঠিন, কঠোর এই কাজের লিখিত বর্ণনায় দেখা যায় "কর্মীদের গায়ে আঁশটে গন্ধ", "তাপের চোটে হাত ফেটে চৌচির, দেখে মনে হয় কুমিরের চামড়া" ইত্যাদি মন্তব্য, কিন্তু সমাজে সম্মানিত স্থান ছিল তাদের। অন্যত্রও প্রাথমিক ধাতুকর্মীরা যে অনুরূপ সমাদর পেয়েছে তা অনুমান করা যায়। প্রায়ই পরিবারের সকলে কাজে অংশ নিয়েছে, বিদ্যা হস্তান্তরিত হয়েছে বাপ থেকে ছেলেতে। আবার কামাররা কখনও যন্ত্রপাতি নিয়ে একলা ঘুরে বেড়িয়েছে কাজের সন্ধানে, লাভের আশা দেখলে সেখানে বসে বানিয়েছে ছুরি বাটালি কুড়ালের ফলা, আকরিকের সন্ধান পেলে ছোট এক চুলা বানিয়ে নিষ্কাশন শুরু করেছে—তার বর্জিত আবর্জনা প্রাচীন জগতের নানা স্থানে এই ভ্রাম্যমান জীবনের সাক্ষী রূপে বর্তমান। আবার কখনও হয়তো আকরিক থেকে তামা বা কাঁসার পিণ্ড বানিয়ে কামার তার তল্পিতে ভরে চলেছে খরিদ্দারের খোঁজে, তাদের দেখা পেলে তা গলিয়ে ছাঁচে ঢেলে গড়ে দিয়েছে অভিপ্রেত বস্তু। কাজ অনুসারে কোথাও এক দিন, কোথাও কয়েক বছর কাটিয়েছে তারা। য়োরোপের পল্লী অঞ্চলে বেদেরা এবং মধ্যপ্রাচ্যের অজ পাড়াগাঁয়ের চলমান ধাতুকর্মীরা এখনও এই যাযাবর জীবিকা রীতি বাঁচিয়ে রেখেছে। সে কালে এদের থেকে যে দিকে দিকে ধাতুর জ্ঞান ছড়িয়েছে তাতে সন্দেহ নেই, পথের ধারে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে নানা পরীক্ষার থেকে নতুন উদ্ভাবন করে ধাতু শিল্পকে এগিয়ে নিয়েছে বিশ্বকর্মার এই আদি শিষ্যরা।

কাঁসা দিয়ে বিবিধ উৎকৃষ্ট উপকরণ গড়া হল, যেমন আকরিক উদ্ধারের শাবল, গাছ কাটার কুড়াল, চাষের জন্য লাঙলের ফলা, কাস্তে। কাঠ থেকে গাড়ির চাকা বানাতে কাঁসার বাটালি ও অন্যান্য যন্ত্র কাজে লেগেছে, চাকাকে ঘিরে থাকে যে ধাতব পাতটি এবং যে নেহাইর উপর তা পিটিয়ে তৈরি তাও কাঁসার। কিন্তু এই সব নির্দোষ বস্তুর চেয়ে বড় সৃষ্টি ছিল নানা রকম

মারণাস্ত্র। তখন শুধু যে সাধারণ লোকে ব্যক্তিগত হানাহানির সম্বল পেল তাই না, স্থানে স্থানে বড় বড় আঞ্চলিক লড়াই দেখা দিল। আজ দরজি যেমন গায়ের মাপে জামা বানিয়ে দেয় তেমনি সে দিনের কামার কাঁসার পাত পিটিয়ে বর্ম বানিয়েছে. যোদ্ধাদের জন্য তৈরি করেছে ঢাল, শিরস্ত্রাণ, ঘোড়ার সাজের প্রয়োজনীয় অংশ, তাদের হাতে দিয়েছে বর্শা. তীর, ছোরা, প্রকাণ্ড তলোয়ার। কুড়াল শুধু গাছ কাটে নি, হাতাহাতি সংঘর্ষের প্রচণ্ড হাতিয়ারও ছিল তা। য়োরোপের আগেই অবশ্য কাংস্য যুগের আদি ক্ষেত্র মধ্যপ্রাচ্য এ বিষয়ে পথ দেখিয়েছে, পরে আমরা তার পরিচয় পাব রাজতন্ত্রের অভ্যুদয় প্রসঙ্গে। ধাতুর আবিষ্কার যেমন মানুষের প্রভূত উপকারের সূচনা করেছে, তেমনি ইতিহাসের প্রভাতেই যুদ্ধের প্রথম কালো মেঘ ডেকে এনেছে। নানা ক্ষেত্রে ধাতুর প্রসারের মত মহাসমরও আজ বিরাট আকার ধারণ করেছে।

কাঁসার বর্ধিষ্ণু চাহিদা মেটাতে নিয়মিত আকরিকের সন্ধান চলেছে. ভূপৃষ্ঠের বস্তু ফুরিয়ে গেলে ভূগর্ভে, সেখানে নতুন নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে। মাটির নিচের খনিজ অপেক্ষাকৃত জটিল, তাতে গন্ধক আছে তা দূর করতে বিগলনের আগে আকরিকটি ঝলসে নিতে হয়। খনির কূপ ও সুড়ঙ্গ বানাতে সতর্কতা ও যত্নের প্রয়োজন. ঠিক মত ঠেকা না দিলে ছাত বা দেয়াল ভেঙে পড়তে পারে. তা ছাড়া ভিতরে জল জমার ভয়ও আছে। দেয়াল থেকে খনির বস্তু বার করতে অনেক সময়ে পাশে আগুন জেলে পরে ঠাণ্ডা জল ঢেলে তা ফাটানো হয়েছে. কারণ ফাটা দেয়াল থেকে শাবল ও হাতুড়ির সাহায্যে আকরিক খসানো অনেক সহজ।

ধাতুসন্ধানীরা অবশ্য মাটির উপর এই কৌশল আগেই প্রয়োগ করেছে এবং তারও অনেক আগে পুরাপ্রস্তর যুগের মানুষ এই উপায়ে পাহাড়ের গা থেকে ব্যবহারযোগ্য পাথর সংগ্রহ করেছে। কিন্তু ভূগর্ভে আগুন জ্বাললে তার শ্বাসরোধকারী ধোঁয়ায় কাজ করা সম্ভব হয় নি, হাঁফ ছাড়তে কর্মীরা বেরিয়ে এসেছে কিছু ক্ষণের জন্য। নিয়মিত জল ও জ্বালানি কাঠের সংস্থান রাখতে হয়েছে তাদের. জল প্রায়ই খনি কূপের তলায় আপনা হতেই জমেছে, কাঠ এসেছে বন থেকে. সুতরাং একটু বড় ধরনের খনির কাজে কাঠুরেদের অংশ কম ছিল না।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক এক বিস্ময়কর আবিষ্কার। প্রাক্তন ধারণা অনুসারে গভীর ও বিস্তৃত খনি খুঁড়ে তার থেকে অপর্যাপ্ত পরিমাণ আকরিক উদ্ধার আরম্ভ হয়েছে রোমীয় সাম্রাজ্য কালে, তার আগে বড়জোর কয়েক মিটার দীর্ঘ সুড়ঙ্গের খনন হয়েছে। কিন্তু পশ্চিম এশিয়ার নেগেভ মরুর এক উদঘাটন এই তারিখটা সহস্রাধিক বছর পিছিয়ে দিয়েছে, সুড়ঙ্গে প্রাপ্ত কিছু পাথুরে হাতুড়ি, কাঁসার বাটালি ও একটি মৃৎপাত্র থেকে জানা গিয়েছে তার প্রাচীনতা ১400 বিসি, অর্থাৎ কাংস্য যুগের সমাপ্তির কাছাকাছি। অবশ্য নেগেভের টিম্না উপত্যকায় প্রায় 4000 বিসি থেকে যে মিশরী তাম্র শিল্প গড়ে উঠেছে তা আগেই জানা ছিল, কিন্তু তার আকরিক ম্যালাকাইট সংগৃহীত হয়েছে মাটি থেকে কুড়িয়ে বা পাহাড় থেকে খসিয়ে। আলোচ্য সুড়ঙ্গগুলি অধিকাংশ ০.৬ মিটার চওড়া, ১২ মিটার উঁচু, এই শাখা প্রশাখার জটিল জাল তৈরি হয়েছে উপরে নিচে কয়েকটি স্তরে, তারা এক ছোট পাহাড়ের গর্ভে কয়েক শো মিটার পর্যন্ত প্রসারিত। নল পথে বাইরের সঙ্গে বায়ু চলাচলের যোগ, ছাত ভেঙে না পড়ে তার জন্য খুঁটি. এমন কি এক স্তর থেকে উপর স্তরে উঠতে ধাপ কাটা সিঁড়ি এবং সঙ্গে-হাতে ধরে উঠবার ব্যবস্থাও ছিল। হয়তো ১০০০ কর্মী বা দাস খেটেছে এই সব সুড়ঙ্গে। খনির দেয়াল থেকে পাথুরে হাতুড়ি ও কাঁসার বাটালি দিয়ে ম্যালাকাইট খসিয়ে পরে তা ছোট ছোট খণ্ড করে বাইরে অগভীর গহ্বরে রাখা হয়েছে, সেগুলি বৃষ্টির জলে ভরে গেলে অপেক্ষাকৃত হালকা ম্যালাকাইট উপরে উঠে অন্য শিলা বস্তু থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছে। এর ০ ৮ কিলোমিটার দূরে ছিল তেরোটি নিষ্কাশনী চুলা, বিগলনের কাজে লোহা যোগ করা হত কারণ বর্জনীয় অপবস্তু (impurity) তার সঙ্গে জুড়ে যায়, তখন তাদের সহজে সরিয়ে ফেলা সম্ভব। এই কর্মশালায় যে তামা তৈরি হয়েছে তা ৯৭-৯৮ শতাংশ বিশুদ্ধ, এর চেয়ে শুদ্ধতর তামা বানানো কেবল আধুনিক কালে সম্ভব হয়েছে। এক ইজরেলী প্রত্নবিজ্ঞানীর ধারণা মিশরের ১৯তম ও ২ তম রাজবংশের ফেআরোরা এই খনির নির্মাতা।

এশিয়ার বিপরীত প্রান্তেও চলতি ধারণার পরিপন্থী এক নতুন আবিষ্কার বিজ্ঞানীদের স্তম্ভিত করেছে। থাইল্যানডের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে একটি কৃষিজীবী গ্রামের নাম বান্ চিয়াং, ১৯৬০ দশকের প্রথম দিকে সেখানে অসাধারণ প্রাচীন মৃৎপাত্র

পাওয়া গিয়েছিল, পরবর্তী দশকে সেখানে খুঁড়ে মার্কিন ও থাই বিশেষজ্ঞরা মাত্র দু বছরে ১৮ টন তৈরী বস্তু উদঘাটন করেছেন। সুমার্জিত মৃৎপাত্র ছাড়াও তার মধ্যে ছিল কাঁসার কলসি, বর্শা ফলক, মল ও বালা — তেজস্ক্রিয় কারবন পদ্ধতি অনুসারে বর্শা ফলকটির বয়স ৩৬০০ বিসি। এত প্রাচীন কাংস্য মধ্যপ্রাচ্যে কোথাও এখনও পাওয়া যায় নি, প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাস অনুসারে সেই অঞ্চলে ৩৫০০ বিসির পরে ৫০০ বছরের মধ্যে প্রথম কাঁসা তৈরি হয়েছিল। থাইল্যানডের এই উন্নতমান বস্তুগুলির নজির থেকে অনুসন্ধানীরা দাবি করেছেন ঐ সময়ে সমকক্ষ ধাতু বিদ্যা অন্য কোথাও ছিল না এবং থাই কাংস্য ও লৌহ শিল্প মধ্যপ্রাচ্যের সমকালীন তো বটেই, তার সূচনা ভারত ও চীনের আগে। প্রাক্তন ধারণা ছিল চৈনিকরা কাঁসার কাজ আরম্ভ করেছে ২৬০০ বিসি নাগাদ এবং পরে তা থাইদের শিখিয়েছে, এখন দেখা যাচ্ছে শিক্ষার্থীরাই হয়তো শিক্ষক ছিল।

পুরা কালে বিবিধ নবলব্ধ বিদ্যা কে কার থেকে নিয়েছে, কি করে তা কেন্দ্র স্থল থেকে দিকে দিকে ছড়িয়েছে এই আগ্রহজনক প্রশ্ন প্রায়ই প্রত্নবিজ্ঞানীদের বিতর্কের বিষয়। সনাতন ধারণা অনুসারে প্রথমে প্রতিবেশী সম্প্রদায় দেখে বা শুনে শিখেছে, তার পর তাদের নিকটবর্তীরা, এই ভাবে ধীরে ধীরে বিদ্যাটি প্রসারিত হয়েছে। যোগাযোগ নানা উপলক্ষে ঘটে থাকতে পারে. যেমন খাদ্যের বা চকমকি পাথরের মত কাঁচামালের সন্ধানে বা আদান প্রদানে, সম্পত্তির লোভে হানায়, পরে নিয়মিত বাণিজ্য সূত্রে। কিন্তু একমাত্র এই পথেই নতুন বিদ্যা বা শিল্প কৌশল ছড়ায় নি, সাম্প্রতিক নজির অনুসারে অনেক ক্ষেত্রে স্বাধীন আবিষ্কারও হয়েছে, সহস্র ক্রোশ দূরের মানুষ কৃষি বা লিখন ধার করে নেয় নি। কৃষির আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা তার দৃষ্টান্ত দেখেছি দক্ষিণ আমেরিকায়। থাইল্যানড থেকে মধ্যপ্রাচ্য অনেকটা দূর, অথচ দুই অঞ্চলের কাংস্য যুগের মধ্যে সময়ের পার্থক্য খুব বেশী নয়, সুতরাং মনে হয় কাঁসা তাদের স্বাধীন আবিষ্কার। ধান ও তরি তরকারির ফলনে এই দেশ যে সর্বাগ্রগণ্য হয়ে থাকতে পারে তার কিছু সাম্প্রতিক নজির আমরা আগে লক্ষ্য করেছি। সুতরাং নবপ্রস্তর যুগের সূচনা থেকে যে বিবিধ আবিষ্কার ও ও শিল্প মানুষকে সভ্যতার দিকে এগিয়ে নিয়েছে তার সবই যে মধ্যপ্রাচ্যের দান তা নাও হতে পারে, কোনও কোনও ক্ষেত্রে হয়তো অন্যরা প্রথম পথপ্রদর্শক। এই সম্ভাবনার দরজাটি থাইল্যানডে অল্প একটু ফাঁক হয়ে উত্তেজনা ও মনোযোগের সৃষ্টি

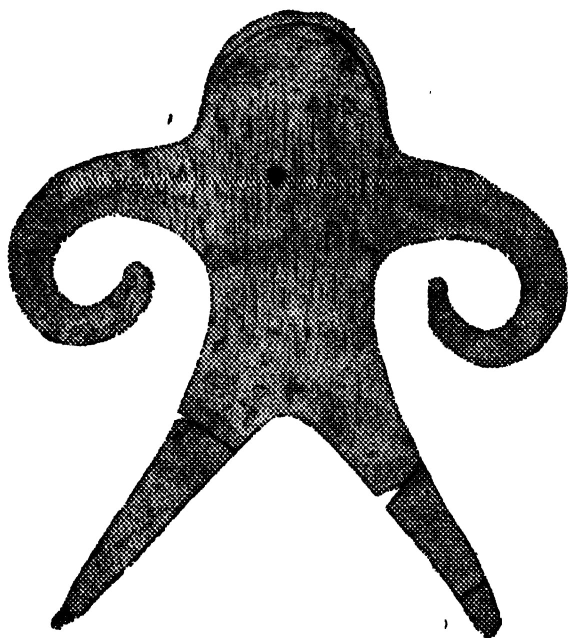
করে আশা জাগিয়েছে যে আগামী দিনে সে দেশে অন্যান্য বৈপ্লবিক উদঘাটন তাকে সভ্যতার অন্যতম পথিকৃৎ রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করবে, এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ভাবনায় বিপ্লব ঘটাবে।

পরে দেখা যাবে সভ্যতার সূচক বলে গণ্য শহর ও লিপির সৃষ্টি যে মধ্যপ্রাচ্যেই ঘটেছে তা এখনও অবিসংবাদিত। কিন্তু আমরা এও দেখেছি এই সভ্যতার আর এক অঙ্গ যুদ্ধ বিগ্রহ, কাঁসা হাতে পেয়ে পশ্চিমের শাসক সম্প্রদায় তা দিয়ে মারণাস্ত্র বানাতে মেতেছে, থাইল্যানডের এই ঘাঁটিতে তেমন কোনও নজির নেই. প্রাপ্ত বস্তুর মধ্যে অস্ত্র বিরল, ১২৬ সংখ্যক কঙ্কালের মধ্যে একটিও তীরের ফলা পাওয়া যায় নি। এর থেকে যদি শান্তিপূর্ণ সমাজের, তৈরী বস্তুর উৎকর্ষ থেকে যদি উন্নততমান জীবনের নির্দেশ পাই তবে আর একটি প্রশ্ন ওঠে—কে বেশী সভ্য?

মধ্যপ্রাচ্যের কিছু পরে এশিয়ায় আরও দুটি সভ্যতার কেন্দ্র দেখা দিয়েছিল, সেখানে অন্যান্য উৎকৃষ্ট সৃষ্টির মধ্যে ধাতুর কাজ বিশেষ উল্লেখযোগ্য, একটির অভ্যুদয় এই উপমহাদেশে সিন্ধু নদী কূলে, আর একটির সুদূর চীনে। ২৫০০ বিসি থেকে প্রায় হাজার বছরের মধ্যে সিন্ধু তীরের কারিগররা মহেনজোদারো ও হরপ্পায় তামা ও কাঁসার অলংকারে অস্ত্রে যন্ত্রে তাদের দক্ষতার অনেক প্রমাণ রেখে গিয়েছে। মহেনজোদারোয় প্রাপ্ত কাঁসার নর্তকী আজ বিশ্ববিখ্যাত, তার কেবল একটি বাহু প্রায় সম্পূর্ণ বালায় ঢাকা। শহরবাসী কর্মীরা কয়েক শো কিলোমিটার পশ্চিমে পাহাড় থেকে তামার আকরিক সংগ্রহ করেছে, টিন এনেছে উত্তরাঞ্চল থেকে। কুড়াল তীর বর্শা ও অন্যান্য উপকরণের ফলা, হাতি চালাবার অঙ্কুশ, ক্ষুর, বঁড়শি, আংটি, বালা ও অন্যান্য গহনা গড়েছে সুদক্ষ কর্মকাররা। সিন্ধু তীরের শহরগুলিতে কাঁসার পাত পিটিয়ে নানা আকারের বস্তু তৈরি ছাড়াও খোলা ও ঢাকা ছাঁচে ঢালাই এবং লুপ্ত মোম পদ্ধতি ঝালাই ও নাছি দিয়ে ধাতু জোড়া লাগানো জানা ছিল। এই সব বিদ্যা তারা নিজেরাই দ্রুত আয়ত্ত করেছে না আর কারও থেকে পেয়েছে তা জোর করে বলা যায় না। এ যাবৎ প্রত্নতাত্ত্বিক নজিরের নির্দেশ এই যে ধাতু শিল্প মধ্যপ্রাচ্য থেকে ইরান ও আফগানিস্থানের পথে এশিয়ার পুব দিকে ছড়িয়েছে বনিক বা পর্যটক কামারদের আনাগোনায় আবশ্যক যোগাযোগটি ঘটেছে। সুমেরের সঙ্গে সিন্ধু অঞ্চলের বাণিজ্যের চিহ্ন আছে।

ধাতুর জ্ঞান সিন্ধু থেকে ১৩০০ কিলোমিটার দূরে আরও দুই প্রসিদ্ধ নদী গঙ্গা

ও যমুনার উপত্যকায়ও পৌঁছে থাকতে পারে, সেখানে লোকে কাঁসার বদলে তামা দিয়ে চাষ ও মাছ ধরার উপকরণ বানিয়েছে। তাদের গঠন সৌষ্ঠব ও নৈপুণ্য এবং স্বকীয় বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করবার মত। গাছ কাটবার এক কুড়ালের মাথা ৩০ সেনটি-মিটার লম্বা এবং ওজনে দুই কিলোগ্র্যামের বেশী। উপকরণগুলি তৈরি হয়েছে পিটিয়ে এবং ঢালাই করে। ৩০০০ বছর প্রাচীন এক চ্যাপটা তাম্র মূর্তির তাৎপর্য অমীমাংসিত, তার দুটি পা ফাঁক করা. হাত দুটি গোল হয়ে নেমে এসেছে, মাথা অনেকটা ব্যাঙের মত, হাত পায়ের একটি দিক ধারালো ; এটি মানুষেরই বিকৃত রূপ হতে পারে, বিশেষজ্ঞরা মনে করেন হয়তো শিকারের ক্ষেপণাস্ত্র অথবা আনুষ্ঠানিক উপকরণ।



চিত্র ১৯। গঙ্গা যমুনার অন্তর্বেদি অঞ্চলে প্রাপ্ত নরোপম তাম্র বস্তু।

চীন দেশে নবপ্রস্তর ও ধাতু যুগের শিল্পোৎকর্ষ বিস্ময়জনক, তাদের রেশমী বস্ত্র, মনোরম মাটির ভাণ্ড, ধাতুর পাত্র, বাসন, ভাস্কর্য, অস্ত্র, বর্ম ইত্যাদি আজও

লোভের বস্তু। মধ্যপ্রাচ্যের তুলনায় চীনের ঐতিহাসিক যুগের আদি পর্যায়ে আরও সহজে উৎকৃষ্টতর সৃষ্টির নজির দেখা যায়—আরও কার্যকর বাঁধতাপ চুলা বানিয়ে তাতে তারা সুচারু মৃৎপাত্র পুড়িয়েছে এবং কাঁসা নিষ্কাশন করেছে। চীনের প্রাবাদিক শাং রাজবংশ যে বাস্তবিক সত্য ১৯২৮ সালে এই আবিষ্কারের পর তাদের রাজধানী আন-ইয়াং শহরে চৈনিক সভ্যতার নানা সম্পদ উদঘাটিত হয়েছে। প্রায় ১৬০০ থেকে ১১০০ বিসির মধ্যে বিকশিত এই সভ্যতায় চীনের প্রথম লিখনও আমরা পাই। মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে যোগাযোগের এক ক্ষীণ সূত্রও পাওয়া গিয়েছে এই শহরের মাটির নিচে।

সুমেরী সমাধি রীতির সঙ্গে শাংদের আশ্চর্য মিল ছিল। যেমন 'আর' রাজ্যের কবরে দেখা যায় রাজার সঙ্গে অনেক সভাসদ ও সেবক প্রাণ দিয়েছে, তেমনি আন-ইয়াঙের রাজকীয় সমাধিগুলিতে ছিল ৩০০ কঙ্কাল— অভিজাত কুলীন ব্যক্তি, রানী, উপপত্নী, রক্ষী, শকট চালক, শিকারী, প্রাসাদের কর্মচারী ইত্যাদি পরলোকে নিজ নিজ 'স্বর্গ পুত্রের' সেবার উদ্দেশ্যে জীবন বিসর্জন দিয়েছে। অবশ্য দুই অঞ্চলের মধ্যে দূরত্ব ৪০০০ কিলোমিটারের বেশী, কিন্তু ঐ অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার মধ্যেও অন্তত ১৫০০ বছরের পার্থক্য, সুতরাং মেসোপটেমিয়ার রীতি নীতি এবং তার সঙ্গে শিল্প কৌশলও ধীরে ধীরে চীন পর্যন্ত পৌঁছে থাকা একেবারে অসম্ভব নয়, তবে এই সম্ভাবনার আর কোন সমর্থন পাওয়া যায় নি।

ধাতুর জ্ঞান চীনারা যেখান থেকেই পেয়ে থাকুক, ধাতু শিল্প জন্ম নিলে দ্রুত কাঁসার কাজ আরম্ভ হয়ে যায়, চীনে তাম্র যুগ বলতে বিশেষ কিছু ছিল না। ঢালাইর কাজে স্বকীয় কৌশল ও উদভাবনী শক্তির চিহ্ন দেখা যায়, যেমন কোনও কোনও জিনিস বানাতে তারা কখনও কখনও দশটি ছাঁচ একত্র জুড়েছে, তার পর সংযোগ স্থল মাটি দিয়ে এমন কৌশলে ঢেকেছে যে পরে তৈরি বস্তুতে জোড়ার দাগ দেখা যায় নি। আশ্চর্য এই যে লুপ্ত মোম পদ্ধতি তাদের জানা ছিল বলে মনে হয় না।

ধাতু বিদ্যা সম্ভবত সাধারণ লোকের বড় একটা কাজে লাগে নি, আন-ইয়াঙে যে কয়েক শো কাঁসার বস্তু উদ্ধার হয়েছে তার মধ্যে দৈনিক ব্যবহারের উপকরণ সংখ্যায় নগণ্য—তিনটি কোদাল এবং কুড়াল ও বাইস মিলিয়ে দশের বেশী নয়। বাকি সব যে ধনী বা উচ্চবংশীয়দের জন্য তৈরি হয়েছে তা বোঝা যায় তাদের উদ্দেশ্য, প্রাপ্তি স্থান ও গাত্রলিপি থেকে। বস্তুগুলির প্রয়োগ ছিল শিকার, যুদ্ধ এবং

নানা সামাজিক বা ধর্মীয় বিধান পালনে, কারণ পূর্বপুরুষ ও ঠাকুর দেবতার সেবা ও তুষ্টি সংক্রান্ত অনুষ্ঠান লেগেই ছিল চীনাদের। এই সম্পদ সম্ভারের মধ্যে আমরা দেখতে পাই নীল ফিরোজা খচিত ছোরা যার মালিক হয়তো ছিল কোনও পদস্থ ব্যক্তি, মানুষ বা পশু বলি দিতে ব্যবহৃত কুড়ালের ফলা ও রণে পরিধানের শিরস্ত্রাণ; তা ছাড়া নানা আকার আকৃতির পাত্র ও ভাণ্ড—তাদের আশ্চর্য গঠন বৈচিত্র্য ধাতু-কর্মীদের কল্পনা প্রতিভার প্রায় অক্ষয় সাক্ষী, আজ ধনীরা লাখ লাখ টাকা ব্যয় করেন এক একটি সংগ্রহ করতে। অধিকাংশ সামগ্রীর গা ভরে উৎকীর্ণ কারুকাজ, এই নকশাগুলির সাংকেতিক অর্থ ছিল হয়তো, অনেক পাত্র জন্তুর আকারে তৈরি—দুই শিঙের গণ্ডার, শুঁড়তোলা হাতির পিঠে ঠিক অনুরূপ বাচ্চা হাতি, সেটি ধরে তুললে ঢাকনা খুলে গেল, ঘটের মাথায় ঢাকনার উপর পাখি; আর এক আধারে বিড়াল জাতীয় প্রাণীর মুখ, পেঁচার চোখ ও সাপের আঁশ মিলে একাধারে স্তন্যপায়ী, পাখি ও সরীসৃপের সংমিশ্রণ। এই সব পাত্রে খাদ্য বা পানীয় ভরে সম্ভ্রান্ত মৃতদের সঙ্গে দেওয়া হয়েছিল।

চাষী মজুর দোকানী কারিগর, এমন কি যারা এত যত্নে এই সব বস্তুর রূপ দিয়েছে তারা সেই সাবেক পাথর আর হাড়ের যন্ত্রপাতি দিয়েই আপন আপন কাজ চালিয়েছে। সাধারণ প্রজাদের হাতে ধাতু এল, দৈনিক জীবনে তার ব্যাপক ব্যবহার আরম্ভ হল লোহার আবির্ভাবে, যেমন হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যে ও য়োরোপেও। আশ্চর্য এই যে চীনে প্রায় ৬০০ বিসির আগে লোহার চলন হয় নি, যদিও নজির অনুসারে তারা লৌহ বিদ্যা অর্জন করেছে। আকরিক থেকে এই ধাতুর নিষ্কাশন এবং তা গলাবার উপযুক্ত তাপবর্ধিত চুলা পশ্চিমী ধাতুকর্মীদের সহস্রাধিক বছর আগেই তারা ব্যবহার করেছে। হয়তো বনেদী সম্প্রদায়ের মধ্যে কাঁসার পাশাপাশি লোহার আকর্ষণ ও চাহিদা ছিল না।

. .

লৌহ যুগ বলতে সাধারণত যা বোঝায় তার প্রায় ২০০০ বছর আগে লিখিত ইতিহাস দিয়ে সভ্যতার সূচনা হয়েছে, সুতরাং আক্ষরিক অর্থে তা আমাদের আলোচ্যর বাইরে। তবু লোহার গুরুত্ব এত বেশী যে তার আবির্ভাব ও অভিব্যক্তি সম্বন্ধে দু কথা বলা দরকার, বিশেষত সেই কাহিনীতে যখন রহস্য ও আগ্রহজনক বস্তুর অভাব নেই। ধাতু পরিবারের মধ্যে পৃথিবীতে প্রাচুর্যে অ্যালুমিনিয়ামের

পরেই তার স্থান, আজ লোহা ও ইস্পাতের ব্যাপক ব্যবহার তামা কাঁসাকে অনেক পিছনে ফেলে এসেছে। ইস্পাতের অস্ত্র যন্ত্র আরও ক্ষুরধার, তা ছাড়া কাঁসার চেয়ে সস্তা ও সহজলভ্য বলে লোহা শুধু হাতিয়ার তৈরিতে নয়, কুড়াল ছুরি ক্ষুর হালের ফলা ও অন্যান্য দ্রব্যে তার স্থান নিয়ে নিল। কাঁসা ছিল প্রধানত অভিজাত ও বিত্তশালীদের সম্পদ, লোহা প্রথম সাধারণের ধাতু। আজও নানা ক্ষেত্রে তার এই সর্বজনীন চরিত্র অক্ষুণ্ণ।

এই অধ্যায়ের আরম্ভে আমরা দেখেছি বিশুদ্ধ ধাতুটি চিনবার অনেক আগেই মানুষ নানা কাজে লোহার অকসাইড ব্যবহার করেছে। ধাতু যুগে প্রবেশ করেও সীসা ও তামার নিষ্কাশনে তাদের আকরিকের সঙ্গে চুলায় এই অকসাইড যোগ করাতে ঐ সব ধাতুর সঙ্গে উপস্থিত সিলিকা দূর করা সহজ হয়েছে, কারণ তা লোহার সঙ্গে জুড়ে যে আবর্জনা বা ধাতুমল (slag) তৈরি হয় তা গলে বেরিয়ে যায়—অবশ্য এই অন্তর্নিহিত রসায়ন মানুষ শিখেছে প্রায় ২০০০ বছর পরে। লোহার আকরিকের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠ পরিচয় সত্ত্বেও এই ধাতুর নিষ্কাশন হল অনেক পরে, তার প্রায় ৭০০০ বছর আগেই মুক্ত অবস্থায় অন্যান্য ধাতুর সঙ্গে মানুষের কিছুটা পরিচয় হয়েছে।

এই বিলম্বের অবশ্য কারণ ছিল। এত কাল ধরে তামা ও কাঁসার যে জ্ঞান সংগ্রহ করা হয়েছে লোহার বেলায় তা খাটে না। যথা, তামার বিগলন ও গলনে খুব উন্নত চুলার প্রয়োজন ছিল না. তেমন চুলায় লোহার বিগলন অসম্ভব, তার জন্য ২০০০ ডিগ্রি সেনটিগ্রেড তাপমাত্রা দরকার। শীতল তামাকে পিটিয়ে রূপ দেওয়া চলে, লোহা তেতে লাল না হওয়া পর্যন্ত অতটা নমনীয় হবে না। গলিত তামার থেকে আবর্জনা বেরিয়ে এসে উপরে ভাসে, তখন সরিয়ে ফেলা যায়, কিন্তু লোহার অপবস্তু বার করতে হয় তপ্ত লাল ধাতু পিটিয়ে। সুতরাং লোহার জন্য সম্পূর্ণ নতুন শিল্প উদভাবন করতে হয়েছে. দরকার হয়েছে নতুন যন্ত্রপাতি, যেমন তাপদীপ্ত ধাতু ধরবার সাঁড়াশি। তা ছাড়া লোহার বিলম্বিত আবির্ভাবের আর এক কারণ যে তা তামার মত সহজলভ্য ছিল না, মুক্ত লোহা খুব বিরল।

তথাপি মুক্ত ধাতু থেকে তৈরি প্রাচীন লোহার জিনিস ইতস্তত আবিষ্কার হয়েছে। সুমেরী শহর-রাজ্য আরের রাজকীয় সমাধিতে অন্যান্য সামগ্রীর মধ্যে ছিল গোটা কয়েক মরচে-পড়া খণ্ড যাদের আদি ব্যবহার অজ্ঞাত। আনাতোলিয়ার

আলাসা হুয়ূক ঘাঁটিতে পাওয়া গিয়েছে একটি লোহার পিন যার মাথাটি স্বর্ণমণ্ডিত এবং বাঁকা চাঁদের আকারের এক ফলকের একটি খণ্ড। মিশরে নীল নদ উপকূলের ৬০০০ হাজার বছর প্রাচীন কয়েকটি ঘাঁটি থেকে এসেছে লোহার পুঁতি, রুপার মাথাযুক্ত একটি কবচ এবং একটি ছুরির ফলা। ক্রীট দ্বীপের কৃনসস রাজ্যের ৩৮০০ বছর প্রাচীন এক সমাধিতে ছিল ঘন চতুষ্কোণ (cube) আকারের এক বস্তু, উদ্দেশ্য রহস্যময়। সিরিয়ার রাস সামরা ঘাঁটি খুঁড়ে উদ্ধার হয়েছে প্রায় ৩৫০০ বছর প্রাচীন এক রণ-কুঠার. এবং মিশরের রাজা টুটানখামেনের সমাধিতে রক্ষিত বিখ্যাত সম্পদ ভাণ্ডারের মধ্যে ছিল চমৎকার সোনার হাতলযুক্ত এক ছোরা. মরুভূমির শুষ্ক আবহাওয়ার থেকে এত কালেও চকচকে লোহার ফলাটিতে মরচে পড়ে নি।

এই সব লোহা আকরিকজাত নয়, তবে এল কোথা থেকে? এসেছে মহাকাশ থেকে, উলকাকে বাহন করে। পৃথিবীতে উলকাপাত বিরল. তা ছাড়া তাদের অনেকে অধিকাংশে পাথর। শুধু সিডেরাইট জাতের উলকা প্রায় সর্বাংশে মুক্ত লোহা। মধ্যপ্রাচ্যের প্রাথমিক লৌহকর্মীরা এই ধাতুই সংগ্রহ করেছে। সুমেরীরা এর নাম দিয়েছিল 'স্বর্গীয় ধাতু' প্রাচীন জগতে এই লোহার সমাদর ছিল সোনার চেয়েও বেশী। যে জিনিস আকাশ থেকে দৈবাৎ দেবতার দানের মত পড়ছে, নিশ্চয় তার মধ্যে দৈব শক্তিও দেখেছে মানুষ।

আদি কালে লোকে কি করে উলকা থেকে ধাতু বার করেছে তা জানা নেই। তবে বর্তমান জগতের এস্কিমো ও রেড ইন্ডিয়ানদের থেকে কিছু ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে। প্রসিদ্ধ অভিযাত্রী রবার্ট পিয়ারি দেখেন গ্রীনল্যানডের এসকিমোরা তিনটি প্রকাণ্ড উলকা থেকে লোহার ছোট ছোট ফলক খসিয়ে গর্ত-করা হাড়ে পর পর সাজিয়ে এক রকম দাঁতালো ছুরি বানায়। উত্তর মেকসিকোর ইনডিয়ানরা যে উলকার ফাটলে তামার বাটালি ঢুকিয়ে চাড় দিত এক জায়গায় তার প্রমাণ থেকে গিয়েছে উলকার মধ্যে বন্দী বাটালির ভাঙা ফলায়।

পৃথিবীতে লোহার আকরিক সুপ্রচুর ও প্রায়ই মাটির কাছাকাছি অবস্থিত, সুতরাং এই ধাতুর নিষ্কাশন শিখে মহাকাশের বিরল দানের উপর নির্ভরতা দূর হল। কিন্তু এই অগ্রগতি সহজে হয় নি, কারণ আমরা দেখেছি আকরিক থেকে লোহার বিগলন এবং এই ধাতুকে প্রয়োজনীয় বস্তুর রূপ দান তামা কাঁসার তুলনায় অনেক জটিল ও কঠিন শিল্প। সম্ভবত, যেমন তামার ক্ষেত্রে, তেমন লোহাও যে

পাথরে বা গেরিমাটিতে ছদ্মবেশে লুকিয়ে আছে এবং তা নিষ্কাশন করা যায় এই আবিষ্কার আকস্মিক অবস্থা সংযোগে ঘটেছে। হয়তো তামা ও সীসার বিগলনে আকরিকের সিলিকা দূর করতে যে চুলায় লোহার অকসাইড যোগ করা হয়েছে তাতে তাত বেশী ছিল এবং অকসিজেন কম ছিল, ফলে আকাঙ্ক্ষিত ধাতুর সঙ্গে ছোট ছোট বিশুদ্ধ লৌহ খণ্ডও তৈরি হয়েছে।

অবশ্য এটুকু আবিষ্কার এবং লোহার নিয়মিত সুষ্ঠু নিষ্কাশনের মধ্যে অনেকটা ফাঁক। তামার বিগলনেও উচ্চ তাপ দরকার হয়েছে এবং জ্বালানির কারবন আকরিকের অকসিজেনকে বন্দী করে ধাতুকে মুক্তি দিয়েছে, কিন্তু লোহা-বিগলনী চুলায় আগুনের নিয়মন আরও কড়া, চড়া তাপ বজায় রাখতে হয় ক্রমাগত জোর হাওয়ার ঝাপটায় এবং আকরিককে সম্পূর্ণ ঢেকে রাখা দরকার কাঠকয়লা দিয়ে। অত্যধিক কারবনের সংস্পর্শে লোহা হবে বেশী কঠিন ও ভঙ্গুর, বাতাস লাগলে তা আবার অকসিজেনের সঙ্গে জুড়ে যেতে পারে। কাজটি সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন হলেও ব্যবহারের আগে ধাতুকে তপ্ত অবস্থায় পিটিয়ে ভিতরকার আবর্জনা বহিষ্কার ও ছিদ্রগুলি বন্ধ করতে হয়। আদিম অমার্জিত চুলায় যথাযোগ্য উচ্চ তাপ ও অকসিজেন-সংক্রান্ত অবস্থার সৃজনে জ্বালানির অপচয় হয়েছে প্রচুর, ফলে মধ্যপ্রাচ্যে নিষ্কাশনের স্থলে স্থলে পার্বত্য অঞ্চলের বাবলা ও পেস্তার বন উজাড় হয়েছে, তার থেকে জমির উর্বরতা কমেছে, ভূমিক্ষয় (erosion) বেড়েছে, জন্তুরা পালিয়েছে। আদি কালে প্রযুক্তি শিল্পের সূচনা থেকে তার উন্নতির সঙ্গে তাল রেখে এমনি পরিবেশের ক্ষয় ক্ষতি বেড়ে চলেছে, কিন্তু মানুষ তা নিয়ে চিন্তিত হয়েছে কেবল খুব সম্প্রতি।

যেমন তামার বেলায়, তেমন কবে কোথায় লোহার প্রথম নিষ্কাশন হয়েছে তা বলা যায় না। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রকের প্রথম দিকে তৈরি আকরিকজাত লৌহ বস্তু সিরিয়া থেকে আজেরবাইজান পর্যন্ত নানা জায়গায় পাওয়া গিয়েছে, তার কিছু কিছু হয়তো আমদানি করা, কিন্তু তৎকালীন নিষ্কাশনী চুলা বা ধাতুমলের স্তূপ আবিষ্কার হয় নি। এ যাবৎ আদিতম চুলা পাওয়া গিয়েছে অসট্রিয়ার আল্‌প্‌স পর্বতে, মাত্র ২000 বছর প্রাচীন তা, এশিয়ায় লৌহ প্রচলনের অনেক পরেও য়োরোপ প্রায় সর্বাংশে কাঁসাই ব্যবহার করেছে। আকরিক থেকে লোহার উদ্ধারে হিটাইটরা পথপ্রদর্শক বলে সাধারণ ভাবে স্বীকৃত। এই গুণসম্পন্ন ইন্দো-য়োরোপীয়

জাতি ২000 বিসি নাগাদ ককেশাস পর্বতমালার পর পারে তাদের মাতৃভূমি থেকে এসে তুরস্কের আনাতোলিয়া অঞ্চল অধিকার করে। তামা এবং কাঁসার বিগলন ও ঢালাইতে তারা দক্ষ ছিল, নতুন দেশে খনিজ লোহার সম্পদ পেয়ে অবিলম্বে এই ধাতুর ব্যাপক নিষ্কাশন আরম্ভ করেছে। পরে তা বাণিজ্যের ও মিশর সিরিয়া ইরান এবং ফিনিশিয়ায় রপ্তানির এক প্রধান সম্পদ হয়ে দাঁড়াল। হিটাইট রাজ্যে লোহার গুরুত্ব সম্বন্ধে জানা যায় মাটির পাটায় খোদাই করে লেখা দলিল থেকে—আকরিকবাহী পর্বতের তালিকা, রাজাদের প্রতি সম্মানের চিহ্ন স্বরূপ উপহারে প্রাপ্ত ও প্রদত্ত লোহা, সমাজে লৌহকর্মীদের গৌরবময় স্থান ইত্যাদির উল্লেখ আছে তাতে। খ্রীষ্টপূর্ব ১৩শ শতাব্দে অ্যাসিরিয়ার এক রাজা হিটাইট-রাজ তৃতীয় হাটুসিলিসের কাছে লোহার অনুরোধ জানায়, জবাবে হাটুসিলিস চিঠি দিচ্ছে উৎকৃষ্ট লোহা তার গুদামে এখন নেই, তৈরি হলেই পাঠাবে—আপাতত সে ঐ ধাতুরই এক ছোরার ফলা পাঠাচ্ছে।

১২০০ বিসি নাগাদ শত্রুরা হিটাইট সাম্রাজ্য জয় করল, তাদের মধ্যে ছিল কাঁসার অস্ত্রধারী য়োরোপীয় বর্বর দল। পরাজিত পলাতকদের অনেকে এ দিকে সে দিকে আশ্রয় নিয়েছে, ঐ সময়ে মধ্যপ্রাচ্যের সর্বত্র লোহার বর্ধিত উৎপাদন দেখা যায়, গ্রীস ও ইটালিতেও নিষ্কাশন কেন্দ্র গড়ে উঠেছে হয়তো এই স্ফুরণে আশ্রিত হিটাইট লৌহকারদের হাত ছিল। উত্তর-পূর্ব ইরানের তৎকালীন হাসানলু শহরে সাম্প্রতিক খননে উদঘাটিত বিবিধ ধাতু বস্তু থেকে সোনা রুপা তামা কাঁসার কাজে কারিগরদের কলা কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়, তারা পিটিয়ে বানিয়েছে মাত্র এক মিলিমিটার পুরু পাত তা ছাড়া লুপ্ত মোম ঢালাইয়ের প্রয়োগে গড়েছে মনোরম ফাঁপা হালকা বস্তু। উপরের স্তরে বিচিত্র লোহার জিনিসও দেখা দিয়েছে—পিন, আংটি, বালা, অলংকারের দোলক, শত শত বোতাম, কোমরবন্ধ ও তার বকলস, ঘটি বাটি, পেরেক, তীরের ফলা, কাস্তের ফলা, ছুরি, ছোরা, হাতা, চামচ, চিমটে, শিরস্ত্রাণের কান-ঢাকনা ইত্যাদি। হাসানলু ছিল বিভিন্ন বাণিজ্য পথের মধ্য স্থলে, সুতরাং ধাতু বস্তু সেখান থেকে নানা দিকে গিয়েছে।

আধুনিক ইলেকট্রন-দূরবিনে পরীক্ষার পর এই শহরের একটি ছোরা বিশেষ আগ্রহ জাগিয়েছে, কারণ এটির থেকে মনে হয় হাসানলুতে ইস্পাত শিল্প জানা ছিল। আজ লোহার সঙ্গে নানা ধাতু বা কারবন অল্প পরিমাণ মিশিয়ে ইস্পাত

তৈরি হয়, আদি কালের প্রথম ইস্পাত কারবনযুক্ত ; এখনও তাই সবচেয়ে চলতি, অবশ্য আধুনিক শিল্প আনুষঙ্গিক কলা কৌশলে অনেক উন্নত, যেমন তার কাঠিন্য বাড়াতে হয় গরম অবস্থায় হঠাৎ ঠাণ্ডা জলে ডুবিয়ে। সে কালে কাঠকয়লার সঙ্গে উচ্চ তাপে বেশ কিছু ক্ষণ রাখার ফলে লোহা তার থেকে কারবন নিয়েছে, এই অবস্থা সংযোগে ইস্পাতের সৃষ্টিও নিশ্চয় আকস্মিক। এ নিয়ে দুটি জল্পনার উল্লেখ করা যেতে পারে। সাধারণ লোহ বস্তুর রূপ দিতে তাকে বার বার তাতিয়ে নরম করে হাতুড়ি মারতে হত, এই কাজে হয়তো কোথাও লোহার খণ্ডটি জলন্ত কাঠকয়লার গভীর অন্তরে রাখা হয়েছে এবং হাঁপরের ঝাপটা হাওয়ার সে পর্যন্ত পৌঁছাবার শক্তি ছিল না ; ফলে খণ্ডের বাইরের দিকটা কারবন নিয়েছে, পরে কর্মকার লক্ষ্য করেছে তার বস্তুটি আগের চেয়ে আরও কঠিন, আরও কার্যকর। অবস্থা মিলিয়ে আবার পরীক্ষা করে কারণটি ধরা পড়ল এবং তখন থেকে তারই পুনঃসৃষ্টি চলল। অনেক অস্ত্র যন্ত্রের উপরে এবং ফলার ধারে ইস্পাত, ভিতরটা অপরিবর্তিত লোহা। নয়তো এমন হতে পারে যে লোহা নিষ্কাশনের সময়ে কাজ ত্বরান্বিত করতে কর্মী সেই গলন্ত বস্তু একটি কাঠের দণ্ড দিয়ে নেড়েছে। লাঠির মাথা পুড়ে কারবন সৃষ্টি করেছে এবং তা মিশেছে লোহায়। আসল কারণটি ধরতে পেরে সে তখন আরও উন্নতি করেছে নতুন-কাটা কাঠের খণ্ড আকরিকের সঙ্গে যোগ করে।

আবিষ্কার যে ভাবেই হয়ে থাকুক, হাসানলু তার ক্ষেত্র নয়, এই কীর্তিও সাধিত হয়েছে আনাতোলিয়ার হিটাইট রাজ্যে, সম্ভবত আর্মেনিয়ায়। তারিখটা অনিশ্চিত, তবে ১৫০০ বিসির কাছাকাছি হতে পারে, কিন্তু আনাতোলিয়ার বাইরে তখন থেকেই ইস্পাতের ব্যাপক উৎপাদন ঘটে নি, তা দেখা যায় খ্রীষ্টপূর্ব ১৩শ শতাব্দের দ্বিতীয়ার্ধে। অস্ত্রে যন্ত্রে কাঁসার স্থান সম্পূর্ণ দখল করতে ইস্পাতের প্রায় ৩০০ বছর লেগেছে। এমন হতে পারে যে নিজেদের স্বার্থে ইস্পাতজ্ঞানী অভিজ্ঞ কর্মী গোষ্ঠিরা তাদের কলা কৌশল গোপন রেখেছে, হয়তো আকরিক থেকে ইস্পাতের রূপান্তরে কোনও দৈব শক্তি মেনেছে তারা, আজও অনেক আদিবাসী সমাজে কামার-দেবতার দেখা মেলে, আমরা বিশ্বকর্মার পূজা করি। যাই হক, আবিষ্কারের পর দুই শতাধিক বছর কাল ইস্পাতের ব্যাবসা বাণিজ্য হিটাইটদের হাতেই ছিল। ভারতে লোহা এনেছে হিটাইটদের মতই ইনদো-য়োরোপীয় আর্যরা, যেমন এনেছে পালিত অশ্ব ও অশ্বরথ। ঋগ্বেদের স্তোত্রে অয়স্ বর্ণিত হয়েছে

ঘাতসহ, কঠিন, (তপ্ত অবস্থায়) নমনীয় (malleable) এবং প্রসারণক্ষম (ductile) বস্তু বলে, তার থেকে মনে হয় ইস্পাতও জানা ছিল খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রকে। অবশ্য কখনও কখনও অয়স্ লাল বলে বর্ণিত বলে কেউ কেউ বলেন তা তামা বা কাঁসাও হতে পারে। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে অ্যালেকজ্যানডারের ভারত অভিযানের সময় থেকে এই উপমহাদেশের ইস্পাত উৎকৃষ্ট বলে বিবেচিত, যদিও কি উপায়ে তা তৈরি হয়েছে সে বিষয়ে প্রত্নবিজ্ঞানের নজির কিছু নেই। ভারতীয় লৌহ শিল্প সম্বন্ধে আরও আলোচনা হবে পরে।

এশিয়ার পূর্ব প্রান্তে থাইল্যানডের প্রাচীন কাংস্য যুগ যেমন বিস্ময়ের বিষয়, তেমনি আফ্রিকার ট্যানজ়ানিয়ায় ২০০০ বছর আগে উৎকৃষ্ট ইস্পাত সৃষ্টি বিশেষজ্ঞ-দের অবাক করেছে। সেখানে হায়া উপজাতির সামাজিক ঐতিহ্য অনুশীলন করতে গিয়ে এক মার্কিন বিজ্ঞানী ১৯৬০ দশকের শেষে এই আবিষ্কারটি করেন। তার ৫০ বছর আগেও হায়ারা আপন কৌশল অনুসারে কারবন-ইস্পাত বানিয়েছে, পরে সস্তায় য়োরোপীয় যন্ত্রপাতি পেয়ে তা বন্ধ করে দিয়েছে। অনুসন্ধানীরা দেখলেন শিল্পটি বিস্মৃতপ্রায়, প্রাক্তন দক্ষ কর্মীদের মধ্যে মাত্র জন কয়েক স্থবির ব্যক্তি তখনও জীবিত, তাদের মৃত্যুর পর পদ্ধতিটির পরিচয় দেওয়ার মত কেউ থাকবে না। বিজ্ঞানীরা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, কয়েক বছর পরে তাঁদের অনুরোধে এই প্রবীণরা স্মৃতির তহবিল খুঁজে নতুন করে একটি চুলা গড়বার ব্যবস্থা করল। মাটিতে এক গর্তে রইল আংশিক পোড়া জলা ঘাস, তা ঘিরে মাটি ও ধাতুমলের তৈরি ১.৬ মিটার উঁচু চুলার নিম্নাংশের চতুর্দিকে গর্তের সঙ্গে আটটি চিনেমাটির বায়ুনল, প্রত্যেকটি এক ছাগচর্মের হাঁপরের সঙ্গে যুক্ত। আট ব্যক্তি তাদের চালিয়ে অগ্রিম-তপ্ত বাতাস পাঠাল জ্বলন্ত কাঠকয়লার চুলায়, তাপের মাত্রা ১৮০০ ডিগ্রি ছাড়িয়ে গিয়ে কারবনযুক্ত ইস্পাত বানাবার পক্ষে যথেষ্ট আঁচ গড়ে উঠল। গলিত লোহার সঙ্গে উপরোক্ত দগ্ধ তৃণের কারবন জুড়ে সৃষ্টি হল ইস্পাত।

মার্কিন অনুসন্ধানীরা ট্যানজ়ানিয়ার ভিকটোরিয়া হ্রদের পশ্চিমকূল খুঁড়ে প্রায় অনুরূপ তেরোটি চুলার অবশিষ্ট আবিষ্কার করেন, তেজী কারবন পদ্ধতিতে তাদের বয়স জানা গিয়েছে ১৫০০ থেকে ২০০০ বছর। তার অনেক আগেই অবশ্য অন্যত্র ইস্পাত তৈরি হয়েছে, কিন্তু এতটা মার্জিত শিল্প কৌশল বহু কাল পর্যন্ত দেখা যায় নি, প্রায় ১৯ শতাব্দী পরে জার্মেনির সিমেন্স তাঁর ওপ্‌ন্ হার্থ

চুল্লীতে প্রথম উচ্চ মানের ইস্পাত তৈরি করেন। 'তমসাবৃত অসভ্য' আফ্রিকার এক উপজাতির এই কীর্তি তুচ্ছ নয়।

অনেকে বলেন যখন যেখানে লোহার নিষ্কাশন এবং তা ব্যবহারের বিবিধ কৌশল জানা হয়েছে তখন সেখানে লৌহ যুগের সূচনা; কিন্তু কারও কারও মতে প্রকৃত লৌহ যুগের শুরু ইস্পাত থেকে, কারণ এই কঠিন রূপেই লোহা অনেকাংশে কাঁসার চেয়ে উৎকৃষ্ট, এবং ধাতুর প্রথম ব্যবহার বা নিষ্কাশন নয়, তার যথার্থ কার্যকারিতাই নতুন যুগ নির্দেশ করে। পেটা লোহার বস্তু কাংস্য যুগের প্রথম দিকে তৈরি হয়েছে বটে, কিন্তু এই লোহা গলিয়ে কাঁসার মত ঢালাই করা চলত না, অস্ত্র যন্ত্রের ধার সহজে নষ্ট হত, তাই বার বার শোধন দরকার হয়েছে, কাঁসার উপকরণের সংরক্ষণ এত শ্রমসাধ্য ছিল না। অবশ্য লোহা ও ইস্পাতের জন্ম ক্ষেত্র মধ্যপ্রাচ্যে একটি জন্ম তারিখও সুনির্দিষ্ট নয়।

যাই হক, যুগের নাম দিয়ে কাল ভাগাভাগি শুধু এক সুবিধাজনক ব্যবস্থা, ধাতুর আগমনে আবহমান পাথরে অভ্যস্ত মানুষের জীবনে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হল সেটাই গুরুতর বিষয়। সাধারণ আকরিক শিলা থেকে আরম্ভ করে অন্য দিকে ব্যবহার্য ধাতব উপকরণ বা অলংকারটি পর্যন্ত পৌঁছাতে প্রথম ধাতুকর্মীদের যে নানা ছোট বড় সমস্যার বিহিত করতে হয়েছে, হাজার রকম খুঁটিনাটির দিকে নজর দিতে হয়েছে তা সহজেই অনুমেয়। আজ যা চিরাচরিত একদা তা মাথা খাটিয়ে উদভাবিত। এর ফলে মূল নীতি না বুঝেও ভূবিজ্ঞান, রসায়ন, পদার্থ বিদ্যা ইত্যাদির অনেক সত্য ও তাদের প্রয়োগ মানুষকে শিখতে হল। যে সুদৃশ্য বর্ণ-বিচিত্র শিলা ছিল যাদু শক্তির আধার, রক্ষাকবচের উপাদান, হয়তো আকস্মিক অবস্থা সংযোগে তার রূপান্তর এই জ্ঞান ভাণ্ডারের চাবি মানুষের হাতে তুলে দিয়েছে। তখন থেকে একের পর এক অন্যান্য ধাতু ও তাদের সংকর নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তার কাজে লেগে জীবন সমৃদ্ধ করেছে, আজও তাদের নব নব ব্যবহার দেখা দিচ্ছে।

১০। বাড়ন্ত ফসল

আকরিক উদ্ধার, ধাতুর নিষ্কাশন, ঢালাই ও তাদের দিয়ে সুমার্জিত অস্ত্র থেকে সূক্ষ্ম বিলাস দ্রব্যের সৃষ্টির ধাপে ধাপে কামার সেকরার কাজ যখন এগিয়ে চলছিল, তখন অন্য দিকে নতুন আবিষ্কার থেমে থাকে নি তা ছাড়া পরিচিত শিল্পের উন্নতি, পুরাতন বিদ্যার নব নব প্রয়োগও মানুষকে সভ্য যুগের কাছাকাছি নিয়ে এসেছে, অধিকতর সুখ সুবিধার পথ খুলেছে।

কৃষি দিয়ে নবপ্রস্তর বিপ্লবের শুরু। আমরা আগে দেখেছি আদি কৃষকরা জমির উৎপাদন অনেক বাড়িয়েছে সেচের সূচনা করে, মধ্যপ্রাচ্যে তা ঘটেছে ৫500 বিসিতেই যখন গ্রামবাসীরা নদী বা জলধারা থেকে খাত কেটে এনেছে খেত পর্যন্ত, ছোট ছোট বাঁধ বানিয়ে জল আটকাতেও শিখেছে। ইরাকে গম ও যবের জন্ম ক্ষেত্র উচ্চভূমির থেকে প্রথম চাষী সম্প্রদায়ের উত্তরপুরুষরা আগেই নেমে এসেছে নিচে, সেচ শিল্পে দক্ষতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জলধারার পথ ধরে গ্রামগুলি ছড়াল মুক্ত প্রান্তরে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর দিকে। দক্ষিণ ইরাকে ঐ জোড়া নদীর মধ্য ভাগ বা মেসোপটেমিয়া তখন ছিল জলাভূমি, অল্প কাল আগে পারস্য উপসাগরে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত। প্রতি বছর বানের জল তাদের দুই তীর রসসিক্ত পলিসিঞ্চিত করে যায়, কিন্তু সেটুকু পার হলেই বৃষ্টিবিরল তৃষিত বন্ধ্যা প্রান্তর। সুতরাং সেখানে জল না আনলে এবং নদী অঞ্চলে জলাভূমির জল না সরালে চাষ অসম্ভব। প্রকৃতিও নির্দয়, বছরে কয়েক মাস আকস্মিক বন্যার উপদ্রব, বাকি সময় নিরস মাটি প্রখর সূর্যে পোড়ে। গ্রীষ্মে প্রচণ্ড তাপ, শীত কালে কনকনে ঠাণ্ডা। এর চেয়ে প্রতিকূল দেশ কল্পনা করা শক্ত, তবু এখানেই গড়ে উঠেছিল প্রাচীনতম এক সভ্যতা—এই সুমেরী সভ্যতা সম্ভব হয়েছে পূর্বগামীরা জঙ্গল কেটে হিংস্র জন্তু মেরে সেচ শোধন করে চাষ বাসের ব্যবস্থা করেছে বলেই।

এর মূলে ছিল সংগঠন ও সহযোগিতা। প্রথম পারিবারিক চাষের তুলনায় সেচ-কৃষি অনেক জটিল। খাত কাটা, তাতে পলি জমে বুজে না যায় তার জন্য নিরন্তর পরিষ্কার করা, কৃষকদের মধ্যে আনীত জলের ন্যায়সংগত বন্টন ইত্যাদিতে

দরকার হয়েছে দৃঢ় নেতৃত্ব, যাতে কার কি কাজ, কে কতটা পাবে, কে তার বেশী নিয়েছে এ সব সমস্যা ও তজ্জনিত বিবাদই বড় হয়ে না দাঁড়ায়। সুতরাং যেমন অন্যান্য ক্ষেত্রে তেমন খেতে জল সরবরাহ নিয়েও সাম্প্রদায়িক সংগঠন আরও বড় হল, যার ফলে এই সুমেরীরা আরও দীর্ঘ ও প্রশস্ত খাল কেটে বেশী জল এনেছে। ক্রমে কোনও কোনও গ্রাম শহরে পরিণত হয়েছে, ইরাকের জোড়া নদীর দিকে গড়ে উঠেছে যে সব গ্রাম তারাই খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ সহস্রকে পৃথিবীর প্রথম নাগরিক সভ্যতার অগ্রদূত। লেখা আবিষ্কার করতে হল সেচসিক্ত মাঠের বর্ধিত উৎপাদন, জমিজমা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয়ের হিসাব রাখতে। দেখা দিল রাজবংশ, কিন্তু সে কথা হবে পরে।

মিশরের সুপ্রাচীন সভ্যতাও জলকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে, তবে সেখানে সেচ ব্যবস্থার উৎপত্তি ও বিবর্তন কিছুটা ভিন্ন। হিরডটাসের কথায় মিশর "নীল নদের দান"। সেই বৃষ্টিবিরল দেশে প্রথম নবপ্রস্তর বাসিন্দারা পেয়েছে নীরস মরু, এক নদীসংলগ্ন সংকীর্ণ অঞ্চল ছাড়া আর কোথাও চাষ করতে পারে নি। তাও সমস্যা ছিল, অববাহিকার নিম্নাংশ তখন জলো জঙ্গলে পরিপূর্ণ, নলখাগড়া ও হোগলার প্রকাণ্ড ঝোপে ঝাড়ে বন্য জন্তুর বাস। যৌথ উদ্যোগে জঙ্গল সাফ করে তাদের নিশ্চিহ্ন করতে হল। তা ছাড়া বছরের অধিকাংশ কাল নীল বিশীর্ণ, কেবল জুলাইতে ইথিওপিয়ার উচ্চভূমিতে যখন ঘন বর্ষা আসে তখন সেই জল ১৬০০ কিলোমিটার দক্ষিণে গড়িয়ে এসে ফুলিয়ে তোলে তাকে, নদীর দুই কূল ভেসে যায় বানের জলে ও পলির পাঁকে, সেপটেমবরে তার অববাহিকা প্রায় দুই মিটার জলের নিচে ডোবে। অকটোবরে জল সরে গিয়ে রেখে যায় পলির প্রলেপ, তখন সেই উর্বর মাটিতে বীজ বুনেছে প্রথম কৃষকরা। নীল নদের বন্যা ও পলি যে মিশরীদের কাছে কতখানি মূল্যবান ছিল তার ইঙ্গিত মেলে শেক্‌সপিয়ারের কাব্যে; মিশর দেখে এসে অ্যান্টনি বলছেন অক্‌টেভিয়াসকে :

"The higher Nilus swells
The more it promises ; as it ebbs, the seedsman
Upon the slime and ooze scatters the grain,
And shortly comes to harvest."

কিন্তু বানের জল সর্বত্র সমান ছড়ায় না, যে বছর তার প্রকোপ কম সে বছর

প্লাবিত অংশের প্রান্ত ভূমি যথেষ্ট ভেজে না এবং নিচু জমিতে তা জমে বেশী। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তখন মিশরী চাষীরা এক উপায় উদভাবন করল, যে সব জায়গায় নদী চওড়া হয়ে আশেপাশে ছড়িয়েছে সে সব অংশে তারা নিচু বাঁধ বানাল যাতে জল আবার নদীতে ফিরে যেতে না পারে। তার পর এই বিলগুলির গায়ে আঠালো মাটি মাখিয়ে ব্যবস্থা করল যাতে আটক জল শুষে তলিয়ে না যায়, ক্রমশ এই রকম আরও বড় বড় ফাঁদে জল আটকাল তারা। ২০০০ বিসি নাগাদ যখন রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত তখন দেখা যায় নীল নদের সমগ্র উপত্যকার দুই কূল এই সব বিলে ভাগ করা। নদীর উচ্চাংশে বিলে অতিরিক্ত জল জমলে নির্গমের পথ খুলে দেওয়া হত, খাল বেয়ে জল চলে আসত নিচে, অন্যান্য খালের শাখা প্রশাখা বিল থেকে দূরতম অঞ্চলে পৌঁছে দিত জল। এই ব্যবস্থায় পলিসিঞ্চিত আবাদী জমির উর্বরতা কখনও কমে নি।

বাঁধ, তাদের জল নির্গম পথ, খাল ইত্যাদির সংরক্ষণ ও শোধন, বহুমূল্য বারির ন্যায্য এবং যথার্থ ব্যবহার এই সব নিয়ন্ত্রণ করতে অবশ্য দেখা দিল বুদ্ধি বিবেচনা ক্ষমতার অধিকারী প্রশাসক দল। সেচসিঞ্চিত খেতের অপর্যাপ্ত ফসলও সমাজে চাষ আবাদের সঙ্গে নিঃসম্পর্ক নানা পৃথক গোষ্ঠীর অভ্যুদয়কে সাহায্য করেছে—বিভিন্ন পেশাদার শ্রেণী যারা নিজের ঘরে পরিবারের সব প্রয়োজন মেটাতে পারে নি (যেমন আজ কেউ পারে না), যারা নির্ভর করেছে অন্যের উৎপাদিত খাদ্য ও ব্যবহার্য বস্তুর উপর। কেউ গড়েছে পিরামিড ও মন্দির, অন্যরা তার দেয়ালে ছবি এঁকেছে অথবা লিখেছে চিত্রলিপিতে, বেড়েছে পুরোহিত সম্প্রদায়ের প্রভাব, ফেআরোদের ধন মান পারিষদবর্গ—তার আরও বিষদ আলোচনা পরে হবে। মেসোপটেমিয়ায় নদী জলের লবণ শেষ পর্যন্ত সেখানে সেচ ব্যবস্থার সর্বনাশ করেছে, কিন্তু নীলের জল লবণমুক্ত বলে তার উপত্যকা ৫০০০ বিসি থেকে আজ পর্যন্ত উর্বর ও জনসন্নিবিষ্ট, প্রাচীন মিশরী সভ্যতা টিকেছে বহু কাল।

পৃথিবীর অন্যত্র পেরু, মেক্সিকো ও চীন দেশেও উন্নত সভ্যতা গড়ে উঠেছে কৃষির ভিত্তিতে এবং তার এক প্রধান অংশ ছিল সেচ. দেশ ভেদে ব্যবস্থারও কিছু ভেদ দেখা যায়। চীনের আদিতম কৃষিজাত শস্য বাজরার খেতে সেচ ব্যবহারের কোনও নজির নেই, কিন্তু ধান চাষে প্রচুর জল লাগে, কারণ চারাগুলির শিকড় ডুবে না থাকলে ফসল ভাল হবে না। যথেষ্ট কাল জলের নিচে থাকে এমন ভূমি বিরল,

সুতরাং আদি কৃষকরা নিচু জমি ঘিরে বাঁধ বানাল এবং কাছাকাছি কোনও স্রোতের জল খাত কেটে সেখানে নিয়ে এল। এ ভাবে নিচু অঞ্চলগুলি কাজে লাগিয়ে চৈনিক চাষীরা পাহাড়ের গা কেটে ধাপে ধাপে সমতল খেত সৃষ্টি করেছে ; শুধু চীনে নয়, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও ভারতের পার্বত্য অঞ্চলে ধাপ কাটা খেতের দৃশ্য আজ সুপরিচিত।

সেচ শিখে প্রাগৈতিহাসিক চাষীরা আবাদী জমির পরিমাণ ও উৎপাদন অনেকটা বাড়িয়েছে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে প্রকৃত বিপ্লব দেখা দিল হাল আবিষ্কারের পর। অবশ্য এই যন্ত্রটি হাতে এসেছে বেশ কিছু কাল দেরিতে, তারিখ সঠিক জানা নেই কারণ তাদের কাঠ অনেক দিন আগেই পচে ক্ষয়ে গিয়েছে। তথাপি মিশর, মেসোপটেমিয়া ও অন্যান্য জায়গার চিত্র এবং চিত্রলিপি (pictograph) থেকে প্রাথমিক হালের চেহারা ও ক্রমবিবর্তন সম্বন্ধে অনেকটা জানা যায়। সম্ভবত মধ্যপ্রাচ্যেরই কোথাও প্রথম দেখা দিয়েছে কৃষির এই মূল্যবান উপকরণটি।

দেখতে সহজ সরল হলেও লাঙল মানুষের এক অতি গুরুতর উদভাবন। আদি নবপ্রস্তর চাষীরা চোখা লাঠি দিয়ে মাটিতে গর্ত করে তাতে বীজ রেখেছে। তার পর দেখা গেল এই খনন দণ্ডের মুখটা যদি কোদালের মত বাঁকা হয় তা হলে সোজা মাটি কেটে গিয়ে বীজ বপনের পথ তৈরি করা সম্ভব। কখনও কখনও বাঁকা ডাল বা ছোট গাছ থেকে প্রকৃতির তৈরি জিনিসটি পাওয়া গিয়েছে (চিত্র ৬ঘ), কখনও বা মাটি কাটতে সুবিধার জন্য ক্ষুদ্রতর অংশটির সঙ্গে আর একটি ছোট ডাল বেঁধে নিয়েছে চাষী। পৃথিবীর নানা জায়গায় এই ধরনের খনন দণ্ডের এক উন্নত সংস্করণ দেখা যায়, তার নিচের দিকে দড়ি বেঁধে এক জন টানে, আর এক ব্যক্তি হাতলটি ধরে কর্ষিত খাত সোজা রাখে; এতে কাজ তাড়াতাড়ি হয়, কিন্তু দু জন লোক লাগে। আর একটি সংস্করণ V অক্ষরটির মত দ্বিভক্ত ডাল. সে দুটি হাতল ধরে কৃষক ঠেলে বিপরীত দিকের চোখা অংশটি মাটিতে ঢুকিয়ে। ৩000 বিসি নাগাদ মিশরী চিত্রলিপিতে এই উপকরণটি দেখা যায়, যদিও তখন তা পশুর সঙ্গে জুড়ে গিয়েছে।

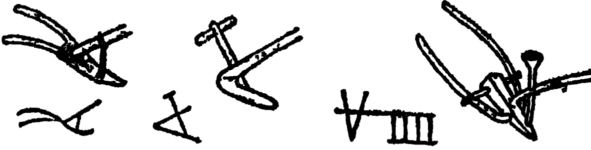
শস্য খেতে হাল ও জন্তুর সংযোগে সূচিত হল এক শিল্প বিপ্লব, অ-মানুষিক শক্তি চালিত যন্ত্রের তা সম্ভবত প্রথম উদাহরণ। আপন দেহ বলের বদলে চাষী কাজে লাগাল পশুর সবলতর পেশী, আগে নিজের হাতে কোদাল বা উন্নত খনন দণ্ড চালিয়ে যতটা পেরেছে, তখন একই সময়ে তার চেয়ে অনেক বেশী জমির

গভীরতর কর্ষণ সম্ভব হল। পশুর শক্তি যোগাতে অবশ্য খাদ্য দরকার, কিন্তু অনেক জায়গায় চরে বেড়াবার মত যথেষ্ট অনাবাদী জমি পড়ে ছিল। (হাল টানা ছাড়া তাদের গোবর খেতের উর্বরতাও বাড়িয়েছে)। মানুষ ও পশুর এই যৌথ উদ্যমে যে অতিরিক্ত খাদ্য পাওয়া গেল তা অন্যান্য পেশাদার কর্মীদের পোষণ করতে পেরেছে যারা ভিন্ন উন্নত সভ্যতা সম্ভব হত না।

লাঙল টানাবার আগে উপযুক্ত জন্তুর নির্বাচন ও প্রশিক্ষণ দরকার হয়েছে। ভেড়া ছাগল দেহে ছোট, তাদের তেমন শক্তি নেই। ঘোড়া অনেক পরে পোষ মেনেছে, তখন অন্যান্য কাজের মধ্যে আধুনিক কাল পর্যন্ত স্থানে স্থানে হাল টেনেছে, যেমন য়োরোপে। মেসোপটেমিয়ায় ৩000 বিসি নাগাদ গাধা খাটানো হয়ে থাকতে পারে এই কাজে, কিন্তু ষাঁড় আরও বলীয়ান, তবে সে দুরন্ত অবাধ্য জন্তু, তাকে হালের সঙ্গে জুতে চালানো সোজা কথা নয়, সুতরাং আগে অণ্ডচ্ছেদ করে বলদ বানানো হল। সেই কাজটা সম্পন্ন হয়েছে ৩১00 বিসির মধ্যেই, শুধু মিশরে নয়, মেসোপটেমিয়ায়ও প্রায় ঐ সময়ের ছবিতে বলদে টানা হাল দেখা যায়। "এই জন্তুগুলি দেখতে অপেক্ষাকৃত ছোট, হয়তো দীর্ঘকালীন কৃত্রিম প্রজননের প্রয়োগে ক্ষুদ্রাকার পশু সৃষ্টি করা হয়েছিল, তাদের স্বভাব আরও শান্ত হবে বলে। সুতরাং বলদ চালিত হাল এই প্রথম নজিরের থেকে বেশ কিছুটা প্রাচীন হতে পারে। তারও আগে অবশ্য মানুষ নিজেই উন্নত ধরনের খনন দণ্ড টেনেছে বা ঠেলেছে।

প্রাথমিক পশুযুক্ত হাল এদেরই বড় ও ভারী সংস্করণ মাত্র, কিন্তু অনতিবিলম্বে তার আরও কিছু উন্নতি হল। ২১00 বিসি নাগাদ ক্রীট দ্বীপের চিত্রলিপিতে হালের মাথায় আড়াআড়ি হাতল দেখা যায়, কৃষক এক হাতেই সেটা ধরে হাল ঠেলতে পেরেছে, অন্য হাতটি মুক্ত থেকেছে পশুদের খোঁচা বা চাবুক মেরে চালাবার জন্য। মেসোপটেমিয়ার চাষীরা হালের নিচের দিকে এক নল জুড়ে হুঁকোর কলকের মত তার মাথার ভিতর বীজ রেখেছে, যাতে কর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে বপনের কাজও হয়ে যায়। সে দেশেরই চিত্রলিপিতে রূপায়িত হয়েছে V আকারের হালের সঙ্গে যুক্ত এক লম্বা দণ্ডের প্রান্তে মইয়ের মত জোয়াল, তার ফাঁক দিয়ে এক জোড়া বলদের মাথা পাশাপাশি ঢুকত। তারও আগে দণ্ডটি যুক্ত হয়েছে পশুর শিঙের সঙ্গে অথবা দুই বলদের শিঙের সঙ্গে বাঁধা এক লাঠির সঙ্গে, যেমন মিশরের এক ছবিতে দেখা যায়। প্রকৃত জোয়াল এই জন্তুর বলিষ্ঠ ঘাড়ের শক্তি কাজে লাগাল। সম্ভবত

তার আগেই এই জোয়াল চাকার গাড়িতে ব্যবহার হয়েছে, হালচাষীরা তারই অনুকরণ করেছে।



চিত্র ২০। বিভিন্ন গড়নের হাল ও তৎসম্পর্কিত চিত্রলিপি: বাঁয়ে মিশর, ৩০০০ বিসি; মধ্যে ক্রীট, ২০০০ বিসি, এতে চাষীর এক হাত যুক্ত, ডাইনে মেসোপটেমিয়ার হালে যুক্ত হয়েছে বীজ ঢালবার নল ও মইয়ের মত জোয়াল (যেমন চিত্রলিপিতে)।

কৃষি শিল্পের উন্নয়নে মিশরীদের দান অগ্রগণ্য, বহু সমাধি চিত্রের বিষয় মাটি ও তার চাষ। কিন্তু এই কাজে একমাত্র নির্ভর নীল নদের বার্ষিক প্লাবন, তার সঙ্গে গাঁথা কৃষকের জীবন। বন্যার জল সরে গেলে আর এক মুহূর্ত সবুর নেই, কারণ প্রখর রৌদ্রে মাটি দেখতে দেখতে শুকিয়ে যাবে, তখন হাল চলবে না। ছবিতে দেখা যায় লাঙলের পথ সহজ করতে সহকারীরা মাটির দলা কুপিয়ে ভাঙছে।

এইখানে উল্লেখ্য কাল মাপতে বর্ষপঞ্জীর উদভাবন, প্রধানত যথা সময়ে বীজ বপনের তাগিদেই এই জরুরী অগ্রগতি ঘটে। এখন বছরের কাল নির্ণয় হয় সৌর বর্ষপঞ্জী বা ক্যালেনডার দিয়ে, তার মানদণ্ড হল সূর্যকে ঘিরে পৃথিবীর পরিক্রমণ। কিন্তু কালের গতির সঙ্গে চাঁদের বৃদ্ধি ক্ষয়ে তার পরিবর্তন প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট, সূর্যে তা নেই, সুতরাং স্বভাবতই প্রথমে মানুষ চান্দ্র মাস দিয়ে কাল মেপেছে। ঐতিহাসিক কালে ব্যাবিলনীয় বর্ষপঞ্জীতে দেখা যায় বছরকে তেরোটি চান্দ্র মাসে ভাগ করে যেন বীজ বপনের সময় নির্ধারণের চেষ্টা, কিন্তু নির্দিষ্ট সংখ্যক চান্দ্র মাস দিয়ে কোনও সৌর ঘটনায় ব্যবধান মাপা যায় না। তা সত্ত্বেও পঞ্জিকা রচনায় চাঁদের প্রভাব যে আমরা কাটিয়ে উঠতে পারি নি তার প্রমাণ আজও মেলে—এবং শুধু অজ্ঞ অনগ্রসর সমাজেই নয়। যিশুর ক্রুশ-মৃত্যু ও পুনরুত্থানের বার্ষিক অনুষ্ঠান ঘুরে ঘুরে আসে বড়দিনের মত নির্দিষ্ট তারিখে নয়, নির্দিষ্ট তিথিতে—চাঁদের অনুশাসন অনুসারে। এই ব্যবস্থায় সংস্কারের সব চেষ্টা এ যাবৎ প্রতিবাদের মুখে ভেসে গিয়েছে। সৌর বর্ষের আবিষ্কার অনুসারে বর্ষ গণনা তাই অনেকটা চিন্তা শক্তি ও বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির

পরিচায়ক এবং মানুষের স্বাভাবিক সংস্কারানুগত্যের পরাজয়। প্রাচীন লিখিত পাঠ থেকে মনে হয় ২৪০০ বছর আগেই মিশরে এই বর্ষপঞ্জীর নিয়মিত প্রয়োগ ছিল।

নীল নদে যে প্রতি বছর একই সময়ে বান ডাকত নীরস তৃষিত মাটিতে নব প্রাণ সঞ্চারের বাণী বহন করে, মিশরের মত কৃষিনির্ভর দেশে তা সংবৎসরের সবচেয়ে গুরুতর ঘটনা এবং কাল গণনার স্বাভাবিক সূচনা বা নববর্ষ। জমির প্রস্তুতি ও বীজ বোনার ব্যস্ততা শুরু হত তখন, এই নিতান্ত ব্যবহারিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মিশরীরা দুই প্লাবনের মধ্যবর্তী দিনের সংখ্যা গুণে রাখতে আরম্ভ করল, বেশ কয়েক বার পর গড় সংখ্যা বার হল ৩৬৫। যদিও আপাত দৃষ্টিতে এই পরিমাপের সঙ্গে জ্যোতির্বিজ্ঞানের অর্থাৎ পৃথিবীর সূর্য পরিক্রমা নিঃসম্পর্কিত, পরোক্ষ সম্পর্ক নিশ্চয় আছে, কারণ যে মৌসুমী মেঘ চলতে চলতে ইথিওপিয়ার পাহাড়ে পৌঁছে ভেঙে প্লাবনের সৃষ্টি করেছে তার নিজের উৎপত্তি পৃথিবীর বার্ষিক গতি থেকে, যার ফলে একই সময়ে বন্যা আসত নীলে। সুতরাং প্রদক্ষিণ কাল অর্থাৎ সৌর বর্ষ জানতে পারলে তবেই প্লাবন তারিখ আগে হিসাব করা সম্ভব।

সৌর বর্ষ থেকে মিশরে প্রথম সৌর পঞ্জীর সৃষ্টি—বছরে তিন ঋতু, প্রতি ঋতুতে চার মাস, প্রতি মাসে ৩০ দিন, সব মিলিয়ে ৩৬০ দিন। হিসাব মেলাতে মিশরীরা পাঁচ প্রধান দেবতার জন্মোৎসবের জন্য জুড়ে দিল পাঁচটি ছুটির দিন। প্রকৃত সংখ্যাটি যে আরও একটু বড়, প্রায় ৩৬৫$\frac{1}{4}$, প্রথম দিকে তা ধরা পড়ে নি, সুতরাং সংশোধনের (যেমন প্রতি চার বছরে এক দিন যোগ করে) কথা মনে হয় নি; তার প্রয়োজনও ছিল না, কারণ এই সামান্য পার্থক্যে চাষীদের খুব একটা অসুবিধা হয় নি, নীলের স্ফীতিও তো প্রতি বছর একেবারে একই দিনে ঘটত না। কিন্তু বর্ষপঞ্জীর ভুল একটু করে বাড়তে বাড়তে যখন ঋতুর সঙ্গে অমিল বেশী প্রকট হয়ে উঠল, তখন মিশরীরা নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ করলে গ্রহাকাশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ স্থাপন করে; বন্যার অব্যবহিত আগে লুব্ধক তারা (সিরিয়াস, মিশরী নাম সথিস) যে ঠিক উষার পূর্ব লগ্নে দিগন্ত ছুঁয়ে দেখা দিত তা তারা লক্ষ্য করেছে, সুতরাং বর্ষপঞ্জীর নিয়মনে আকাশের এই নির্ভরযোগ্য নিশানা গৃহীত হল। গজদন্তের পটে এক লিখিত পাঠে লুব্ধককে "নববর্ষ ও বানের অগ্রদূত" বলে স্বাগত জানানো হয়েছে দেখা যায়, এই নক্ষত্রের নির্দেশ অনুসারে সংশোধিত পয়লা তারিখে (আমাদের ১৯ জুলাই) কৃষির কাজ শুরু হত, যদিও সাবেক

সরকারী বর্ষপঞ্জীটিও প্রচলিত থাকল। দিন ফুরিয়ে গেলেও তো সরকারী ফতোয়া বা লোকাচার সহজে মরে না।

ঐতিহাসিক কালে, মিশরে ও অন্যত্র, বর্ষ গণনায় ও পঞ্জিকা প্রবর্তনে রাজা ও শাসক গোষ্ঠীর প্রভাব স্পষ্ট। এমন ধারণা প্রকাশ করা হয়েছে যে তারা রাজকীয় ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিল পঞ্জিকার সাহায্যে. নীলের বানের মত বার্ষিক ঘটনার তারিখ বলতে পেরে। মিশরে হয়তো নতুন নির্ভুল বর্ষপঞ্জী প্রজাদের কাছে গোপন রেখে তাদের চোখে রাজার 'ঐশী শক্তি' বাড়াবার চেষ্টা হয়েছে, এমন জল্পনাও দেখা যায়। অবশ্য রাজার মনও নিশ্চয় সংস্কারমুক্ত ছিল না, সে নিঃসন্দেহে ভাবত সথিস দেব উদিত হয়ে বন্যাকে হুকুম করেন হাজির হতে। এই ধরনের বোধবিকার থেকেই ছদ্ম জ্যোতিষ বা অ্যাসট্রলজির উদ্ভব।

যাই হক, মিশরে সৌর পঞ্জীর সৃষ্টি বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক বৃহৎ পদক্ষেপ। হিরডটাস স্বীকার করেছেন যে এখানে তারা গ্রীসীয়দের উপরেও টেক্কা দিয়েছে। বিজ্ঞান যে ভবিষ্যৎ বলে দিয়ে আমাদের উপকার করতে পারে আজ তা আমরা নানা ভাবে জেনেছি—বৈজ্ঞানিক ভবিষ্যদ্‌বাণীর উদাহরণ এই প্রথম। আজ যে বর্ষপঞ্জী আমরা ব্যবহার করি তা এরই সাক্ষাৎ বংশধর।

মিশর ও পশ্চিম এশিয়া থেকে হাল ক্রমশ বিস্তৃত হল য়োরোপ, উত্তর আফ্রিকা ও এশিয়ার অন্যত্র। ভারতীয় উপমহাদেশে সিন্ধু সভ্যতায় অর্থাৎ মিশর ও মেসোপটেমিয়ার অল্প পরেই তার আবির্ভাব হয়েছে, চীন দেশে আরও দেরিতে, সুইডেনের পাথর পটে কেউ হালের ছবি উৎকীর্ণ করেছিল খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রকের মাঝামাঝি। সাধারণত লোক মুখে দিকে দিকে লাঙলের খবর পৌঁছে থাকলেও কোথাও কোথাও খনন দণ্ড থেকে তার স্বাধীন আবিষ্কারও অসম্ভব নয়। এখনও অনুন্নত দেশগুলিতে কৃষির প্রধান নির্ভর যে পশুযুক্ত হাল, আদি কাল থেকে তার মৌলিক পরিবর্তন কিছু হয় নি, পাশ্চাত্ত্য অঞ্চলেও বিশেষ শ্রেণীর কর্ষণে ট্র্যাক্টরের বদলে তা বেশী উপযুক্ত। আজকের লাঙলে অবশ্য কিছু আনুষঙ্গিক উন্নয়ন হয়েছে, এটা সেটা বদলে বা যোগ করে সম্ভব হয়েছে কাটা মাটি এক পাশে সরিয়ে রাখা অথবা উলটে ফেলা, যাতে বাতাস ঢোকে এবং একই সঙ্গে আগাছাও মাটির নিচে চাপা পড়ে, কখনও বা হালের সামনে একটি

চাকা লাগিয়ে তার মুখ বেশী গভীরে না ঢোকে তার ব্যবস্থা। এ সব অবশ্য এ কালের কথা, সে কালে ধাতু আবিষ্কারের পর হালের মুখে তা বসিয়ে যন্ত্রটির কার্যকারিতা ও স্থায়িত্ব বাড়ানো হয়েছে। হাল-কর্ষিত খেতের বর্ধিত ফসল কাটতেও ধাতুর কাস্তে সহায় হল, প্রথমে তা তৈরি হয়েছে তামা বা কাঁসা দিয়ে—লোহার তখনও চলন হয় নি। পোড়া মাটি বা চকমকির প্রাচীন উপাদানটির চেয়ে অনেক যোগ্যতর এই কাস্তে সুমেরে সম্ভবত ৩০০০ বিসির মধ্যেই ব্যবহার হয়েছে।

সমাজেও হাল আবিষ্কারের প্রভাব পড়েছে। কৃষির কাজ তখন মেয়েদের থেকে প্রধানত পুরুষদের হাতে চলে এল। আদিবাসীদের মধ্যে অনেক জায়গায় আজও মেয়েরা কোদাল কোপায়, পুরুষরা করে লাঙল চালনার কঠিনতর কাজ। যন্ত্রটির উদভাবনের আগে উদ্ভিদ ও পশু মানুষের জীবনে অনেকটা পৃথক ও বিচ্ছিন্ন স্থান অধিকার করে ছিল, নিরামিষ ও আমিষ খাদ্য যুগিয়েছে তারা, এখন পশু তার পেশীর জোরে উদ্ভিজ্জ আহার্যেরও উৎপাদন বাড়াল। হাল-বাহক জন্তুরও অবশ্য ভক্ষ্য বস্তু উদ্ভিদ। মানুষ, পশু ও উদ্ভিদ পারস্পরিক নির্ভর সূত্রে ঘনিষ্ঠ ও অচ্ছেদ্য বন্ধনে সংযুক্ত হয়েছে সে দিন থেকে। এখানে স্মরণযোগ্য যে নবপ্রস্তর যুগের প্রথম দিকে কৃষি ও পশুপালন সর্বত্র একত্র উপস্থিত ছিল না, কোথাও কোথাও ছিল স্বাধীন স্বতন্ত্র কৃষক বা পালক সম্প্রদায়।

মাটির দান শুধু গম যব ধান বা ভুট্টার মত প্রাথমিক শস্য নয়, পরবর্তী কালে নানা রকম ফল থেকে লোকের খাদ্যে বৈচিত্র্য বেড়েছে. অন্যান্য উদ্ভিদ জীবন সহজ ও সমৃদ্ধ করেছে। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ সহস্রকে আঙুর খেজুর জলপাই ডুমুর ছাড়াও মধ্য-প্রাচ্যে আপেল ডালিম পিচ তুঁত ইত্যাদির ফলন হয়েছে। ঐ সময়ের মধ্যেই আঙুর শুকিয়ে কিশমিশ বানানো হত, এবং মিশর, সিরিয়া ও প্যালেসটাইন অঞ্চলে আঙুরের রস থেকে সুরা তৈরি হয়েছে। খেজুরের ফলন হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের নানা স্থানে. যেমন মিশর, সিরিয়া ও দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ায়—সেখানে তার ছিল নানা জাত। মহেনজোদারোতেও খেজুরের বিচি পাওয়া গিয়েছে। জলপাই গাছ লাগিয়ে তার ফল থেকে তেল নিষ্কাশন করেছে অধিবাসীরা, ক্রীটের রাজপ্রাসাদে এই তেল রক্ষণের প্রকাণ্ড জালার সমষ্টি নির্দেশ করে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রকের আদি অংশে রাজ সম্পদের কিছুটা এসেছে ঐ তেলের রপ্তানি থেকে। জলপাইর তেলে ঘরে ঘরে রান্না হয়েছে, দীপ জেলে আলো পাওয়া গিয়েছে। গ্রীস ও ইটালি এখন

জলপাইর জন্য বিখ্যাত, কিন্তু তারা গাছটির জন্মভূমি নয়, পূর্বাঞ্চল থেকে কয়েক শো বছর পরে এনে তাদের ঐ জলবায়ুতে অভ্যস্ত করা হয়েছে। তিসির বীজ থেকেও অবশ্য তেল পাওয়া যায়, এই তরুর চাষ হয়েছে বস্ত্র শিল্পের তাগিদে। আমরা দেখেছি প্রথমে তিসির বাকলের আঁশ থেকে লিনেনের কাপড় তৈরি হয়েছে, পরে তুলারও চাষ হয়েছে। সুতরাং খাদ্য, তৈল ও বস্ত্র দিয়েছে উদ্ভিদ।

১১। চক্র বিপ্লব

বনের পশুকে ঘরে এনে মানুষ প্রথমে পেল মাংস ও দুধ, পরে লাঙলের সঙ্গে জুতে মাঠের শস্যও বাড়িয়েছে। কিন্তু তাই সব নয়, ঐতিহাসিক কালের কাছাকাছি এসে যেমন কৃষির উন্নতি ঘটাল জলসেচ ও হাল, তেমনি পালিত পশুর ব্যাপকতর প্রয়োগও দেখা যায়। হাল টানার মতই ভার বয়ে, মানুষের বাহন হয়ে এবং সর্বোপরি তার গাড়ি টেনে এই নির্বাক বন্ধুরা তার শ্রম অনেকখানি লাঘব করেছে।

পোষা জানোয়ারের পিঠে মোট চাপিয়ে যে নিজের ভার হালকা করা যায়, হয়তো বোঁচকার পাশে নিজেও চড়ে বসা যায় এ বুদ্ধি সম্ভবত প্রথম খেলেছিল সে কালের যাযাবর সম্প্রদায়ের মধ্যে। স্থল পথের বাণিজ্য সে দিন গড়ে উঠেছিল পশুর পিঠে। কি সেই পশু? নবপ্রস্তর যুগে গরুকে এ কাজে লাগানো হয়েছে কিনা জানা নেই, তবে ইতিহাসের শুরু থেকে পশ্চিম এশিয়া ও মিশরে মোট বওয়াতে ও চড়তে গাধা এত বেশী ব্যবহার হয়েছে যে মনে হয় আদিতম ভারবাহীর সম্মানটা তারই প্রাপ্য। আজ ও সব অঞ্চলে উটের প্রয়োগও খুব ব্যাপক, গাধার সমকালেই সেও ভার বয়ে থাকতে পারে।

মানুষের প্রথম স্থলযান স্লেজ, চাকা আবিষ্কারের বহু হাজার বছর আগে মধ্য-প্রস্তর য়োরোপে তা ব্যবহার হয়েছে, টেনেছে কুকুর অথবা মানুষ নিজে উত্তরাঞ্চলের তুষারাবৃত ক্ষেত্রে পায়ে স্কি লাগিয়ে—এই স্কি ও স্লেজ আজও চলছে। নবপ্রস্তর যুগে স্লেজ টানতে গরু বলদ ব্যবহার হয়ে থাকতে পারে মুক্ত মরু প্রান্তরে; পশুর চামড়া, কাঠ বা গাছের বাকল ছাড়া গাছের গুঁড়ি খুবলেও তা তৈরি হয়েছে হয়তো আরও প্রাচীন কালে ক্যানু জাতীয় শালতির মত। পশুর সঙ্গে যে জোয়াল জুতে হাল টানানো হয়েছে তা স্লেজের সঙ্গেও জোড়া যায়। পশ্চিম এশিয়ায় ৪০০০ বিসির আগেই যে স্লেজ জানা ছিল তা প্রায় নিঃসন্দেহ এবং এও জানা যায় যে চাকা আবিষ্কারের পরও ঐ অঞ্চলে এই শকটের চলন বন্ধ হয়ে যায় নি। ঐতিহাসিক কালের 'আর' রাজ্যের রাজার শব সমাধি স্থলে আনা হয়েছে বলদে টানা স্লেজ

গাড়িতে। যান বাহনের মূল কথাটি ও অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হল চলা ফেরায় নিজের শক্তি ক্ষয় না করে অন্য কিছুর শক্তি ব্যবহার করা—এই চেষ্টায় বাষ্প ও তেল চালিত বিবিধ এনজিনের পর আজ রকেট আমাদের হয়ে যা করছে দূর কালে কুকুর বা গরু দিয়েই তার সূচনা।

স্লেজের পরবর্তী ধাপ চাকা—ধাপ নয়, মস্ত লাফ। আজ গরুর গাড়ি যতই হীন হক তারও আছে চাকা, আবার আমাদের মোটর গাড়ি রেল গাড়ির নিচেও তাই। এবং বহন ছাড়াও চাকার অন্য ব্যবহার আছে—ক্ষুদ্র হাতঘড়ি থেকে বিশাল কল কারখানা চালাচ্ছে চাকা। এ পর্যন্ত মানুষের ইতিহাসে একের পর এক অনেক আশ্চর্য আবিষ্কার ও উদভাবনের আলোচনা আমরা করেছি, কিন্তু তাদের মধ্যে কয়েকটি যেন ভাগ্যের বিশেষ দান, মানুষের জীবন ধারা ও ভাবনায় তারা আমূল পরিবর্তন এনেছে। এই শ্রেণীর প্রথম দান আগুন, তা হাতে পেয়ে মানুষের ক্ষমতা কতখানি বাড়বে তা জানতেন বলেই অলিম্পাসের দেবতারা পর্যন্ত শঙ্কিত ছিলেন, প্রমিথিউসের এমন সাজা হল মানুষের হাতে তা তুলে দেওয়ার জন্য। এর তুল্য অন্য যুগান্তকর আবিষ্কার কৃষি—এবং তার পরেই চাকা। এর মধ্যে এই শেষ আবিষ্কারেই কৃতিত্ব সবচেয়ে বেশী, আগুন জ্বালতে শিখবার আগেও তার সঙ্গে মানুষের পরিচয় ছিল, বীজ বুনবার আগে সে দেখেছে গাছ গজাতে, বুনো শস্য সংগ্রহ করেছে—প্রকৃতি যেন এ সব রহস্য তার চোখের সামনে নাচাচ্ছিল বহু সহস্র বছর ধরে, এক দিন তা উদঘাটিত না হয়ে উপায় ছিল না; সে উদঘাটনও কেমন করে সম্পূর্ণ আকস্মিক ভাবে ঘটে থাকতে পারে তা আমরা আগে দেখেছি। কিন্তু চাকার সঙ্গে মানুষের কোনও রকম পরোক্ষ পরিচয়ও ছিল না, তা উদঘাটন নয় উদভাবন, প্রায় সম্পূর্ণ ভাবনার সৃষ্টি, যদিও গাছের গুঁড়ি গড়িয়ে ভারী জিনিস সরানোর কৌশল বোধহয় আগেই জানা ছিল। এই ধরনের সৃষ্টি পরে যতই সহজ ও সাধারণ মনে হক, তার প্রথম পরিকল্পনা প্রভূত প্রতিভার দরকার করে। সে কালের কোনও এক অজ্ঞাত অখ্যাত ব্যক্তির মাথায় সম্ভবত তা মূর্তি পেয়েছিল একদা, আজকের দিন হলে তার নাম চির কালের জন্য অমর হয়ে থাকত ইতিহাসে, শ্রেষ্ঠ সম্মান ও পুরস্কার বর্ষিত হত তার উপর।

চাকার উদভাবন ৩৫০০ বিসি নাগাদ, লিখন আবিষ্কারের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে, দুটিই সুমেরীদের যুগান্তকর কীর্তি। বিশেষণটি আক্ষরিক অর্থে সত্য, কারণ লেখা

দিয়ে ঐতিহাসিক কালের সূচনা, দীর্ঘ প্রস্তর যুগের সমাপ্তি। মনে হয় চাকা প্রথমে ব্যবহার হয়েছে কুমোরের ঘরে গোল পাত্র গড়তে, কিন্তু অবিলম্বে প্রযুক্ত হয় স্লেজের সঙ্গে জুড়ে গাড়ি বানাতে। আবার বিপরীত মতও দেখা যায়, যাই হক ৩০০০ বিসির আগে সাধারণ ভাবে চক্রযানের চলন হয় নি। কাঠের চাকা সহজেই পচে ক্ষয়ে নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু কুমোরের চাক পাত্রের গায়ে যে রেখা এঁকে রাখে তা প্রায় অক্ষয় সাক্ষী। প্রথম চাকাগুলি সম্ভবত ছিল গোল গাছের গুঁড়ি থেকে কাটা এক খণ্ড কাঠ, কিন্তু সে রকম কিছুর সন্ধান মেলে নি। যা জানা আছে তা তিনটি তক্তা জুড়ে তৈরি—দুটির আকার অর্ধবৃত্ত, মাঝখানে আর একটি লম্বাটে চতুষ্কোণ খণ্ডের সঙ্গে তারা কাঠের ফালি দিয়ে জোড়া। পরে এই কাঠের বাঁধুনির বদলে ব্যবহার হয়েছে ধাতুর ফলক। আরও পরে চাকা মার্জিত ও শক্ত হয়েছে তার প্রান্তে তামার পাত বা পেরেক বসিয়ে, ফলে তার আয়ু বাড়ল। ভিতরে কোনও ফাঁক না থাকায় সে কালের চাকা অবশ্য আজকের তুলনায় অনেক ভারী ছিল।

সুমেরে উরুক শহরের এক মন্দিরে চক্রযানের এক আদিতম নজির পাওয়া যায়—হিসাবের দলিলের সঙ্গে অঙ্কিত একটি চিত্রলিপিতে দেখা যায় স্লেজের সঙ্গে চাকা জুড়ে উন্নত পরিবহণ সৃষ্টি হয়েছে। সুমেরীরা যে দু চাকার ও চার চাকার শকট বানিয়েছে তার প্রমাণ আছে মৃৎপাত্রে বা প্রাচীর গাত্রে আঁকা ছবিতে। কোনও কোনও কবরে মাটি, তামা ও কাঁসার তৈরি ছোট ছোট গাড়ির নমুনা এবং 'আর' রাজ্যের রাজকীয় সমাধিতে বাস্তবিক বস্তুটির অবশিষ্টাংশ পাওয়া গিয়েছে। মিশরে চক্রযান এসেছে মাত্র ১৬৫০ বিসিতে, বিদেশী হানাদারদের সঙ্গে। সিন্ধু তীরে মহেনজোদারো-হরপ্পা সভ্যতা খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রকেই যখন পূর্ণবিকশিত তখন নিরেট চাকার গরুর গাড়ি তার অতি সাধারণ অঙ্গ, এবং যারা এই সভ্যতার পত্তন করেছিল তাদের পূর্ব ইতিহাস সঠিক জানা নেই। খুব সম্প্রতিও সিন্ধু প্রদেশের গ্রামাঞ্চলে (তা ছাড়া সার্ডিনিয়া ও তুরস্কেও) যে গরুর গাড়ি দেখা যেত তা ঠিক এই রকম, মহেনজোদারোর দিন থেকে প্রায় ৪৫০০ কাল অতিক্রম করে চলে এসেছে একই ধারা।

যে আর্যদের আগমনের সঙ্গে ভারতে সিন্ধু সভ্যতার অবসান ঘটল তাদের ইনদো-য়োরোপীয় পূর্বপুরুষরাও যে গাড়ি ব্যবহার করেছে তা জানা যায় আর্য-

ভাষাজাত বিভিন্ন আধুনিক ভাষায় গাড়ি সংক্রান্ত শব্দের সাদৃশ্য লক্ষ্য করে; এই সাদৃশ্যের থেকে বোঝা যায় যে শব্দগুলি একই মৌলিক শব্দের ধ্বনিবিকার মাত্র, যে শব্দটি ব্যবহার হয়েছে ইনদো-য়োরোপীয়দের আদি বাসভূমিতে, তারা বিভিন্ন দিকে ভাগাভাগি হয়ে পড়বার আগে। যেমন সংস্কৃত অক্ষ (উচ্চারণ অক্‌ষ) আর ইংরেজি axle শব্দের ধ্বনি অনেকটা এক রকম, তার ইঙ্গিত এই যে এদের পিছনে কোনও একটি ইনদো-য়োরোপীয় শব্দ ছিল, সুতরাং ইনদো-য়োরোপীয়দের অক্ষের সঙ্গে পরিচয় ছিল। সংস্কৃত রথ শব্দের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় ল্যাটিন rota এবং প্রাচীন জার্মেনীয়, সেল্‌টীয় ও স্লাভ ভাষায়। গাড়ি সংক্রান্ত এই রকম ইনদো-য়োরোপীয় শব্দের আর দুটি ইংরেজি প্রতিশব্দ হল wheel এবং yoke, যাদের ইনদো-য়োরোপীয় প্রতিশব্দ (ইংরেজি হরফে) qeqlo এবং yog; yoke শব্দের প্রতিধ্বনি সংস্কৃত যোগ শব্দে, nave শব্দের নাভিতে। এই সব শব্দ তুলনা করলে ইংরেজিকে অত বিদেশী বা সংস্কৃত কি হিন্দিকে অত স্বদেশী ভাষা বলে আর মনে হয় না।

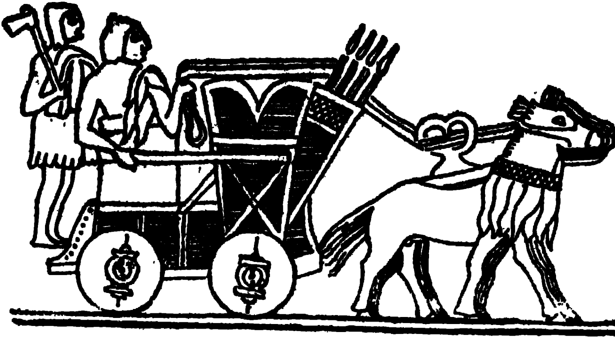
ভাষার তুলনা থেকে তাদের আদি সামাজিক যে চিত্রটি আমরা পাই এই প্রসঙ্গে সে সম্বন্ধে দু কথা বলা যেতে পারে। ইনদো-য়োরোপীয়দের আদি নিবাস কিছুটা রহস্যময়, সম্ভবত মধ্য এশিয়ার কোথাও; এই প্রশ্নের অনুসরণেও ভাষা ছাড়া আর কোনও নিশানা আমাদের নেই, আদি বাসভূমিটা অনুমান করে নিতে হবে ভূগোল জলবায়ু বা পশু ও উদ্ভিদ সংক্রান্ত যে সব কথা তাদের ভাষাযুক্ত বলে চেনা যায় তার থেকে। সাবেক ঘর যেখানেই হক সেখানকার সামাজিক গার্হস্থ্য চিত্রটিই প্রধান কৌতূহলের বস্তু। ইংরাজি cow ও সংস্কৃত গো শব্দের সাদৃশ্য অতীব স্পষ্ট, আদি ইনদো-য়োরোপীয় শব্দটি gwou; এমনি আরও বিবিধ সমধ্বনি শব্দ থেকে জানা যায় যে গরু ছাড়াও ভেড়া ছাগল শুয়োর কুকুর ঘোড়া এবং হাঁস ছিল তাদের ঘরে। দুধ পশম বয়ন শিল্প চাষ শস্য রুটি ঈস্ট কুড়াল (সংস্কৃত পরশু, তাদের peleku) ইত্যাদির প্রতিশব্দ মেলে, তেমনি গাড়ি ও গাড়িতে বহন সংক্রান্ত শব্দের। সংস্কৃত, গ্রীসীয় ও অন্যান্য ইনদো-য়োরোপীয় শাখার তুলনায় এমনি জানা যায় যে শাখা বিভাগের আগেই সমাজে ছুতোরের পেশা আলাদা হয়ে গিয়েছিল—সব সকম কারিগরের মধ্যে একমাত্র সূত্রধরের নামই ঐ সব ভাষাতে এক শব্দ হ্রাত। বরফ (sneighw) ও নদীর সঙ্গে তাদের পরিচয় ছিল,

কিন্তু সমুদ্রের সঙ্গে নয় (ক্যাস্‌পিয়ান সাগর আসলে নোনা হ্রদ)। বাড়ির চালে খড় ব্যবহার হয়েছে। ঐহিক রাজা মহারাজা (ল্যাটিন rex, magnus rex) শব্দের পাশাপাশি পারত্রিক ঈশ্বর (ghutom, যার থেকে God), দেব (ল্যাটিন deus) এবং প্রার্থনা শব্দের প্রতিশব্দ মেলে। মাতা পিতা দুহিতা ইত্যাদি কিংবা এক দুই থেকে শত পর্যন্ত বিবিধ সংখ্যার মিল এত সুপরিচিত যে তার উল্লেখ বাহুল্য। দেখা গিয়েছে যে বিভিন্ন ভাষার একই শব্দের এই ধ্বনিবিকার কিছু কিছু সুনির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলে— তা না হলে অবশ্য মূল শব্দটি উদ্ধার করা সম্ভব হত না; এই গবেষণার ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য জার্মেনির অধিবাসী দুই ভাই, ইয়াকব ও হ্বিল্‌হেল্‌ম গ্রিম, অধিকাংশ লোক যাঁদের বিশ্ববিখ্যাত রূপকথার রচয়িতা বলেই জানে। ইনদো-য়োরোপীয়রা কোন পথে দিকে দিকে বিস্তৃত হয়েছে বিভিন্ন ভাষার বিচার থেকে তারও নির্দেশ পাওয়া যায়; পশ্চিমে য়োরোপের সীমান্তে আয়ার্ল্যানডে, দক্ষিণে ভারতের তেলুগু ভাষাতে পর্যন্ত এই প্রভাব দেখা যায়। এ অধ্যায়ে আলোচ্য কালের তুলনায় ইনদো-য়োরোপীয়দের এই বিক্ষিপ্ত ও শাখা-বিভাগ অবশ্য অনেক সাম্প্রতিক, তা যখন ঘটেছে তখন মিশর ব্যাবিলনিয়া অ্যাসিরিয়ার প্রসিদ্ধ সভ্যতা সুপ্রাচীন।

চাকার আলোচনা করতে গিয়ে আমরাও এদেরই মত অনেক দূরে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছি, এ বার প্রাক্তন প্রসঙ্গে ফিরে যাওয়া দরকার। প্রথম যানগুলিতে সুমেরীয়া চামড়ার ফালি দিয়ে চাকা জোড়ার অক্ষটি গাড়ির নিচে বেঁধেছে, তা খোলা যেত মনে হয়। তার ইঙ্গিত এই যে জমির অনেকাংশ গাড়ি চলার অনুপযুক্ত ছিল এবং দরকার হলে গাড়ির অংশগুলি খুলে হাতে বা গরুর পিঠে চাপিয়ে নিচু জলা জায়গা বা উঁচু নিচু রুক্ষ ভূমি পার হয়ে আবার জোড়া হয়েছে। তা ছাড়া, চার চাকার গাড়ি তখনও এ দিক ও দিক ঘোরানো সহজ ছিল না, তা সম্ভব হয়েছে অনেক পরে। আদি কালে গাড়ির প্রচলন ও উন্নতি ব্যাহত হয়েছে উপযুক্ত পথের অভাবে, য়োরোপে লৌহ যুগের প্রবেশ পর্যন্ত সেখানে চক্রযান বিরল ছিল। তথাপি অমার্জিত প্রাথমিক চাকাও সর্বত্র চাষী, বণিক ও পর্যটকদের মস্ত সহায় হয়ে দাঁড়াল। বলদ বা গাধা পিঠে করে বা স্লেজে চাপিয়ে যতটা মাল বয়েছে তার তিন গুণ টানা সম্ভব হল কাঠের জোয়াল দিয়ে তাকে চাকার গাড়িতে জুতে। শুধু তার বহন নয়, মানুষেরও বাহন হল পালিত পশু—ক্রমে ঘোড়ার রথ বানিয়ে যুদ্ধে গেল সে, অথবা

তার পিঠে চেপে বসল।

ঘোড়ার স্বাভাবিক দেশ মধ্য এশিয়ার প্রান্তর ভূমি থেকে পালিত পশুটি প্রায় ৫০০ বছর পরে মধ্যপ্রাচ্যে এসেছে ২৫০০ বিসি নাগাদ. এই দ্রুতগামী দূরগামী জন্তু যে সেখানে শহর সভ্যতা গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে তা সহজেই অনুমান করতে পারি। সম্ভবত ঘোড়া প্রথমে ব্যবহার হয়েছে মালবাহী শকটে জুতে, পরে যুদ্ধ রথ টানতে এবং ১৫০০ বিসির মধ্যে সে মানুষেরও বাহন হয়েছে। পশ্চিম এশিয়ার আর্য জাতি হিটাইটরা সম্ভবত যুদ্ধ রথে প্রথম ঘোড়া ব্যবহার করেছে, ভারতেও আর্যরা তাকে এনেছে অশ্ব রথে ১৫০০ বিসি নাগাদ। মিশরে চক্রযানের সঙ্গে ঘোড়ার আমদানি ১৬৫০ বিসিতে, সেখানে এবং পশ্চিম এশিয়ায় রথ টানা ছাড়া তার আর কোনও নজির নেই। রথে যুক্ত অশ্ব জাতীয় কোনও জন্তু সুমেরী স্মৃতি মন্দিরের দেয়ালে আঁকা হয়েছে ৩০০০ বিসিতে কি তারও আগে, কিন্তু তাকে চেনা



চিত্র ২১। সুমেরী যুদ্ধ রথ।

সহজ নয়—কেউ বলেন ঘোড়া, কেউ বলেন খচ্চর, কারও কারও মতে তা এশিয়ার বুনো গাধা অনাজার। এখানকার ও স্থানান্তরের ছবি দেখে মনে হয় যে শারীরিক বিভেদ সত্ত্বেও প্রথম দিকে বলদ জুতবার কাঠামোটাই সরাসরি ঘোড়ার কাঁধে চাপানো হয়েছে, ফলে সে বেচারার যে দুর্ভোগ বেড়েছে ও কার্যক্ষমতা কমে গিয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। তা সত্ত্বেও এই দুর্গতির শেষ হয়েছে মাত্র খ্রীষ্টীয় নবম

শতাব্দীর কাছাকাছি, ঘোড়ার জন্য পৃথক গলাবন্ধ আবিষ্কারের পরে।

জলযান তৈরি এবং তাতে করে চলাফেরা অনেক সহজ ও অল্প ব্যয়সাপেক্ষ, সুতরাং প্রাগৈতিহাসিক আমল থেকে অপেক্ষাকৃত সম্প্রতি পর্যন্ত যেখানে সম্ভব হয়েছে সেখানেই মানুষ ও তার মাল স্থলের বদলে জলে ভ্রমণ করেছে। ইরাকের নদী জোড়া ও মিশরে নীল নদে ভেসে বাণিজ্য জমে উঠেছে ইতিহাসের উষায়, সুমের ও ব্যাবিলনের ঘাটে ঘাটে এসে ভিড়েছে চামড়া ও কাঠের তৈরি পণ্যবাহী ভেলা, আবার মিশরীরা প্রথম নৌকা বানিয়েছে প্যাপাইরাসের নল দিয়ে।

এই সব জলযান অবশ্য আকস্মিক নতুন আবিষ্কার নয়, তাদের সূত্র অনুসরণ করা যায় অন্তত মধ্যপ্রস্তর কাল পর্যন্ত। সে সময়ে শেষ তুষার যুগের অবসানে বরফ গলে য়োরোপে প্রচুর হ্রদ, বিল ইত্যাদি সৃষ্টি হয়েছিল, মাছ ও জলের পাখি শিকারের প্রয়োজনে গাছের গুঁড়ি খুবলে ক্যানু বা শালতি এবং চামড়া দিয়ে চ্যাপটা গোল ভেলা বানানো হয়েছে (যদিও ঘষা পাথরের কুড়াল ও অন্যান্য যন্ত্র সৃষ্টির আগে শালতি তৈরি সহজ হয় নি), স্থলে স্লেজ ও জলে এই সব যান চলেছে। কাঠ ও চামড়া পচে ক্ষয়ে যায়, তবু মধ্যপ্রস্তর য়োরোপ থেকে ক্যানু ও বৈঠার অবশিষ্ট কিছু পাওয়া গিয়েছে; পাথর খুদে কেউ এঁকেছিল চামড়ার ভেলা, সেই ছবি এখনও অক্ষত। আজও এই সব জলযান চলছে, যথা দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে ক্যানু, সুমেরু সাগরে চামড়ার ভেলা। নবপ্রস্তর আমলে মিশরীরা তাদের অপর্যাপ্ত প্যাপাইরাস কাজে লাগিয়েছে জলে ভাসতে, হালকা নলগুলি পাশাপাশি বেঁধে দুই মাথা সরু করে উপর দিকে তুলে দিয়েছে। কংগো দেশে গাছের গুঁড়ি ভাসিয়ে চলেছে লোকে, মেসোপটেমিয়ায় নল ও গাছের অভাব বলে প্রধানত ব্যবহার হয়েছে চামড়া, তা কাঠামোর সঙ্গে জুড়ে ভিতরে বাতাস ভরে ফুলিয়ে, এই ধরনের ফোলানো ভেলা পূর্ব এশিয়ায়ও দেখা যায় ৩০০০ বিসি নাগাদ। নলের ভেলার ছোট ছোট নমুনা পাওয়া গিয়েছে মিশরে, তাদের গায়ে রঙিন দাগ এঁকে দড়ির বাঁধন নির্দেশ করা। সে দেশে ঘট ও কুম্ভের গায়েও এই জলযানের ছবি দেখা যায়।

তার পর আদি ঐতিহাসিক কালে মিশরীরা যখন লেবানন থেকে কাঠ এনে তা দিয়ে নৌকা বানাল তখনও নল-যানটির বহিরাকৃতি অনুকরণ করেছে তারা, তবে এই সব তরীর ভিতরটা ঢালু ও গভীর বলে কাঠ নলের চেয়ে ভারী হলেও তারা

জলে ভাসে, তারা প্রকৃত নৌকা। এই আদি সভ্য যুগে মেসোপটেমিয়াতেও লোকে কাঠের নৌকা বানাতে শিখল। এ সব যান যে শুধু নদী পথে চলাফেরা করেছে তা নয়, সাহস করে সাগরেও এগিয়েছে। নবপ্রস্তর যুগে ভূমধ্য সাগরের দ্বীপগুলি থেকে জল পথে অবসিডিয়ান রপ্তানি হত এবং ডেনমার্কে এ যুগের আবর্জনা স্তূপে গভীর সমুদ্রচর মাছের কাঁটা সাক্ষ্য দেয় যে জেলেদের জন্য সাগরগামী পোত তৈরি হয়েছে —হয় চামড়ার ভেলা, নয়তো শালতি; অবশ্য য়োরোপে নবপ্রস্তর যুগের প্রবেশ অনেকটা সাম্প্রতিক। অসট্রেলিয়ায় মানুষের প্রথম আবির্ভাব সম্বন্ধে জল্পনা আছে যে প্রকৃত তক্তার নৌকা সৃষ্টির আগেই হয়তো ভেলা বা শালতি দূর দরিয়া পেরিয়ে সেখানে পৌঁছেছিল আজ থেকে ৩০,০০০ বছরেরও আগে, কিন্তু তার নির্ভরযোগ্য নজির কিছু নেই। সাধারণ বিশ্বাস অনুসারে দূর সাগরগামী নাও তৈরি হয়েছে বড়জোর ৮০০০-১০,০০০ বছর আগে, অর্থাৎ নবপ্রস্তর যুগের সূচনায়।

এই প্রসঙ্গে নরোএজীয় বিজ্ঞানী টুর হেআরডাল অনুষ্ঠিত তিনটি সাগরাভিযান উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৭ সালে তিনি ও তাঁর পাঁচ সহকর্মী হালকা বালসা কাঠের এক ভেলায় চড়ে পেরু থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে পলিনেশিয়ায় পৌঁছেছিলেন, কন্-টিকি নামক এই ভেলাটি আজ বিশ্ববিখ্যাত—তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল প্রমাণ করা যে দক্ষিণ আমেরিকার আদিবাসী অভিযাত্রীরা এ ভাবে পলিনেশিয়ার দ্বীপগুলি আবিষ্কার করে প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করে। পরে হেআরডাল বানালেন প্যাপাইরাস নলের নাও, ১৯৭০ সালে রা-২ নামক নল-নৌকায় চড়ে উত্তর আফ্রিকা থেকে তিনি ও সহযাত্রীরা পৌঁছালেন ওএস্ট ইন্ডিজে বারবেডোজ দ্বীপে আর এক তত্ত্ব প্রমাণ করতে যে দক্ষিণ আমেরিকায় যে পিরামিড স্থাপত্য দেখা যায় সেই বিদ্যা এনেছিল মিশরীরা অনুরূপ নৌকায় চড়ে অতলান্তিক অতিক্রম করে। (কন্-টিকি ও রা দুটি নামই নেওয়া হয়েছে স্থানীয় প্রাচীন দেবতাদের থেকে।) মিশরে পিরামিড গড়া হয়েছে খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রকে, তখন সেখানে সভ্য যুগ। ১৯৭৭-৭৭ খ্রীস্টাব্দে হেআরডাল টাইগ্রিস নামে আর এক নল-তরী বানিয়ে ইরাক থেকে লোহিত সাগরের মুখে এসে স্থানীয় যুদ্ধ হেতু আর এগোতে পারেন নি, কিন্তু সুমের, মিশর ও সিন্ধু উপত্যকার প্রাচীন সভ্যতাগুলি যে সাগর পথে যোগাযোগ করে থাকতে পারে এই অভিযানে সেই সম্ভাবনা উন্মুক্ত হয়েছে। হেআরডালের প্রতিপাদ্য ঐতিহাসিক তত্ত্ব মেনে না নিলেও তিনি নিঃসন্দেহে দেখিয়েছেন যে

নবপ্রস্তর কি আরও প্রাচীন কালের জলযানে চড়ে দূর দরিয়ায় পাড়ি জমানো সম্ভব।

প্যাপাইরাসের তৈরি হলেও রা-২ বেশ বড় নৌকা, তাতে থাকবার ঘর ছিল (যেমন ছিল কন-টিকি ভেলাতেও), মিশরী চিত্রে ৪০ কি ততোধিক দাঁড়ী ও মাঝখানে ছোট ঘর সমেত নলের তরী দেখা যায়। এই সব জলযান ও তার আগে ভেলা ও শালতি চলেছে শুধু মানুষের হাতের জোরে ; ক্রমে স্থলে যেমন পশু বল জলে তেমন বায়ু বল কাজে লাগানো হল। ৩৫০০ বিসির অল্প পরেই ছবিতে নীল নদের দৃশ্যে পালতোলা নৌকা দেখা যায়। পরে সে দেশের রাজা রানীরা প্রকাণ্ড সুসজ্জিত তরীতে সখা সখী নিয়ে বিলাস বিহারে বার হতেন। এবং খুব সম্ভবত ইতিহাসের প্রাক্‌কালে ভূমধ্য সাগরের পূর্বাঞ্চলে এবং আরব সাগরে মিশরী বাণিজ্য পোতের অবাধ চলাফেরা ছিল। দক্ষিণ ইরাকে এরিদু শহরের এক কবরে পালতোলা নৌকার একটি অতি প্রাচীন প্রতিকৃতি আবিষ্কার হয়েছে। মানুষ যে অস্তার নৌকা বানাতে এবং পাল খাটাতে শিখে ফেলেছে তাই নয়, জল পথে দূর দূরান্তরে পাড়ি দেওয়ার মত ভৌগোলিক ও জ্যোতিষী বিদ্যাও নিশ্চয় কিছু কিছু আহরণ করেছে। মিশরী ঘটের চিত্রে যে পাল দেখা যায় তার অবশ্য অনেক সংস্কার হয়েছে পরে, কিন্তু মূলত এই আবিষ্কারই গত শতাব্দী পর্যন্ত ব্যবহার হয়েছে জাহাজ চালাতেও। জল পথে গমনাগমনের এই সুবিধা না থাকলে সে কালের ব্যাবসা বাণিজ্য অনেক পিছনে পড়ে থাকত। ভূমধ্য সাগরের পুব প্রান্তে ফিনিশীয়রা এই উদ্দেশ্যে জল পথের চরম সুযোগ নিয়েছে, খ্রীষ্টপূর্ব ১২শ শতাব্দীতে এই সাগরের আশেপাশে সুনির্মিত তরী ভিড়িয়ে তারা লোভনীয় বিলাস দ্রব্যের বিনিময়ে নিয়েছে কাঁচামাল, পরে অতলান্তিক মহাসাগরে পড়ে ইংল্যানডে গিয়েছে টিনের খোঁজে। লেবানন থেকে কাঠ এনে যেমন নৌকা বানাতে, তেমন তার চালনায় দক্ষ হল ফিনিশীয়রা, ধ্রুবতারা চিনে তার নির্দেশে পথ চলল রাতের অন্ধকারে।

শুধু বাণিজ্যে নয়, মিশরের পিরামিড গড়তে সহায় হয়েছে জল পথ, পিরামিডে ব্যবহৃত কোনও কোনও অতিকায় শিলা খণ্ড (প্রায় ১৫০ টন) আনতে হয়েছে কয়েক শো কিলোমিটার দূর থেকে, গাধার পিঠে বা গরুর গাড়িতে তা কখনও সম্ভব হত না নিশ্চয়। তার পর সেগুলি যথার্থ মাপ মত কাটতে, উঁচুতে তুলতে এবং নিখুঁত সংযোজনে জ্যামিতি ও বলবিদ্যার নীতি আয়ত্ত করতে হয়েছে। সুতরাং স্থলে যেমন চাকা, জলে তেমন নৌকা মানুষকে সভ্যতার

পথে অনেকটা এগিয়ে দিয়েছে।

বস্তুত সভ্যতার ইতিহাসে নদীর দান অপরিমেয়। তার জল ও পলি খেতের ফসল সুপ্রতুল করে বাঁধকু জনতার খাদ্য জুগিয়েছে, তখন উৎপাদন ছাড়াও অন্যান্য জীবিকার পথ প্রশস্ত হয়ে সমাজে বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধি বেড়েছে। সামান্য ভেলার থেকে আরম্ভ করে ক্রমে মালবাহী তরী দূরাঞ্চলের মধ্যে যখন যোগাযোগ ও বাণিজ্যের পথ খুলল তখন শুধু পণ্যের আদান প্রদানে নয়, নতুনের পরিচয়ে সাংস্কৃতিক পরিধি প্রসারিত হল বৃহত্তর ক্ষেত্রে। আজও পৃথিবীর দেশে দেশে নানা মহানগরী ঘনিষ্ঠ যোগসূত্রে নদীনির্ভর, স্রোত সংকুচিত হলে বা বিপথে গেলে মহাসংকট।

কিন্তু নদী কেবল সভ্যতার ধাত্রী নয়, রুদ্র মূর্তি ধরে সে ধন প্রাণও বিনাশ করে। বিভিন্ন দেশের পুরাণে এক মহাপ্লাবনের গল্প পাওয়া যায়, তার উৎপত্তি ইতিহাসের আগে মেসোপটেমিয়ায় এবং এই প্লাবনের ধ্বংসের উপর নাগরিক সভ্যতা গড়ে উঠেছে এমন অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে। এই অনুমান অনুসারে ৫000-৪000 বিসির মধ্যে কোনও এক বছর সম্ভবত টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিসের উৎস দেশে অতি মাত্রায় তুষার পাত হয়েছিল, তার ফলে সে বারে বান ডেকেছিল অসাধারণ, ভাসিয়ে নিয়েছিল খেত খামার গরু ভেড়া ঘর বাড়ি। ক্রমে লোক মুখে বাড়তে বাড়তে তা বিশ্বগ্রাসী মহাপ্লাবনের আকার ধারণ করল—যেমন চির দিন হয়, বুড়োদের মুখে আজও গল্প শোনা যায় সেই সে সালে ৬০ বছর আগে যেমন বৃষ্টি হয়েছিল তেমন আর দেখা যায় নি। বিখ্যাত প্রত্নবিৎ সার লিওনার্ড উলি দক্ষিণ মেসোপটেমিয়াতে খনন করে 'আর' রাজ্যের উদঘাটনে এক প্রবল বন্যার চিহ্ন পেয়েছেন ৪000 বিসিরও আগে; তা হল মাটির নিচে আড়াই মিটার পুরু পলির স্তর। এই স্তরে মানুষের ব্যবহৃত বস্তু কিছু পাওয়া যায় নি, কিন্তু নিচে উপরের সম্পূর্ণ বিভিন্ন দুই ঐতিহ্যের চিহ্ন ছিল—নিচে হাতে গড়া মাটির ভাণ্ড ও চকমকির হাতিয়ার (আল উবাইদ ধারা), উপরের মৃৎপাত্র চাকে তৈরি, যন্ত্রপাতির উপাদান ধাতু (সুমেরী ধারা)। কি পরিমাণ জল দাঁড়ালে আড়াই মিটার কাদা জমতে পারে তা ভাবলে বন্যার কোপ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না, সার লিওনার্ডের প্রমাণ অনুসারে নিমজ্জিত ভূমির মাপ দৈর্ঘ্যে প্রস্থে প্রায় ৬৫০ এবং ১৬০ কিলোমিটার, কিন্তু স্থানীয় লোকের চোখে তা নিশ্চয় বিশ্বগ্রাসী প্রলয়ের চেহারা

নিয়ে এসেছিল। সুমেরী কিংবদন্তীর ইঙ্গিত যে গ্রামাঞ্চল ও মাটির ঘর সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল এবং এই প্রলয় কাণ্ডের পরে দক্ষিণ থেকে বিদেশীরা এসেছে সমুদ্র পথে, সঙ্গে এনেছে নানা বিদ্যা—কৃষি, ধাতু ও লিপি—"তখন থেকে নতুন উদভাবন আর কিছু হয় নি"। সার লিওনার্ডের মতে প্রত্নতত্ত্বের সাক্ষ্য থেকেও মনে হয় বিপর্যস্ত আশাহত অবশিষ্ট কয়েকটি মানুষের মধ্যে নতুন আগন্তুকরা বিধ্বস্ত দেশ আবার গড়ে তুলেছে।

আশ্চর্য এই যে বিভিন্ন দেশের পুরাকাহিনীর মধ্যে এক সর্বগ্রাসী মহাপ্লাবন সম্বন্ধে প্রায়ই অদ্ভুত মিল দেখা যায়, কয়েকটি কিংবদন্তী এখানে আমরা সংক্ষেপে বর্ণনা করছি। ঐ জোড়া নদীর দেশে প্রচলিত উপাখ্যানটি ব্যাবিলনীয় মানবপিতা উত-নপিশ্‌তিম বলছে নিজের মুখে। একদা দেবতারা মনস্থ করলে ঝড় আর প্লাবনের আঘাতে পৃথিবী থেকে মানুষের বংশ নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে হবে ("মানুষের হট্ট-গোলে ঘুম অসম্ভব হয়ে আসছে," বললে এক জন), পরে এই সিদ্ধান্ত সামান্য বদল করে ঠিক হল শুধু উত-নপিশতিম ও তার স্ত্রীকে বাঁচতে দেওয়া হবে। ইয়া দেবতা তার কাছে আবির্ভূত হয়ে খবরটি জানালে, বললে সব কিছুর মায়া ত্যাগ করে এ বার প্রাণ বাঁচাবার জন্য এক নৌকা বানাও। পিচ আর শিলাজতুর আঠা দিয়ে এঁটে ১২০ হাত লম্বা এক নৌকা বানালে সে, তার পর শস্যের ভাণ্ডার আর নিজের পরিবার নিয়ে তাতে চড়ে বসল। পশু পাখিরা জোড়ায় জোড়ায় এল। তখন শামাশ দেব এসে জানালে যে সে দিন সন্ধ্যায় মহাপ্লাবন শুরু হবে, এবং সত্যিই দিন শেষ হতে হতে আকাশ কালো করাল মূর্তি ধরলে, তার পর আরম্ভ হল তুমুল ঝড় বৃষ্টি বন্যার তাণ্ডব নৃত্য। নৌকায় সব ছিদ্র বন্ধ করে দিয়ে তারা দেবতাদের হাতে ভাগ্য সমর্পণ করলে। বাইরে ক্ষীণতম আলোগুলিও একে একে গাঢ় তিমিরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, স্ত্রী পুত্র ভাই কেউ আর কাউকে দেখতে পেল না, কালো মেঘ আর ঘূর্ণীবাত্যার ঘর্ষণে দেবতারা হুংকার করতে লাগল। মেঘ ভেঙে জল ঝরতে ঝরতে শেষে তা পাহাড়ের চূড়া পর্যন্ত উঠে এল, তখন দেবতারাও ভয় পেল। ছ দিন ছ রাত্রি এমনি চলার পর আবার যখন সব শান্ত হল তখন চরাচরের উপর দিয়ে প্রলয় বয়ে গিয়েছে মানুষকে কাদা বানিয়ে দিয়ে, চতুর্দিকে শুধু উন্মুক্ত সাগর ধু ধু করছে। নৌকা আরও ১২ দিন চলে শেষে নিসির পর্বতে এসে ঠেকল। উত-নপিশতিম কিন্তু আরও সাত দিন অপেক্ষা করলে, তখনও নাও স্থির হয়ে

আছে দেখে অবশেষে ছোট একটি ছিদ্র খুললে। তা দিয়ে প্রথমে ঘুঘু পরে বাবুই উড়ে গেল বাইরে, কিন্তু নামবার জায়গা না পেয়ে ফিরে এল তারা ; শেষে দাঁড়কাক আর ফিরে এল না, স্থল আবার মাথা তুলেছে, মাটি খু'টে খু'টে কি যেন খাচ্ছে সে, দেখে সবাই নামল নৌকা থেকে। দুটি লোকের মধ্যে মানুষ জাতি বেঁচে রইল, অবশ্য বেল দেবতা ক্রুদ্ধ হয়ে তাদেরও ধ্বংস করতে চাইল, কিন্তু তাকে শেষ পর্যন্ত নিরস্ত করা হল। ইয়া-র আশীর্বাদে উত-নাপিশতিম ও তার স্ত্রী অমর হয়ে রইল, তাদেরই সন্তান সন্ততিতে আজ পৃথিবী পরিপূর্ণ।

এই উপকথার সঙ্গে ইহুদী সৃষ্টিপুরাণে বন্যা কাহিনীর সাদৃশ্য এত স্পষ্ট যে তার উল্লেখ বাহুল্য—উত-নাপিশতিমের জায়গায় নোআ, নিসির পর্বতের জায়গায় আরারাত পর্বত বসালেই প্রায় সব মিলে যায়। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্য এলাকার বাইরেও পুবে এবং পশ্চিমে গল্পের অনেক বৈশিষ্ট্য অপরিবর্তিত। গ্রীসীয় পুরাণে যক্ষ প্রমিথিউস মানুষকে আগুন দান করে তার প্রভূত উপকার করেছিল, কিন্তু তার আগে মানব জাতিকে সে প্লাবনের মুখে ধ্বংসের থেকে বাঁচিয়েছে। এই সর্বনাশা মতলব যখন দেবরাজ জিউসের মাথায় এল তখন প্রমিথিউস মানব কুলের মধ্যে দুটি সৎ লোককে (ডিউকেলিয়ন ও পিরা) বেছে নিয়ে তাদের সব জানালে, তার পর শিখিয়ে দিলে কি করে তারা এমন তরী বানাতে পারে যাতে চড়ে ত্রাণ পাওয়া যাবে। জিউসের আদেশে বায়ু ও বৃষ্টি প্রবল বন্যার সৃষ্টি করলে, বারি দেব পোসাইডন সমুদ্রের জল তুলে স্থলে ঢেলে দিলে, নদীদের আদেশ করলে বাঁধ ভেঙে সব কিছু ভাসিয়ে দিতে। ক্রমে চরাচর ডুবুডুবু, জলপরীরা তাদের চলাফেরার পথে অবাক হয়ে দেখলে মানুষের তৈরি শহর, লোকেরা নৌকায় চড়ে প্রাণ বাঁচাতে চেষ্টা করলে, কিন্তু সব নৌকা ডুবল, একমাত্র ডিউকেলিয়ন ও তার স্ত্রী ভেসে রইল তাদের মায়া-তরীতে। অবশেষে এক সময়ে জল সরল, তারা নামল উঁচু জমিতে, দেবরাজ উপর থেকে দেখলে শাপগ্রস্ত মানুষ জাতির দু জন তখনও বেঁচে আছে। কিন্তু তারা ন্যায়পরায়ণ, সহৃদয়, দেবভক্ত, তাই তাদের সে ছেড়ে দিল, আবার পৃথিবী ভরে উঠল মানুষে।

আমাদের পুরাণে মানবপিতা বৈবস্বত মনু কি করে প্রলয় কালে সৃষ্টি বাঁচিয়েছিল তা অনেকেরই জানা আছে। একদা এক ক্ষুদ্র মাছ মনুকে অনুরোধ করলে বড় মাছদের থেকে তাকে বাঁচাতে। মনু প্রথমে তাকে জালায় রাখলে, কিন্তু সে এত

বড় হতে লাগল যে ক্রমে তাকে পুকুরে, গঙ্গায় ও সমুদ্রে রাখতে হল। তখন মাছের ঈশ্বরত্ব বুঝতে পারলে মনু। মাছ তাকে বললে নৌকা বানিয়ে তাতে উঠে বসতে—প্রলয় আসন্ন, দেখতে দেখতে স্থাবর জঙ্গম সব জলমগ্ন হবে। নৌকা তৈরি করে সপ্তর্ষি ও নানা রকম বীজ সঙ্গে নিয়ে মনু তাতে চড়ে বসল, মৎস অবতার শৃঙ্গ ধারণ করে এল, সর্প-রজ্জু দিয়ে তার সঙ্গে নৌকা বেঁধে দ্রুত নিয়ে চলল। বহু বছর পরে হিমালয়ের শৃঙ্গে তরী বাঁধা হল, মনু তখন মানব ও অন্যান্য প্রাণী, স্থাবর ও জঙ্গম সৃষ্টি করলে।

পারসিক পুরাণে কথিত আছে যে প্রথম নর নারীর পৌত্র পৌত্রীরা যখন ধর্ম ও ন্যায়ের পথ ছেড়ে শয়তানী শক্তি অরিমনের বশবর্তী হয়ে পড়ল তখন দেবাদিদেব অহুর মাজদা তাদের শাস্তি দিলে বরফ গলিয়ে বন্যার সৃষ্টি করে। য়োরোপের উত্তর প্রান্তে আইসল্যানডের পুরাকাহিনীতে দেখা যায় দেবাসুরের যুদ্ধের পরে বিক্ষুব্ধ জলমগ্ন পৃথিবী অন্ধকারে আচ্ছন্ন, চন্দ্র সূর্যকে নেকড়েতে খেয়েছে। ক্রমে জল সরে গেল, সুন্দর সবুজ ভূমি দেখা দিল আবার, নতুন চন্দ্র সূর্য সৃষ্টি হল। বনের গভীরে দুটি মাত্র নর নারী বেঁচে ছিল, তাদের সন্তান সন্ততি নতুন করে পৃথিবী পূর্ণ করলে। এমন কি অতলান্তিকের ও পারে অ্যাজ্‌টেক উপাখ্যানে বলে এই পৃথিবীর আগে অন্যান্য পৃথিবী ছিল, তাতেও মানুষের বাস ছিল ; বারে বারে বসুন্ধরা ধ্বংস হয়েছে এক বার প্লাবনে, এক বার ঝড়ে, এক বার আগুনে।

এই পুরাণ কাহিনীগুলির তুলনা করলে এমন ধারণা এড়ানো প্রায় অসম্ভব যে এদের অন্তত কয়েকটির একই জায়গায় উদ্ভব, পরে সেখান থেকে তারা নানা দিকে ছড়িয়ে পড়েছে এবং কিছুটা রূপান্তরিত হয়েছে। অনেকেই মনে করেন যে নোআর কাহিনী প্রাচীন সুমেরী উপাখ্যান থেকে উদ্ভূত। আর্যদের সম্ভাব্য আদি নিবাস ছিল মধ্য এশিয়ার কোনও এক জায়গায়, সেখান থেকে তারা বিভিন্ন শাখায় পশ্চিমে গ্রীসে ও য়োরোপের অন্যান্য দেশে, দক্ষিণে ইরানের পথে ভারতের দিকে বিক্ষিপ্ত হয়েছে এই প্রচলিত ধারণা মেনে নিলে ছবিটি অনেকখানি পরিষ্কার হয়। এদের সঙ্গে ঐ ঐ অঞ্চলে যে নানা ভাবধারা ছড়িয়ে পড়েছিল তার প্রমাণ আছে, যেমন পারসিক আবেস্তার অহুর মাজদা নাকি বেদের বরুণ দেবেরই প্রতিরূপ, অধ্যাপক ব্লুমফিল্‌ডের মতে আবার বরুণ ও গ্রীসীয় ইউরেনাস অভিন্ন। এ দিকে গ্রীসের ইলিয়ড অডিসি আর ভারতের রামায়ণ মহাভারতে বহু ঘটনার সাদৃশ্য লক্ষ্য করা

যায়। সামান্য যুদ্ধ ও সম্ভাব্য ঘটনার ভিত্তিতে যেমন এই সব অলৌকিক মহাকাব্যের মহীরুহ গড়ে উঠেছে ঠিক তেমন হয়তো কোনও এক নদীর অস্বাভাবিক প্রবল বন্যা লোক মুখে বিশ্বগ্রাসী মহাপ্লাবনের আকার ধারণ করেছে। ..

১২। খাতেখড়ি

সম্ভবত নেআনডার্টাল মানব কি তারও আগে ১৫ লক্ষ বছর প্রাচীন হোমো ইরেকটাসের মুখে প্রথম ভাষা ফুটেছে, কিন্তু মুখের কথা লিপিবদ্ধ করতে প্রায় অতগুলি বছরই কেটে গেল। শহর সভ্যতার প্রারম্ভে যখন প্রশাসন ক্রমেই জটিল হয়ে পড়ছে, তখন দেখা গেল শুধু স্মৃতি ও শ্রুতির সাহায্যে কাজ চলে না, নানা বিষয়ে হিসাব ও দলিল রাখতে অপরিহার্য হয়ে পড়ল লিখিত নথি পত্র। বিভিন্ন লিপির আবিষ্কার হয়েছে প্রাথমিক সভ্যতাগুলির ধাত্রী টাইগ্রিস ইউফ্রেটিস নীল ও সিন্ধু নদীর উপত্যকায়। এই নব বিপ্লবেরও পথ দেখিয়েছে দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ার সুমের রাজ্য আজ থেকে প্রায় ৫৫০০ বছর আগে।

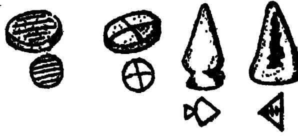
লেখা আবিষ্কারের আগে সুমেরী নাগরিকরা অনেকে ব্যক্তিগত মালিকানা বা সম্মতি জানাতে সীলমোহরের ছাপ দিত। সীল বানাতে তারা ছবি বা সংকেত উৎকীর্ণ করেছে নলের মত গোল করে কাটা পাথরে, অনেক ছবি ধর্মীয় বা প্রবাদিক বিষয়ের রূপায়ণ, তার পর এই বেলনটি ভিজে মাটির উপর গড়িয়ে ছাপ ফেলেছে। একেবারে প্রথম লিখনও এই জাতীয়, তাদের বলা হয় চিত্রলিপি বা ছবির দলিল, মাটির পাটা চিরে শিল্পী বা লিপিকর এঁকেছে ছবিগুলি, হয়তো গরু ছাগলের মাথা, শস্যতরুর শিষ, কুটির বা নর মূর্তি—প্রায়ই দেখে মনে হয় তা সম্পত্তির হিসাব বা স্মারক লিপি। ক্রমে সুমেরীরা সময় ও শ্রম সংক্ষেপ করতে মাত্র কয়েকটি আঁচড়ে বিষয়টির মর্মরূপটি ধরতে চেষ্টা করেছে ; এগুলি ঠিক ছবি নয়, তার ইঙ্গিত, সাধারণত এখন কেবল বিশেষজ্ঞরাই তাদের আদি মূর্তিটি চিনতে পারেন, মিশর ও মেসোপটেমিয়ায় লাঙলের এই চিত্রলিপির সঙ্গে আমাদের আগে পরিচয় হয়েছে।

খাগড়ার নল চোখা করে তৈরি খাগের কলম এই সে দিনও আমরা ব্যবহার করেছি, ইতিহাসের প্রথম লেখনীও একই জিনিস। জল আর মাটি মিশিয়ে পাটা বানিয়ে তা সম্পূর্ণ শুকাবার আগে এই চোখা নল দিয়ে খুদে হয়েছে মানুষের প্রথম লিখন, স্থায়ী দলিল বানাতে পরে তা ইটের মত পুড়িয়ে নিয়েছে সে। ক্রমে

চিত্রলিপি আরও সাংকেতিক হয়ে উঠল এবং অন্য চিহ্নের সঙ্গে একযোগে জটিলতর বক্তব্য প্রকাশ করল। তখন স্থান অনুসারে একই চিহ্নের অর্থভেদ হয়েছে, যেমন সংকেত যদি বলে পা, তবে তা কোথাও দাঁড়ানো কোথাও গমন বোঝাতে পারে। উপকরণেরও সংস্কার হল, সূচাগ্র নলের বদলে সুমেরীরা বানালে কাঠের লেখনী, তার মুখটা লম্বাটে ত্রিকোণ গোঁজের মত; লিপিকর তার সরু দিকটা দিয়ে সোজা দাগ টেনে মাঝপথে মোটা অংশটা চেপে ত্রিকোণাকার ছাপ ফেলত। অগ্রগতির এক মস্ত ধাপ এটা, কারণ তখন সম্ভব হল আরও সাংকেতিক লিপি এবং তার ফলে চিত্রলিপির তুলনায় আরও জটিল বক্তব্যের প্রকাশ। এই কিউনেইফর্ম (ল্যাটিন শব্দ থেকে আক্ষরিক অর্থে গোঁজাকার) লিপিই প্রথম প্রকৃত লিখন (চিত্র ২৩)। বলা বাহুল্য, এই লিপি অক্ষরের বিন্যাস নয়, প্রাক্তন চিত্রলিপির বিকার মাত্র, সুতরাং রূপক। সংকেতগুলি সম্পূর্ণ শব্দ (word) বা শব্দাংশ (syllable) বোঝায়, প্রকৃত বর্ণমালার আবির্ভাব ১৪০০ বি/সির কথা। বর্তমান সিরিয়ার প্রাচীন উগারিট শহরে তখন হিব্রু ও ফিনিসীয় সম্পর্কিত এক ভাষা প্রায় ৩০ গোঁজাকার অক্ষরে লিখিত হয়েছে মাটির পাটায়. পৃথিবীর আদিতম সম্পূর্ণ বর্ণমালা এই উগারিটীয় লিপি।

বছর কয়েক আগে টেকসাস বিশ্ববিদ্যালয়ের এক মহিলা প্রত্নবিৎ ডেনীজ শ্মানৃট-বেসেরা লিপির আদি সূত্রের খোঁজে পৌঁছেছেন ১০,০০০ বছর আগে। কিছু কাল ধরে মাটির তৈরি কতগুলি ছোট ছোট ঘুঁটির মত বস্তু পুরাবিজ্ঞানীদের ভাবিয়েছে, এগুলির ব্যাস পাঁচ সেনটিমিটার পর্যন্ত, আকৃতি শঙ্কু, চাকতি, গোলক ইত্যাদির মত, প্রাচীনতমটির বয়স ৮৫০০ বি/সি। জ্যামিতিক আকারের এই সব ঘুঁটি মিশর ও সিন্ধু উপত্যকার মাটি খুঁড়ে প্রচুর পাওয়া গিয়েছে, বিশেষজ্ঞরা অনেকে জল্পনা করেছেন এগুলি হয় খেলনা নয়তো কোনও অজানা প্রাগৈতিহাসিক খেলার ঘুঁটি। ১৯৬৬ সালে ফরাসী প্রত্নবিৎ পিয়ের আমিয়ে বললেন বস্তুগুলি আদিকালীন হিসাব রাখার উপকরণ হতে পারে, শ্রীমতী ডেনীজ (তাঁর জন্মও ফ্রানসে) সুমেরের এরেক শহরের প্রাথমিক লিখনের সঙ্গে তুলনা করে এই অভিমত সমর্থন করেছেন, উপরন্তু তিনি বলেন এদের থেকেই লিপির উদ্ভব।

তাঁর বিশ্বাস এই বিবর্তন সম্পূর্ণ হয়েছে চার ধাপে। প্রায় ৮৫০০ থেকে



চিত্র ২২। এই ধরনের মাটির ঘুঁটির থেকে লেখার উদ্ভব সন্দেহ করা হয়েছে।

৩৫০০ বিসি পর্যন্ত নানা আকারের এই সব গুটিকা বোঝাত বিভিন্ন জিনিস, যথা কাপড়, তেলের ভাণ্ড, রুটি বা ভেড়া, মধ্যপ্রাচ্যের বণিক সম্প্রদায় ও অন্যান্যরা এগুলির সাহায্যে পণ্য দ্রব্যের হিসাব রেখেছে। দ্বিতীয় ধাপে ব্যবসায়ী এক জায়গা থেকে অন্যত্র মাল পাঠাতে তদনুসারে সংখ্যা ও চেহারা মিলিয়ে সঙ্গে দিয়েছে প্রতীকগুলি এক গোল মৃৎভাণ্ডে ভরে, তার মুখটি পাকাপাকি বন্ধ করে। গন্তব্য স্থানে পৌঁছাবার পর এই পাত্রটি ভেঙে ঘুঁটিগুলির সঙ্গে প্রাপ্ত মাল মিলিয়ে নিয়েছে আমদানিকারী (এখনও একই পদ্ধতি চলে, তবে সঙ্গে যায় কাগজে লেখা তালিকা)। এর অল্প পরে বণিকরা বুঝল যে আধারটি না ভেঙেও মেলানোর কাজটা করা যায় যদি তার মাটি ভিজে থাকতেই প্রতিটি প্রতীক তার গায়ে চেপে ছেপে দেওয়া হয়, অর্থাৎ যেমন ভিতরে তেমন বাইরেও একটি 'তালিকা' থাকল। অতঃপর অবশ্য অবিলম্বে প্রতীয়মান হল যে বাইরে ছাপ থাকলে ভিতরে প্রতীক দেওয়া নিষ্প্রয়োজন, তখন সেগুলি বর্জন করে মাটির পাটায় সোজাসুজি তাদের প্রতিকৃতি আঁকা আরম্ভ হল। শ্রীমতী ডেনীজের মতে ব্যবস্থাটি এত সুবিধাজনক বলেই এর থেকে লিখিত দলিলের অভিব্যক্তি হয়েছে এবং এও বোঝা যায় কেন লিপির ব্যবহার এত দ্রুত বাণিজ্য পথে পথে প্রসারিত হয়ে তৎকালীন সভ্য জগতের সর্বত্র বিস্তৃত হয়েছে। কিন্তু ঘুঁটি জাতীয় প্রতীকের প্রয়োজন এখনও আছে যারা পড়তে জানে না তাদের মধ্যে, যেমন মধ্যপ্রাচ্যের কোথাও কোথাও রাখালরা তাদের পশু পালের গণনায় আজও তা ব্যবহার করে।

উপরোক্ত প্রতীকগুলির সঙ্গে লিপির আদি ইতিহাস সম্পর্কিত হক আর নাই হক, ইতিহাসের প্রাক্‌কালে বৈদেশিক বাণিজ্য যে লিপি উদ্ভাবনের মস্ত প্রেরণা যুগিয়েছে এবং বাণিজ্যকে বাহন করে লেখার ধারণাটা যে দিকে দিকে ছড়িয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। দেশের অভ্যন্তরেও সমষ্টির প্রশাসনে নানা ক্ষেত্রে তা অসামান্য

সহায় হয়েছে, যেমন কোন প্রজার বরাদ্দ কি ও কতটা, যে কোন কাজ করবে, ক' জন নিযুক্ত হবে তার হিসাব রাখতে ; আবার সম্পন্ন নাগরিকরা ব্যক্তিগত দলিল পত্র বানিয়েছে। প্রাচীন লিপির মর্ম ভেদ করা সহজ নয়, জার্মেনির এক সামান্য সহকারী স্কুলশিক্ষক বন্ধুদের সঙ্গে বাজি রেখে প্রথম সুমেরী লিপির পাঠোদ্ধার করেন, এক ইংরেজ পণ্ডিতও স্বাধীন ভাবে কাজটা আরও এগিয়ে নিয়েছেন। তাঁদের একাগ্র উদ্যোগের ফলে হাজার হাজার পটলিপির থেকে সে দিনের মানুষগুলি আজ আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে, আমরা অবিলম্বে দেখব তাদের এখনও কত পরিচিত মনে হয়।

সে কালে লিখতে জানত মুষ্টিমেয় জনকয়েক সুতরাং তাদের কদর ও মর্যাদা ছিল যথেষ্ট। এই নতুন বিদ্যা আয়ত্ত করতে যেতে হয়েছে শিক্ষালয়ে, গণ্যমান্যদের সর্বোচ্চ সুপারিশ ছাড়া সেখানে প্রবেশ পাওয়া যেত না, সম্ভবত কালে কালে পেশাটি বাপ থেকে ছেলেতে বর্তেছে। কঠিন শিক্ষা ব্যবস্থা শেষ হতে কয়েক বছর কেটে যেত, ছুটি মিলত শুধু অল্প কয়েকটি পবিত্র দিনে, তখন সম্ভবত ছাত্রদের ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ পালন করতে হয়েছে। ৩৫০০ বিসিতেই উরুক (বাইবেল-বর্ণিত এরেক, বর্তমান নাম ওআর্কা) শহরের লিপিতে দেখা যায় ২০০০ বিভিন্ন সংকেত, কিন্তু শিক্ষা শেষ হলে তারা স্থান পেয়েছে সমাজের উচ্চ শ্রেণীতে এবং সারা জীবনের মত বেকার সমস্যা ঘুচে গিয়েছে। লিপিকরদের এক প্রধান কর্তব্য ছিল মন্দির ও রাজপ্রাসাদের দলিল তৈরি ও সংরক্ষণ, কিন্তু ২৬০০ মধ্যেই কেউ কেউ মহাকাব্য ও স্তোত্র লিপিবদ্ধ করেছে, রচনাও করেছে। জন কয়েক লিখে গিয়েছে নিজেদের অভিজ্ঞতা, যথা শিক্ষকদের হাতে কত যন্ত্রণা সইতে হয়েছে—অজ্ঞতা ও আলস্যের দোষে কত তীব্র তিরস্কার, আজেবাজে ভুলের জন্য আঙুলের গিঁটের উপর আঘাত। এক ছাত্র তার নিদারুণ শাস্তির খবর রেখে গিয়েছে এই রকম—একই দিনে অন্তত ন' বার বেত খেতে হয়েছে তাকে, বিনা অনুমতিতে কথা বলা, রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো ইত্যাদি অপরাধে। এই ধরনের রচনার প্রচলনে লিপির চরিত্র বদলে গেল, তখন তা কেবল হিসাবের দলিল, স্মৃতির সহায় মাত্র নয়। আর এক পাটায় আছে এক বোকা ছেলে কি করে ভাল নম্বর পেল সেই কাহিনী, উপায়টি আজও সুপ্রচলিত, এক কথায় ঘুষ—শিক্ষকটি পেয়েছিলেন বিপুল ভোজের নিমন্ত্রণ, নতুন জামা ও কিছু হাত খরচের টাকা। ছেলে তা হলে তেমন বোকা নয়!

দুই তরুণ লিপিকরের মধ্যে কবির লড়াইয়ের মত বিতর্ক লিপিবদ্ধ হয়েছে, সুমেরে এই ধরনের রচনা শিক্ষার অঙ্গ ছিল। হাঁদা, হাবা, আকাট মূর্খ, কীট, দুর্বৃত্ত, বাচাল, পরিহাসপটু, অত্যাচারী ইত্যাদি কটূক্তিতে কণ্টকিত এই লিখন, সে সব বাদ দিয়ে সার কথা হল পেশা সম্পর্কিত নানা গলদ নিয়ে অভিযোগ ও বাদানু-বাদ ; যেমন "তোমার লেখা অকথ্য, তুমি লেখনী ধরতেই জান না, শ্রুতলিপিও জান না, তবু তুমি নিজেকে আমার সমকক্ষ বলে দাবি কর।" এর উত্তর : "আর তোমার লেখার তো মানেই বোঝা যায় না। জমির জরিপ করতে গেলে মাপার সুতো সোজা করে ধরতেও পার না। বিরোধী দলের মধ্যে রফা করা তো দূরের কথা, ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া বাড়িয়ে দাও তুমি।" অতঃপর প্রথম তার্কিকের প্রত্যুত্তর : "সম্পত্তির ভাগ আমি ঠিকই করি। তোমার মত অলস লিপিকর, অসতর্ক মানুষ দুনিয়ায় দুটি নেই। তুমি যে গুণ কর তাতে অসংখ্য ভুল থাকে, জমি মাপতে গিয়ে দৈর্ঘ্য প্রস্থ ঘুলিয়ে ফেল।" প্রতিদ্বন্দ্বী : "সুমেরী লিপি আমার জল ভাত, আমার বাপ লিপিকর। তুমি ভণ্ডুল করতে ওস্তাদ, কেবল বাক্যবীর। পাটা বানাতে গিয়ে মাটির গা মসৃণ করতেও পার না।" এই বাক্‌যুদ্ধের থেকে লিপিকরদের কর্তব্য সম্বন্ধে অনেকটা জানতে পারি আমরা, তার মধ্যে গুণ ভাগও ছিল।

লিপির সঙ্গে অবশ্য গণিতের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক, সুতরাং পাটিগণিতের কোনও এক প্রণালী উদভাবন করতে হয়েছে। অঙ্কের হিসাবে সুমেরী রীতির ভিত্তি ছিল ১০ নয়, ৬০ সংখ্যাটি, দশমিক পদ্ধতিতে যারা অভ্যস্ত তাদের তা একটু অদ্ভুত ঠেকলেও ষাটের ব্যবহারিক মূল্য যথেষ্ট, কারণ অনেক সংখ্যা দিয়ে তাকে ভাগ করা যায়। তাই সেই পুরা কাল থেকে মাপজোকের নানা ক্ষেত্রে আজও তা টিকে আছে, যেমন ঘণ্টা ও মিনিটের ভাগে ; বৃত্তে আছে ৩৬০ ডিগ্রি, তা ষাটের গুণফল, ষাটের ভাগফল দিয়ে বছরে ১২ মাস, ফুটে ১২ ইনচি। বলা বাহুল্য, কোনও কোনও লিপিকর গণিতে বিশেষজ্ঞতা অর্জন করল।

পেশাদার লিপিকরদের প্রসঙ্গ ছেড়ে অন্যান্য রচনার মধ্যে বিষয়ের বৈচিত্র্য যথেষ্ট দেখা যায় এবং কালের গতির সঙ্গে তা স্বভাবতই বেড়েছে। কয়েকটি সংক্ষিপ্ত উদাহরণ থেকে তৎকালীন সুমেরী জীবনের আরও পরিচয় পাওয়া যাবে। নিপুর ও 'আর' শহরে প্রাপ্ত লিপিপটের খণ্ড জুড়ে প্রকাশ পেয়েছে এক পিতার দুঃখের

কাহিনী, ছেলেকে লিখছেন তিনি, "কেবল পথে ঘাটে ঘুরে বেড়ালে কোনও দিনই কিছু করতে পারবে না, স্কুলে যাও, ভাল হবে···তোমার আবদার আর নালিশ আমাকে মৃত্যুর মুখে এনে ফেলেছে। অন্যান্য ছোটরা নলের বোঝা বয়ে নিয়ে যায়, আমি তোমাকে কখনও কাজে পাঠাই নি. বলি নি তাদের মত আমাকে খেটে খাওয়াও ; তারা যবের ফলন বাড়ায়, বাপকে যব, তেল ও পশম যুগিয়ে তার সেবা করে, তাদের তুলনায় তুমি মানুষই না। তোমার কারণে দিবা রাত্র আমার মন জর্জরিত, দিবা রাত্র তুমি বিলাসে বিনষ্ট হচ্ছ, ফুলে মোটা হয়ে পড়েছ। আত্মীয় স্বজনরা তোমার দুর্গতির অপেক্ষায় আছে, সে দিন তারা আনন্দ করবে. কারণ আপন মনুষ্যত্বের দিকে তাকাও নি তুমি।"

দুষ্টু ছেলের পর এ বার একটি ভাল ছেলের কথা, সে বাপকে খুশী করেছে। ৪000 বছর প্রাচীন এই বর্ণনা থেকে স্কুলের কাজ সম্বন্ধেও জানা যায়। "সকালে স্কুলে পৌছে আমার পটলিপি আবৃত্তি করলাম, দুপুরের খাওয়া খেলাম, নতুন পট বানালাম, তাতে লেখা সম্পূর্ণ করলাম. তার পর তারা আমাকে মৌখিক কাজ দিল···ছুটির পর ঘরে ফিরলাম, বাড়িতে ঢুকে দেখি বাবা বসে আছেন। বাবাকে আমার লিখিত কাজের কথা বললাম, তার পর পটলিপি আবৃত্তি করলাম, বাবা খুব খুশী হলেন...।"

বর্তমান জগতের প্রতিধ্বনি মেলে প্রেমের কবিতায় অথবা বিচক্ষণ প্রবচনে, যথা "সুখের জন্য বিবাহ, বিবেচনার পর বিবাহ বিচ্ছেদ", "যার অনেক রুপা আছে সে হয়তো সুখী, যার অনেক টাকা আছে সে হয়তো খুশী, কিন্তু যার কিছুই নেই সে ঘুমাতে পারে", "মৃত্যু অনিবার্য, সুতরাং খরচ কর ; দীর্ঘজীবী হবে, সুতরাং সঞ্চয় কর", "তোমার প্রভু থাকতে পারে, রাজা থাকতে পারে, কিন্তু ভয় করবার মত লোকটি হল যে কর আদায় করে"। নববর্ষের উৎসবে এক স্ত্রী-পুরোহিত কিং শু-সিন নামক তার বরকে গান শুনিয়েছিল, প্রেমিককে সিংহ বলে সম্বোধন করে জানাচ্ছে তার রূপে সে কেমন মুগ্ধ, চাচ্ছে আদর পেতে ও দিতে, সে আদর মধুর চেয়েও মিষ্টি, ইত্যাদি ইত্যাদি।

২৭০০ বিসি নাগাদ উরুকের রাজা ছিল দোর্দণ্ডপ্রতাপ প্রাবাদিক গিল্‌গামেশ, তাকে নিয়ে রচিত উপাখ্যানটিকে মহাকাব্যের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। নারীর প্রতি লোভ, বন্য জন্তু শিকার, সর্বত্র কাল্পিত বা বাস্তবিক শত্রুর তাড়না এই ছিল তার

চরিত্র। অবশেষে নিপীড়িত প্রজারা দেবতাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল, তাদের মধ্যস্থতার ফলে এবং অমরত্বের আকাঙ্ক্ষায় গিলগামেশ বার হল এক দীর্ঘ পরিভ্রমণে, প্রাবাদিক মহাপ্লাবন থেকে রক্ষা পেয়েছে যে এক মাত্র পুরুষ সেই উত-নপিশতিমের সন্ধানে, সে পথ দেখাবে এই আশায়। উত-নপিশতিম তখন বয়সে প্রবীণ, মানুষ থেকে প্রায় দেবতায় রূপান্তরিত, সেই প্রলয় প্লাবনের গল্প বললে সে—কেমন করে দেবতাদের আদেশে নৌকা বানিয়ে দিনের পর দিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টির থেকে বেঁচে শেষে এক পাহাড়ের চূড়ায় এসে ঠেকল, খবর আনতে পাঠাল এবং অবশেষে সে এবং 'সব জীবের বীজ' দুই নদীর অন্তর্বর্তী ভূমিতে ঠাঁই পেল। এই প্রাচীন কাহিনীর ছায়া যে নানা দেশের সর্বনাশা বন্যার উপাখ্যানে পড়েছে তা আমরা আগে দেখেছি, অডিসিউস ও হারকিউলিসের দীর্ঘ পর্যটনও গিলগামেশের পরিভ্রমণ মনে করায়। উপাখ্যানটি লিখিত হয়েছে প্রথমে সুমেরী, পরে আরও উৎরে অক্কদী ও হিটাইট ভাষায়, এবং ক্রমে তার বিভিন্ন রূপান্তর মধ্যপ্রাচ্যের প্রায় সব আদি ভাষায় স্থান পেয়েছে।

সাহিত্যের কথা অনেক হল, ব্যবহারিক ভাগেদে লিপির উদ্ভব, এ বার সেই শ্রেণীর কয়েকটি দৃষ্টান্তের দিকে দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে। নানা রোগ নিরসনের এক বিধান পত্র (এ যাবৎ প্রাচীনতম) ২২৫০ খ্রিসিতে কোনও চিকিৎসক অথবা তার লিপিকর লিখেছিল সুদক্ষ হাতে। এই পাটায় ১৫ রকম ওষুধের বর্ণনা আছে, তার একটি বানাতে প্রথমে কচ্ছপের খোল, নাগা তরুর অঙ্কুর, নুন ও সরষে দিয়ে দলতে হবে, তার পর রুগীর ক্ষত উৎকৃষ্ট বিয়ার ও জল দিয়ে ধুয়ে জায়গাটা আগে ঐ মিশ্রিত বস্তুটি দিয়ে ও পরে উদ্ভিজ্জ তেল দিয়ে ঘষে ফার গাছের চূর্ণ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হল বিহিত রীতি। আর একটি চিকিৎসার নির্দেশ: রজনের উপর কড়া বিয়ার ঢালো, আগুনে গরম কর এবং নদীজাত শিলাজতুর তেল মিশিয়ে রুগ্ন ব্যক্তিকে খেতে দাও। রোগটা কি তার উল্লেখ নেই।

বিবাহ ও তার দায়িত্ব সম্বন্ধে সুমেরী আইন ১৮৫০ খ্রিসিতে লিপিবদ্ধ দেখা যায়। যথা, "কারও প্রথম পত্নী মারা গেলে সে যদি তার ক্রীতদাসীকে বিয়ে করে তবে প্রথমার সন্তানরা তার উত্তরাধিকারী হবে।' "কারও স্ত্রী যদি নিঃসন্তান হয়, কিন্তু কোনও এক পথের গণিকা যদি তাকে সন্তান দেয় তা হলে এই নারীকে শস্য তেল ও বস্ত্র যোগাতে হবে; এই গণিকার সন্তানরা পিতার উত্তরাধিকারী হবে, এবং

প্রথম স্ত্রীর জীবন কালে গণিকা তার সঙ্গে তার সঙ্গে সেই গৃহে বাস করবে না।"

কৃষির প্রসার ও উন্নতি লিপি আবিষ্কারের অন্যতম প্রেরণা। মেঘ বৃষ্টি বন্যা খরা ইত্যাদি দেবতাদের হাতে, তাদের উদ্দেশ্যে শহরে শহরে গড়ে উঠেছিল মন্দির। এই পুরোহিত গোষ্ঠীর খোরপোশের জন্য কৃষকরা যে খাদ্য সরবরাহ করেছে তার নথি রাখতে মন্দিরের প্রশাসকদের লিখন দরকার হয়েছে। তার পর অবিলম্বে চাষী ও পশুপালকরা নিজেদের হিসাব রাখতে তা কাজে লাগিয়েছে। প্রায় 4000 বছর আগে সুল্‌গি রাজার আমলে ১০ বছর ধরে এক পাল গরুর সংখ্যা বৃদ্ধি ও তাদের থেকে মাখন ও পনিরের উৎপাদন একটি পাটার দু পিঠ জুড়ে লিখে রাখা হয়েছিল, দেখা যায় পশুর সংখ্যা বেড়েছে, অনেকটা দুগ্ধজাত খাদ্যও তদনুপাতে। যেমন :

	গরু, বয়স (বছর)					ষাঁড়, বয়স, (বছর)					মাখন	পনির
	দুগ্ধ-পোষ্য	১	২	৩	পূর্ণ-বয়স্ক	দুগ্ধ-পোষ্য	১	২	৩	পূর্ণ-বয়স্ক	(লিটার)	(লিটার)
২য় বছর	১	১			৪	১	১				২৩	৩৪
১০ম বছর	৩	২	১	২	১০	২	২	২	১	৭	৫১	৭৭

শিক্ষানবিস লিপিকরদের হাতের লেখা মক্শ করতে একটি পাটা তৈরি হয়েছিল, যদিও তদনুসারে সেচ ব্যবস্থা থেকে আরম্ভ করে শস্য ঝাড়া পর্যন্ত কৃষি বিদ্যা সম্পূর্ণ শেখা যায়, এমন কি মজুরদের শাসনে রাখবার উপায়ও। এই রচনায় বাপ নির্দেশ দিচ্ছে ছেলেকে, অন্যতম বিষয়ের নমুনা : বাঁধ ও সেচের খাল পরীক্ষা করে তাদের মেরামত, সেচের জল বাড়তে আরম্ভ করলে ভিজে মাঠে যেন গরু না ঢোকে তার জন্য পাহারা বসানো ; কোদালের তাম্র ফলকের ওজন কত হবে, কি করে হাতলের সঙ্গে তাদের জুড়তে হবে তাও। নিপুর শহরের বাইরে আবাদী জমির এক মানচিত্র তৈরি হয়েছিল ১৩০০ বিসিতে, তত দিনে এই লিপির উন্নতি চরমে উঠেছে। মানচিত্রে এঁকে দেখানো হয়েছে কৃত্রিম সেচ প্রণালীর ধারা, জমির প্রধান মালিক রাজা, তা ছাড়া অন্যান্য ব্যক্তির বা গ্রামের সম্পত্তি তাদের নামে নামে ভাগ করা। "পানীয় জলের স্রোত", "৫০ লোকের পাহাড়" এমন সব আখ্যাও দেখা যায়।

সুমেরী লিপি পরে ব্যাবিলনীয়, পারসীক, হিটাইট ইত্যাদিরাও গ্রহণ করেছে, কিন্তু সুমেরের সমসাময়িক মিশর গিয়েছে স্বতন্ত্র পথে। সে দেশে দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ার মত বিভিন্ন শহর-রাজ্য ছিল না. মিশরী সভ্যতা টিকেছেও অনেক বেশী কাল। ৩৪০০ বিসি নাগাদ দুটি রাজ্য ছিল উত্তরে ও দক্ষিণে, কথিত আছে প্রায় ২০০ বছর পরে দক্ষিণের নেখেন শহর থেকে রাজা নার্মার উত্তর রাজ্য জয় করে প্রথম সংযুক্ত মিশরের অধিপতি হল, তার পরবর্তী প্রাবাদিক নাম মিনিজ. এই সময় থেকে মিশরে প্রথম ঐতিহাসিক রাজকুলের সূচনা বলে গণ্য করা হয়। এই পরাক্রান্ত নৃপতির কীর্তি ৩১০০ বিসিতে চিত্রে ও চিত্রলিপিতে উৎকীর্ণ হয়েছিল ৬০ সেনটিমিটার উঁচু এক প্রস্তর ফলকের গায়ে, নেখেনে এক মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে তা পাওয়া গিয়েছে। দেখা যায় মুকুটধারী রাজা এক হাতে উত্তরদেশীয় শত্রুর চুলের মুঠি ধরে অন্য হাতে দণ্ড দিয়ে তাকে প্রহার করছে, নিচে পলাতকরা প্রাণপণ ছুটছে। উপর দিকে ছ'টি জলপদ্মের শীর্ষে বসে এক বাজ পাখি, তার সাংকেতিক অর্থ এই যে রাজার প্রতীক শ্যেন দেব হোরাস ৬০০০ উত্তরী শত্রুকে বন্দী করে নিয়ে যাচ্ছে। আরও ঊর্ধ্বে খোদিত শামুক জাতীয় সামুদ্রিক প্রাণী এক কাট্‌লফিশ অর্থাৎ নার এবং একটি বাটালি অর্থাৎ মার, দুইয়ে মিলে রাজার নাম নার্মার। ফলকটি পৃথিবীর প্রথম ঐতিহাসিক দলিল এবং এই যে ছবির সংকেতে বন্দী ও তাদের সংখ্যা এবং রাজার নামোচ্চারণ এও চিত্রলিপি, মিশরী লিখনের এ যাবৎ আদিতম দৃষ্টান্ত। এই ধরনের

















চিত্র ২৩। প্রাথমিক লিপি। উপরে সুমেরী কিউনেইফর্ম ; নিচে মিশরী হায়ারোগ্লিফ, প্রতিটি চিহ্ন একটি বস্তু, ধারণা বা ধ্বনির প্রতীক ; ডাইনে সিন্ধু তীরের সীলে ছবির উপরে চিত্রলিপি, এখানে বাঘ, হাতি ও ষাঁড়ের সন্ধি এক কাল্পনিক জন্তু রূপায়িত।

চিত্রলিপির নাম হায়ারোগ্লিফ, অর্থাৎ যাজকীয় উৎকিরণ। মিশরের প্রাচীনতম

দলিলগুলি সুমেরের মত সম্পত্তি বা পণ্য বস্তুর হিসাব নয়, তাদের থেকে মিশরী সভ্যতার উষায় ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর ইঙ্গিত পাওয়া যায়। হায়ারো-গ্লিফ লিপির ছবিগুলি বোঝাত সম্পূর্ণ শব্দ বা শব্দাংশ, ধারণা বা ধ্বনি, যেমন আমরা উপরোক্ত দৃষ্টান্তে দেখেছি—সেখানে রাজার নাম তৈরি হয়েছে দুটি সম্পূর্ণ ভিন্নার্থক শব্দের ধ্বনি জুড়ে।

সুমেরী চিত্রলিপির মত এই প্রাথমিক মিশরী লিখনও ক্রমশ অধিকতর সাংকেতিক হয়ে পড়ল, তেমন এক সাধারণের লিপির নাম ডিমোটিক, অর্থাৎ প্রাকৃত। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী সৈন্যরা মিশের রোজেটা শহরের অদূরে খাত খুঁড়তে খুঁড়তে একটি শিলা ফলক পেয়েছিল, তাতে ১৯৭ বিসি নাগাদ এক অনুশাসন লিখিত হয়েছে আদি চিত্রলিপি, ডিমোটিক এবং প্রাচীন গ্রীসীয় ভাষায়। এই বিখ্যাত রোজেটা শিলার সাহায্যে গত শতাব্দে এক তরুণ ফরাসী প্রতিভা মিশরী চিত্রলিপির পাঠোদ্ধার করেন, তা এক অতি রোমাঞ্চকর কাহিনী।

অল্প কয়েকটি চিত্র-সংকেত থেকে আরম্ভ করে চিহ্নের সংখ্যা ক্রমশ বেড়েছে। এক সময়ে লিপিকরদের ৭০০ সংকেত মুখস্থ করতে হয়েছে, মিশরেও মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিল তারা, লিখতে পড়তে জানা সরকারী জীবিকার প্রবেশিকা বলে গণ্য হয়েছে। মন্দিরের দেয়াল ও থাম জুড়ে, স্মারক সৌধ ও স্তম্ভের গায়ে মিশরী লিপিকররা সযত্নে এঁকেছে তাদের চিত্রলিপি, তা ছাড়া তা স্থান পেয়েছে নানা জায়গায়, যেমন ছোট খাটো ব্যবহারের বা বিলাসের বস্তুতে। এক কৌটোতে অঙ্কিত রাজা টুটানখামেনের একটি ছবিতে দেখা যায় রথারোহী নৃপতি ধনুর্বাণে শত্রু নিপাত করছে (যদিও সম্ভবত সে কখনও যুদ্ধে যায় নি)। এই রাজারই সমাধিতে পাওয়া গিয়েছে সাদা অর্ধস্বচ্ছ অ্যালাবাসটারের তৈরি এক নিখুঁত অনবদ্য পান-পাত্র, তার কানা জুড়ে হায়ারোগ্লিফে লিখিত এই প্রার্থনা যে রাজার যেন লক্ষ লক্ষ বছর কাটে সুশীতল বায়ুর দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে, দুই চোখে সুখ নিরীক্ষণ করতে করতে।

মিশরীরা প্যাপাইরাসের নৌকা বানিয়েছে, এই উদ্ভিদটি লিখিত পাঠের বিকাশও অনেকটা এগিয়ে দিল, কারণ সাধারণ দলিলের কাজে মাটির পাটার চেয়ে অনেক উৎকৃষ্ট ও উপযুক্ত বস্তু তৈরি হয়েছে তার থেকে। এই তরুর আঁশালো অংশ সমান করে কেটে পাশাপাশি সাজিয়ে পিটিয়ে চ্যাপটা করেছে তারা, ফলে

হয়েছে লম্বা মসৃণ পাতা, তার উপর লিপিকর থাগের কলম দিয়ে লিখেছে রঙিন কালিতে। এই প্যাপাইরাস পত্র থেকেই ইংরেজি পেপার শব্দের উৎপত্তি। ভূমধ্য সাগর অঞ্চলের দেশে দেশে এই পত্র প্রচলিত হয়েছিল, সেখানে তা আমদানি হয়েছে প্রধানত লেবাননের বিব্‌লস শহর থেকে. বিবলস দিয়েছে বাইবেলের নাম। প্রকৃত· কাগজ আবিষ্কার হয়েছে সম্ভবত খ্রীষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীর সন্ধি কালে চীন দেশে, আবার এক প্রবাদ বলে ৫০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ তা এক চৈনিক নপুংসকের কীর্তি।

মিশরী লিপি শুধু ইতিহাস বা প্রশাসন সম্পর্কিত ছিল না, তা জ্ঞান চর্চায়ও ব্যবহার হয়েছে। গণিত বিদ্যা স্থাবর সম্পত্তির জরিপে বা কর নির্ধারণে প্রয়োজন হলেও তার থেকে ভগ্নাংশ, বর্গমূল, বৃত্তের ক্ষেত্রফল. বেলনের (cylinder) আয়তন ইত্যাদির হিসাব শিখল লিপিকররা। আকাশে কিছু কিছু তারার স্থান নির্দেশ করে মিশরীরা নাম দিয়েছে। ৩৬৫ দিনের বছর তাদেরই আবিষ্কার এবং তাকে ১২ মাসে ভাগ করা তাদেরই উদভাবন. নীল নদের বাৎসরিক বন্যার অব্যবহিত আগে লুব্ধক তারার উদয় থেকে তারা বছর মাপত, তা আমরা আগে দেখেছি। মামি তৈরির অভিজ্ঞতায়, নানা ভেষজের পরীক্ষায় মিশরী চিকিৎসক ও অস্ত্রচিকিৎসকদের অর্জিত. বিখ্যাত জ্ঞানের কিছু কিছু লিপিবদ্ধ অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে, রোগ নির্ণয় ও তার চিকিৎসায় যাদু এবং মন্ত্র বলে ভূত ছাড়ানো থাকলেও কোনও কোনও বিশেষ অসুখের চিকিৎসা আধুনিক বিদ্যার সমর্থন পেয়েছে, ভাঙা হাড় সম্পর্কিত একটি প্যাপাইরাস পত্রে আশ্চর্য অগ্রসর জ্ঞানের সাক্ষ্য দেখা যায়।

সাহিত্যে ঐতিহাসিক বা প্রাবাদিক বিষয়ে বেশ কয়েকটি জনপ্রিয় গল্প টিকে আছে। পরবর্তী কালের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দেশীয় নানা উপকথায় রূপকথায় তার কিছু কিছুর আভাস পাই আমরা, যেমন সিন্ধুবাদ ও আলিবাবার কাহিনীতে, নিদ্রিতা রূপসী বা ট্রয়ের ঘোড়ার উপাখ্যানে। সুমেরের মত জ্ঞানগর্ভ প্রবচনও দেখা যায়, যেমন "নিজের বিদ্যা নিয়ে বুক ফুলিয়ো না, জ্ঞানী হলেও অহংকার করো না। অজ্ঞানী ও জ্ঞানী দুইয়েরই বুদ্ধি নিয়ো…।"

সিন্ধু উপত্যকায়ও লিপি ব্যবহার হয়েছে, প্রায় ৪৫০০ বছর আগে, চিহ্নের সংখ্যা প্রায় ২৭০, তবে মাটির পাটা বা দেয়ালের গায়ে লেখার রীতি ছিল না। কিছু বর্শা ফলক, পাত্র এবং অন্যান্য বস্তুর উপর উৎকীর্ণ লিখন ছাড়া অধিকাংশই দেখা যায় ছোট ছোট পাথরের ফলকে খোদাই করা ছবির উপর দিকে, অনেক চেষ্টা

সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত এই লিপি পড়া সম্ভব হয় নি (চিত্র ২৩)। শুধু মহেনজো-দারোতেই এমন বস্তু পাওয়া গিয়েছে ১২ শতাধিক। নরম পাথরের গায়ে সযত্নে উৎকীর্ণ হয়েছে ষাঁড় গণ্ডার হাতি বাঘ ইত্যাদি পশুর বাস্তব চিত্র, এমন কি এক-শিঙের কাল্পনিক জন্তু ইউনিকর্ন পর্যন্ত, তা ছাড়া আছে দেবতা ও মানুষের রূপায়ণ। প্রায় সব ছবিই বিভিন্ন বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা তারা সীলমোহর, সুমেরের মত সম্পত্তির উপর দস্তখতের কাজ করেছে—লিপির চিহ্নগুলি ব্যক্তি বিশেষের নামাঙ্কন, হয়তো শস্য বা নির্মিত বস্তুর গায়ে তাদের ছাপ মারা হয়েছে, তাদের প্রাচুর্যও বাণিজ্যে ব্যবহার সমর্থন করে। আবার অধিকাংশেরই পিছনে আংটা ছিল, তার থেকে মনে হয় তাদের তাবিজের মত দেহে ধারণ করা হয়েছে যাদু বা দৈব শক্তির প্রতি বিশ্বাস থেকে—ছবির দৃশ্য অনেক ক্ষেত্রে ধর্ম জীবনের প্রতি ইঙ্গিত করে, যেমন জমকালো মুকুট শোভিত পশুপরিবৃত এক পুরুষকে আদি পশুপতি শিব বলে সন্দেহ করা হয়।

সিন্ধু লিপি ব্যবহার হয়েছে প্রায় ১৫০০ বিসি পর্যন্ত, আর্যদের আগমনের সময় থেকে ঐ সভ্যতা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। আর্যরা লেখার পক্ষপাতী ছিল না, বেদ লিখলে নরকে যেতে হত ("বেদানাং লেখকাশ্চৈব তে বৈ নিরয়গামিনঃ"), তাই আর্য ধর্ম ও দর্শনের প্রকাণ্ড বাক্য ভার শ্রুতি রূপে মুখ পরম্পরায় চলে এসেছে শত শত বছর ধরে. বস্তুত খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের মাঝামাঝি অশোকের শিলালিপির আগে ভারতে আর লিখিত পাঠ দেখা যায় না। সুতরাং সেই বিচারে সিন্ধু সভ্যতা ও আর্য সভ্যতা প্রাগৈতিহাসিক, যদিও তৎকালীন লোক নিরক্ষর বা অসংস্কৃত ছিল না কোনও মতেই। বলা বাহুল্য, ইতিহাস-প্রাগিতিহাসের সন্ধি রেখাটি অনড় নয়, নতুন গবেষণার সঙ্গেও ক্রমে পিছিয়ে যেতে পারে তা।

সিন্ধু লিপির পাঠোদ্ধার না হয়ে থাকলেও অন্যান্য আবিষ্কার থেকে সেই সভ্যতা সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছু জানি। সীলের মাত্র গোটা কয়েক চিহ্ন হয়তো নাম বা সংক্ষিপ্ত বাক্য রচনা করেছে. তার তুলনায় সুমের বা মিশরের লিখন সম্ভার অবশ্য অতীব বিস্তীর্ণ। আমরা দেখেছি লিপির জনক সুমেরের সামাজিক জীবন মূর্ত হয়েছে কয়েক হাজার লিপিপটে. লিখিত পাঠের সহায়তায় সভ্যতার সব শাখা শহর বাণিজ্য প্রশাসন বিদ্যা সাহিত্য ইত্যাদি দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। সুমেরী লিপি গ্রহণ করে পশ্চিম এশিয়ায় অন্যান্য অঞ্চলও এগিয়ে গিয়েছে। মিশরকে

নিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের আদি সভ্যতাগুলির ইতিহাস ও সম্যক পরিচিতির বাহক হল লিপি, তাই বলা যায় লিখন দিয়েই ইতিহাসের সূচনা, সভ্যতার আরম্ভ।

অবশ্য এখানে একটা কথা বলে রাখা ভাল। লিপির সাহায্যে প্রাথমিক রাজকুলের বংশাবলী তৈরি হয়েছে, সেইখানে প্রকৃত অর্থাৎ ইতিহাসের গোড়া পত্তন ধরা হলেও এ সব দলিল সর্বদা সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য নয়; যেমন সুমেরীরা ২০০০ বিসির আগে কোনও এক সময়ে রাজ-তালিকা বানাতে আরম্ভ করে বিস্মৃতির তিমিরে এত দূর পিছিয়ে গিয়েছে যে প্রথম দিকের আট রাজার যুক্ত রাজত্ব কাল দাঁড়িয়েছে ২,৪১,২০০ বছর। আসলে প্রায় ২৮০০ বিসি থেকে সুমেরের মোটামুটি সুসংলগ্ন ইতিহাস মেলে। এ যুগে জনৈক ভারতীয় লেখক মেগাস্থিনিসের এক মন্তব্যের উপর রং চড়িয়ে এক রাজ-তালিকা বানিয়েছেন, তাতে নাকি প্রমাণ হয় আর্যরা এ দেশে এসেছে ৬৭৭৭ বিসিতে। অতিশয়োক্তি মানুষের মজ্জাগত প্রবৃত্তি, বিশেষত মাতৃভূমির ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে—যেমন এ কালে তেমন সে কালে।

১৩। গ্রাম থেকে শহর

মানব সমাজে সভ্যতার ধাত্রী প্রখ্যাত নদী টাইগ্রিস, ইউফ্রেটিস, নীল ও সিন্ধু, এদের কূলে কূলে আজ থেকে ৫৫০০-৪৫০০ বছর আগে লিখিত ভাষার সঙ্গে গড়ে উঠেছে আদি ঐতিহাসিক শহরগুলি। জেরিকো ও চাটাল হুয়ুক আরও কয়েক হাজার বছর প্রাচীন, কিন্তু চতুর্দিকে গ্রাম্য জীবনের মধ্যে তারা আকস্মিক বিচ্ছিন্ন উদাহরণ। তাদের যখন দিন ফুরিয়ে গেল তখন সুদীর্ঘ ছেদ পড়েছে, ধারাবাহিক নাগরিক ঐতিহ্য গড়ে উঠতে পারে নি। তা ছাড়া সে সব শহরের প্রাচীর গৃহ মন্দিরাদি বিস্ময়ের বস্তু হলেও অন্যান্য বিষয়ে আমাদের জ্ঞান সীমিত, তার একটা কারণ তাদের প্রাচীনতা, দ্বিতীয়ত লিপির অভাব। লিখিত পাঠ যে ঐতিহাসিক কালের প্রথম শহরগুলির বহুমুখী জীবন ধারার কেমন সর্বাঙ্গীণ পরিচয় দিয়েছে তা আমরা একটু আগে দেখেছি। এই সূচনার থেকে নগর জীবন আজ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন ও বর্ধিষ্ণু।

শহর বলতে কি বোঝায়, কোন হিসাবে তারা বসতি, গ্রাম বা জনপদের থেকে পৃথক তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে অনেক কথা হয়েছে। জেরিকোর আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা উল্লেখ করেছি যে শহরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য সমষ্টির স্বার্থে নির্মাণ কাজ, যথা প্রাচীর খাল মন্দির। তা ছাড়া আরও কয়েকটি নির্ণায়ক হল স্থায়ী ও দীর্ঘ বসবাস, আয়তন ও জনসংখ্যা, যার কিছুটা আন্দাজ পাওয়া যায় ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ঘর বাড়ির ঘনতা এবং কবরখানা থাকলে তাতে কবরের গণনা থেকে। এই সবের বিচারে শহর পারিবারিক গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের চেয়ে বৃহৎ ও পৃথক। সেখানে পুরবাসীরা বিভিন্ন জীবিকায় নিযুক্ত, সুতরাং অন্যের উপর অল্প বিস্তর নির্ভরশীল, তাদের মধ্যে সুখ সুবিধা, দায়িত্ব, ক্ষমতা, মর্যাদা, ধন সম্পত্তি ইত্যাদি বিষয়েও ভেদাভেদ, অর্থাৎ সামাজিক শ্রেণী বিভাগ বেড়ে চলেছে।

আজও দেশে দেশে সভ্যতার বাহ্যিক রূপ সবচেয়ে প্রত্যক্ষ প্রতীয়মান শহরের চেহারায়, তার হর্ম্যমালায়। এই সৌধশ্রেণীর বনিয়াদও আর এক প্রাগৈতিহাসিক উদ্‌ভাবন—আমাদের অতি পরিচিত সামান্য ইট। মানুষ যখন অস্থায়ী যাযাবর জীবন

ত্যাগ করল তখন থেকে সে নিজ বাস গৃহের দিকে ক্রমশ বেশী নজর দিয়েছে. তারই পরিণতি আজকের আকাশচুম্বী অট্টালিকায়। মিশরের চাষীরা প্রথমে দেয়াল বানিয়েছে নলখাগড়ার গায়ে কাদা লেপে, সুমেরীদের পূর্বগামীরা সুড়ঙ্গের মত ঘর বানাত খাগড়ার গোছার উপর মাদুর চাপিয়ে। দেখতে দেখতে মিশর ও এশিয়াতে দেখা দিল মাটির ঘর, যার প্রচলন আজও ব্যাপক। নবপ্রস্তর যুগের প্রথম দিকেই ব্যবহার হয়েছে রোদে শোকানো কাঁচা ইট. এবং ৩৫০০ বিসির আগে পোড়া ইট—স্থায়ী ইমারত বা প্রাচীরের যা দেহকোষ, এ যুগের সৌধ শিল্পের প্রাণবস্তু। কাঁচা ইটের ব্যাপক ব্যবহার আমরা জেরিকো থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন জায়গায় দেখেছি. পোড়া ইট ঐতিহাসিক কালের কিছু আগে সুমের ও মিশরে আগে পরে দেখা যায়। আরও পরে মহেনজোদারো ও হরপ্পা শহর গড়ে উঠেছে এই ইষ্টকের উপর, তাদের ঘর বাড়ি পুষ্করিণী পথ ঘাট নর্দমা সবই পোড়া ইটে তৈরি। একেবারে প্রথম ইট ছিল শুধু হাতে চাপা এক তাল কাদা, যেমন আদি জেরিকোতে। পরে তার রূপ দেওয়া হয়েছে চার পাশে কাঠ বসিয়ে, চতুষ্কোণ বলে তা পর পর গেঁথে যাওয়া অনেক সহজ।

মেসোপটেমিয়ার আদিতম শহরগুলিতে পরস্পর ইট জুড়তে প্রধান গৃহগুলিতে ব্যবহার হত শিলাজতু, আর সাধারণ ঘরে কাদা. দুইই প্রায় চার সেনটিমিটার পুরু করে। রোদে শোকানো কাঁচা ইট এবং পোড়ানো ইট দুইয়েরই প্রায় সমান প্রয়োগ দেখা যায় ঐতিহাসিক কালের সুমেরী সভ্যতা পর্যন্ত, তার পর কাঁচা ইট ধীরে ধীরে অপ্রচলিত হয়ে পড়ল। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে য়োরোপে রোমীয় সভ্যতার প্রতিষ্ঠা কালে দুই ইটই ব্যবহার হয়েছে এবং এমন কি প্রায় সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত কাঁচা ইট সেখানে কোথাও কোথাও দেখা যায়, যেমন ইংল্যানডে নরফোক অঞ্চলের প্রাচীন কুটিরে।

ইটের উদভাবনে আশ্চর্য কিছু নেই, এক তাল কাদার সঙ্গে হয়তো খড়ের টুকরো মিশিয়ে কাঠের ছাঁচে চেপে তাকে সমরূপ আকৃতি দেওয়া, পরে রোদে শুকিয়ে কিংবা আগুনে পুড়িয়ে তাকে শক্ত করা—কাদা পোড়াবার বিদ্যা তো আগেই জানা ছিল। কিন্তু এই সহজ ও সামান্য বস্তুটি হাতে পেয়ে গৃহনির্মাতার স্বাধীনতা ও ক্ষমতা অনেকখানি বেড়ে গেল। এর আগে পোড়া মাটির রহস্য শিখে যেমন পাত্র সৃষ্টিতে মানুষ কল্পনার রাশ ছেড়ে দিতে পেরেছিল, এ ক্ষেত্রেও

তেমনি নিজের খুশি মত ইটের পর ইট সাজিয়ে নানা আকৃতি নানা রূপ নিয়ে খেলা করা সম্ভব হল—এক কথায় জন্ম নিল প্রকৃত স্থাপত্য শিল্প, সম্ভব হল পাকাপোক্ত বৃহদাকার গৃহ নির্মাণ।

অবশ্য. যেমন দেখা গিয়েছে প্রথম পাত্র ভাণ্ডারের রূপায়ণে তেমনি গৃহের পরিকল্পনাও আদি কালে মামুলী মূর্তির প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারে নি। এই ধরনের অনুকরণ কি করে যুগের পর যুগ চলে আসতে পারে তার একটি দৃষ্টান্ত আজও দেখা যায় ঢেউকাটা স্তম্ভে। ইট ব্যবহারের অনেক আগে মিশরীরা নল-খাগড়ার গোছা দিয়ে থাম বানাত, পরে গ্রীসীয়রা যখন প্রস্তর স্তম্ভ বানাতে শিখল তখন তারা তার গোল দেহ খুঁড়ে ঢেউ খেলিয়ে দিল সনাতন চেহারার সঙ্গে মেলাবার জন্য। প্রাচীন ধারার এমনই প্রভাব যে আজ এই সিমেন্ট কংক্রিটের যুগেও রমণীয় সৌধের পুরোভাগে এই স্তম্ভশ্রেণীর স্থান। আদি কালের সুমের অঞ্চলে যে সুড়ঙ্গের মত খাগড়ার ঘর ছিল, পরে ইট দিয়ে তার গোল ছাত অনুকরণ করতে গিয়ে সুমের কিংবা অ্যাসিরিয়ার লোকে প্রকৃত খিলান আবিষ্কার করেছে এবং এর মাধ্যমে বল-বিদ্যার অনেক জটিল নীতি অজ্ঞাতসারে প্রয়োগ করেছে গৃহ নির্মাণে। এমনি আরও কত আবিষ্কার হাজার হাজার বছর ব্যবহার করবার পর মানুষ ধরেছে তাদের অন্তর্নিহিত বৈজ্ঞানিক নীতি।

মেসোপটেমিয়ায়, জোড়া নদীর দক্ষিণাঞ্চলে ৩৫০০-১৮০০ বিসির মধ্যে দেখা দিয়েছিল গোটা বারো শহর, জেরিকো বা চাটালের তুলনায় অনেক বড়, অনেক জটিল তারা। এই স্বতন্ত্র অর্ধ-স্বাধীন শহর-রাজ্যগুলি নিয়ে প্রসিদ্ধ সুমেরী সভ্যতা, যার চাকা, লেখা প্রমুখ নানা উদভাবনের প্রয়োগ ও প্রভাব আজও বাড়ন্ত আমাদের দৈনিক জীবনে। একদা আদি কৃষিবাসীরা এই যুগল নদীর অববাহিকায় প্রতিকূল পরিবেশ আয়ত্ত করতে করতে বসতি স্থাপন করেছিল, সেই হীন সূচনা থেকেই গড়ে উঠেছে এই ইতিহাস-বিখ্যাত শহরগুলি, যেমন খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ সহস্রকে 'আর' ও এরিদু, আরও পরে ঐ সহস্রকেই উরুক এবং ৩১০০ বিসি নাগাদ নিপুর। মিশরের মত তারা কখনও এক শাসকের অধীনে সংযুক্ত হয়নি, তাই সুমেরী সভ্যতার আর এক দান যুদ্ধ বিগ্রহ। যার পরিণতি আজ হাইড্রোজেন বোমায় তা শুরু হয় এই সব শহর-রাজ্যে—অশ্বরথে চড়ে তাদের যোদ্ধারা লড়েছে নিজেদের মধ্যে এবং বহিরাগত শত্রুদের প্রতিরোধ করতে। এই

আক্রামকরা পরে মেসোপটেমিয়ার উত্তরাঞ্চলে ব্যাবিলনিয়া, অক্কদ ও অ্যাসিরিয়া রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছে. তারাও গড়েছে প্রসিদ্ধ মহান শহর, যথা ব্যাবিলন এবং অ্যাসিরিয়ার রাজধানী নিনেভে। ঘন জনতার উদর পূর্তির জন্য দরকার হয়েছে বর্ধিত কৃষি ও খাদ্যোৎপাদন. আরও বিবিধ প্রয়োজন মেটাতে বহির্জগতের সঙ্গে খাদ্য ও অন্যান্য বস্তুর বিনিময়. জলে স্থলে গড়ে উঠেছে বাণিজ্য, আবার কোথাও কোথাও কোনও মূল্যবান সামগ্রীর (যেমন অবসিডিয়ানের) আবিষ্কারের ফলে সেখানে জনসমাগম শহরে পরিণত হয়ে থাকতে পারে।

বর্তমান জগতে কেনা বেচা হয় মুদ্রার বদলে, তার ইতিহাস সম্বন্ধে এখানে দু কথা বলা যেতে পারে। সভ্যতার আগে বহু কাল ধরে সাধারণ মানুষ তার কাজের জিনিস সংগ্রহ করেছে বিনিময় কারবারে। যার কিছু একটা বেশী আছে সে বাজারে গিয়ে দেখেছে তার পরিবর্তে দরকারী বস্তু কি পাওয়া যায়—নুন, খেজুর, পশু চর্ম, গহনা, অস্ত্র উপকরণ ইত্যাদির চাহিদা ছিল এবং সহজে বিনিময় হত। কেউ হয়তো গরু কিনেছে অনেকগুলি ছুরির বদলে, কেউ আটটি গরু দিয়ে পেয়েছে তার সহধর্মিণী। তার পর পয়সার প্রতীক রূপে বিভিন্ন স্থান কালে নানা জিনিস ব্যবহার হয়েছে, যেমন ঝিনুক. বঁড়শি, মুক্তা, পুঁতি, বীজ, গোল মরিচ– অনেক ক্ষেত্রে তাদের স্বকীয় মূল্য বেশী কিছু নয়, তারা মূল্যের প্রতীক বলে মানিত। এই শ্রেণীর মুদ্রার আদিতম দৃষ্টান্ত সম্ভবত কড়ি, এশিয়ায় ২৫০০ নাগাদ তার প্রচলন—আমরা এখনও বলি পয়সা কড়ি।

ক্ষুদ্র কড়ি বা পুঁতির মত সজীব ভেড়া শুয়োর গরু এবং ক্রীতদাসও বিনিময় হয়েছে, তাদের নিজ গৌরবে। পালিত জন্তুরা বাচ্চা দেয়, তাদের বয়ে বেড়াতে হয় না, নিজেরাই চলে, এই সব কারণে তাদের মূল্য বেশী ছিল, বিশেষত পালকদের মধ্যে। ইংরেজি ক্যাট্‌ল্‌ ও ক্যাপিটাল শব্দের উৎপত্তি ল্যাটিন কাপিটাল থেকে, যার অর্থ সম্পত্তি। ভারতে আর্যদের কাছে গাভীর কত সমাদর ছিল তা আমরা জানি। ধাতুর প্রচলনের পর তারা ধীরে ধীরে মূল্যের প্রতীক রূপে অন্যান্য বস্তুর স্থান নিয়েছে, প্রথমে তামা ও কাঁসা, পরে ওজন ও আয়তন অনুপাতে দাম অনেক বেশী বলে সোনা রুপা যোগ্যতর বলে গণ্য হয়েছে। বিভিন্ন প্রতীক থেকে ধাতুতে উত্তরণ ঐতিহাসিক কালের ঘটনা মনে হয়, তখন ছাপ মারা ধাতব মুদ্রারও উদভাবন হয়েছে। মুদ্রার প্রচলনে অতিরিক্ত সামগ্রীর আদান প্রদান আরও সহজ হল, ব্যাবসা

বাণিজ্য ও সাধারণ ভাবে লোকের সাচ্ছল্য বাড়ল।

মহেনজোদারো, হরপ্পা প্রমুখ সিন্ধু সভ্যতার শহরগুলি সুমেরের তুলনায় সাম্প্রতিক হলেও তাদের কতগুলি পৌর বৈশিষ্ট্য সে কালের পক্ষে অতি উন্নত ও বিস্ময়কর। নির্মাতারা পরিকল্পনা অনুযায়ী শহর গড়তে আড়াআড়ি সমান্তরাল ছক কাটা রাস্তা বানিয়েছে, এই প্রাথমিক দৃষ্টান্তের অনুকরণ দেখা যায় এ কালের ওআশিংটনের মত নগরে। তা ছাড়া পাকা ইটের পথ, তার পাশে ঢাকা নর্দমা, বাড়িতে বাড়িতে স্নানঘর ও ময়লা জল নিকাশের ব্যবস্থা, সাম্প্রদায়িক অবগাহনের জন্য প্রকাণ্ড বাঁধানো পুষ্করিণী ও অন্যান্য সুব্যবস্থার সংযোগ যে অগ্রসর নাগরিক জীবনের সাক্ষ্য দেয় ৪৫০০ বিসির অনেক পরেও তার তুলনা দেখা যায় না।

পেশার ভাগাভাগি যে নবপ্রস্তর যুগের প্রথম দিকেই শুরু হয়েছে, যেমন বেইধাতে, তা আমরা আগে দেখেছি, সমাজ ও ব্যক্তির স্বার্থে বিভিন্ন কর্মীদের পরিচালনার জন্য নেতৃস্থানীয় লোকের অভ্যুত্থানও স্বাভাবিক। জটিল পৌর জীবনের বহু-বিভক্ত কর্ম ক্ষেত্রে এই নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয়ের প্রয়োজন অনেক গুণ বেড়েছে এবং সেই দায়িত্ব নিয়েছে পৃথক প্রশাসক শ্রেণী। শ্রমিকদের খাটিয়ে বৃহৎ পরিকল্পনার রূপ দিতে তারা হুকুম করেছে, সাজা দিয়েছে, অতিরিক্ত ক্ষমতার অধিকারে সমাজের শীর্ষে স্থান নিয়েছে। কোথাও হয়তো তাদের মধ্যে প্রবলচরিত্র কেউ নিজেকে রাজা বানিয়েছে, হয়তো যুদ্ধে বিক্রম ও নেতৃত্ব দেখিয়ে যোগ্যতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে সে। এই পেশাভেদ ও শ্রেণীভেদই জাতিভেদের ক্ষীণ সূচনা।

সুমেরী শহরগুলি যখন গড়ে উঠছিল তখন সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা নিয়েছে অভিজাত শ্রেণীর প্রবীণদের পৌর সভা। সামরিক প্রতিরক্ষার প্রয়োজন দেখা দিলে এই সভা এক নেতা নির্বাচন করত, যত দিন সংকট কেটে না যায় তত দিন সে অস্থায়ী রাজার মত কাজ করবে। সুমেরী ভাষায় রাজার প্রতিশব্দ লুগাল, তার আদি অর্থ 'মস্ত ব্যক্তি'। এই নির্বাচিত সমর্থ পুরুষ নিজের হাতে কর্তৃত্ব নিয়ে সংকট মোচন করবে, তার পর তার আপন কাজে ফিরে যাবে। কিন্তু শহর বাড়তে বাড়তে যুদ্ধের অন্তর্বর্তী শান্তিপূর্ণ কাল ক্রমেই সংক্ষিপ্ত হয়ে এল এবং লুগালের প্রশাসনও তদনুপাতে দীর্ঘতর হল—এ ভাবে ক্রমশ শক্তি বেড়ে চলল তার। ২৮০০ বিসির মধ্যে এই রাজারা শহরগুলির রাজনীতিক কর্তৃত্বে প্রবীণদের ঊর্ধ্বে স্থান নিয়েছে। পরে দৃঢ়তর হয়েছে এই অধিকার।

তা হলেও জনসাধারণের মনে ধর্ম ও মন্দিরের প্রবল প্রভাবের প্রতি দৃষ্টি রেখে লুগাল সর্বদা ঐহিক ক্ষেত্রে পুরোহিত গোষ্ঠীর সমর্থন ও আশীর্বাদ চেয়েছে। এই যাজকরা নিজেদের স্বার্থ সুবিধা নিরঙ্কুশ রাখতে রাজার নির্বাচনে পরামর্শ দিয়েছে অথবা প্রবীণদের নির্বাচন সমর্থন করা না করার অধিকার বজায় রেখেছে। পক্ষান্তরে রাজা হয়েছে একাধারে প্রধান পুরোহিত এবং শহরের প্রতিষ্ঠিত রক্ষক দেবতার লৌকিক প্রতিনিধি। প্রায়ই সে মন্দিরের আয়তন ও সৌন্দর্য বাড়িয়েছে প্রজাদের ও দেবতাদের চোখে নিজ মর্যাদা স্ফীত করতে। যত দিন রাজা দৈব অনুশাসন মেনে ন্যায়, ধর্ম ও লোকহিতের পথে চলেছে তত দিন দেবতাদের মতই ভক্তি ও সমাদর পেয়েছে সে। এ ভাবে উরুক ও অন্যান্য সুমেরী শহরে সৃষ্টি হল দুটি ধারণা—সামরিক ও রাজনীতিক ব্যষ্টি শহর-রাজ্য এবং রাজার ঐশ্বরিক অধিকার। পরবর্তী কালে মানব ইতিহাসে এই দুই ধারণার প্রভাব দেখা যায় কয়েক হাজার বছর ধরে। মিশরের অধিপতিরা দেবতার অবতার বলেই গণ্য হয়েছে।

রাজতন্ত্র ও যুদ্ধ বিগ্রহের ফলে সমাজের চেহারা আরও জটিল হল। শাসকরা দাবি করেছে দাস দাসী কারিগর উজির আমলা শস্য মাংস বস্ত্র অস্ত্র, এ সব পেয়ে প্রজাদের উপর কর্তৃত্ব বাড়ল তাদের। ধাতুর কাজও বেড়ে থাকতে পারে, সাবেক অস্ত্র যতই সুলভ হক ধাতুর মত নির্ভরযোগ্য নয়— দ্বন্দ্বযুদ্ধে ঠিক কাজের সময়ে পাথর ভেঙে যেতে পারে, কিন্তু তামার ফলা নয়। খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উৎপাদন বাড়ানো দরকার হয়েছে, কারণ শাসকরা নিয়েছে তার এক মোটা অংশ, কখনও দেশ রক্ষা বা দেশ জয়ের নামে, কখনও দেবতার অবতার অথবা প্রতিনিধির, অর্থাৎ রাজা ও পুরোহিতদের স্বার্থে; সুতরাং বহুর অতিরিক্ত উৎপাদন গিয়েছে এই সব স্বল্প-সংখ্যক পোষ্যের পুঁজি বাড়াতে। এই ব্যবস্থা য়োরোপে মধ্য যুগ পর্যন্ত চলে এসেছে, অন্যত্রও দেখা যায়।

দূর অতীতে মানুষে মানুষে সংঘর্ষ পেটের দায়ে আরম্ভ হয়ে থাকলেও পরে যখন দেখা গেল যে খাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে ধন সম্পত্তি দাস দাসী ইত্যাদিও উপরি মেলে সহজে, তখন তা ক্রমে 'বীরের খেলা' হয়ে দাঁড়াল। মেসোপটেমিয়ার প্রাচীনতম দলিল-চিত্রে রণ দৃশ্যের সঙ্গে দেখা যায় বন্দীর দল, এদের মধ্যে যারা বেঁচেছে তারা হয়তো যাবজ্জীবন ক্রীতদাস থেকেছে, শহর গড়তে দেহক্ষয় করেছে। সুমেরী ও আরও অনেক ভাষায় দাস কথাটি এসেছে 'বিদেশী' শব্দটির থেকেছে। এ ভাবে

বিজিত রাজ্যকে দুর্বল করে রাখা যাবে এমন আশা ছিল, উরুকের নথি পত্র থেকে মনে হয় অধিকাংশই ছিল দাসী, পুরুষ বন্দীদের শাসনে রাখা কঠিন অথবা অবিশ্বাস-যোগ্য ম্লেচ্ছ বলে প্রায়ই মেরে ফেলা হয়েছে। পক্ষান্তরে তাদের থেকে শ্রমসাধ্য কাজ অনেক বেশী পাওয়া যায়, সুতরাং এই অনুমান ভুল হতে পারে। বিদেশী বন্দীরা ছাড়াও দরিদ্র প্রজারা সম্ভবত সপরিবারে নিজেদের বিক্রি করেছে, ধনী গৃহে বা মন্দিরে খাদ্য ও আশ্রয়ের বদলে। আজকের জগতেও যেমন রাজা আছে (যদিও তারা নখদন্তহীন), তেমনি দাস প্রথাও টিকেছে অল্প দিন আগে পর্যন্ত। রাজারা অবশ্য সৎ কাজেও পথ দেখিয়েছে. ব্যাবিলন অধিপতি হামুরাবি ১৭৫০ বিসি নাগাদ প্রথম আইন-সংহিতা প্রণয়নের জন্য বিখ্যাত. কিন্তু প্রায় ২১০০ বিসিতে সুমেরে আর-নামু রাজার প্রণীত আইন লিপিবদ্ধ করা হয়েছে. ব্যাবসা সংক্রান্ত কারবার. জমির মালিকানা ইত্যাদি সম্বন্ধে বিরোধ রোধ করতে।

সবচেয়ে উপরে রাজা, নিম্নতম স্তরে দাস, মাঝখানে সমাজ ভাগ হল নানা ধাপে। রাজা, পুরোহিত ও প্রবীণ জ্ঞানীদের নিচেই ছিল ধনী সম্প্রদায়—বড় বড় জমিদার ও বণিক ব্যবসায়ী যাদের তরীশ্রেণী পণ্য বহন করে নিয়েছে দূর দূরান্তরে—পারসীক উপসাগর সিন্ধু ও নীল নদের বন্দরে। এই বিত্তসম্পন্নদের অধঃস্তরে আমলা. ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, দোকানী ইত্যাদি. তার পর নাবিক, কৃষক, জেলে, জলবাহক প্রভৃতিকে নিয়ে আরও এক শ্রেণী। আজ আমরা যাকে মধ্যবিত্ত পেশাদার বলি সুমেরে আদি ঐতিহাসিক কালেই ধনী দরিদ্রের মাঝখানে তাদের সৃষ্টি হয়েছিল। সিন্ধু সভ্যতার শাসক কারা ছিল. কি ধরনের কর্তৃত্ব ছিল তাদের তা রহস্যাবৃত, কিন্তু এই সভ্যতার শুরুতেই দেখা যায় বিভক্ত সমাজ—অপাঙক্তেয় শ্রমিকদের জন্য পৃথক বাস ব্যবস্থা বা 'কুলি লাইন', কুলীন শাসক শ্রেণীর হাতে অতিরিক্ত খাদ্য সঞ্চয়, ইত্যাদি।

আগে আমরা এক কাল্পনিক গ্রামকে কেন্দ্র করে আদি নবপ্রস্তর পল্লী সমাজের দৈনন্দিন গৃহস্থালির ছবি আঁকতে চেষ্টা করেছি অল্প কয়েকটি কথায়, এখানে এক বাস্তবিক গড়ন্ত শহরের জটিলতর জীবনের যুক্তিসংগত অনুমান করা যেতে পারে। শহরটি সুমেরের এরিদু, প্রত্নবিজ্ঞানীর কুড়াল এখানেও স্তরে স্তরে ক্রমোন্নতি উনমোচন করেছে—বসতির থেকে গ্রাম, তার থেকে ছোট শহর, শেষে নগর।

৪০০০ বিসিতে প্রাগিতিহাসের অন্তিম পরিচ্ছেদের পৃষ্ঠা খুললে দেখা যায় এরিদু গড়ে উঠেছে বেশ একটু উঁচু জমিতে, নিচে অবশ্য পূর্বতন সম্প্রদায়দের সমাধি। এখানে দাঁড়িয়ে প্রথমেই অদূরে চোখে পড়ে ইউফ্রেটিস নদী, তার জলে পাল তুলে চলেছে নৌকার শ্রেণী। পারের কাছে লক্ষ্য করা যায় সাধারণ লোকের নানা দিনগত কার্যকলাপ—নদীর জল সেখানে আনা হয়েছে নালি কেটে তার পাশে কেউ হাল চালাচ্ছে কেউ খাগড়ার নল কাটছে কোনও কাজের জন্য, কেউ খেজুর পাড়ছে গাছে চড়ে। লোকসংখ্যা প্রায় ২০০০, এখানে চতুর্দিকে গ্রামের লোকেরা এসে জড়ো হয় দৈনিক প্রয়োজনের জিনিস বেচাকেনা করতে। মাঝে মাঝে দূর দেশের বণিক জহুরীরাও আসে আরও জমকালো পসরা নিয়ে—ইরানের গাঢ় নীল ল্যাজাবর্দ, মিশরের চিকন অ্যালাবাসটার, লোহিত সাগরের উপকূলে কুড়ানো কত রঙে রং করা বিচিত্র শাঁখ ঝিনুক। আগে এত রকমারি জিনিস চোখেও দেখা যেত না, এখন চলা ফেরার সুবিধা হয়েছে, বিশেষ করে নদী পথে। তার ফলে টাইগ্রিস ইউফ্রেটিসের দুই তীরে ছোট ছোট শহর দেখা দিচ্ছে।

এরিদুতে কয়েক ঘর পাকা বাড়ি চোখে পড়ে, কিন্তু ইট এখনও খুব চলতি নয়, অধিকাংশ ঘরই সরল সাধারণ, তাদের খিলান করা কাঠামো খাগড়া আর হোগলা দিয়ে তৈরি, হাওয়া খেলবার জন্য দু দিক খোলা। কিন্তু সব কিছুর উপরে মাথা তুলে এক মন্দির সূর্যালোকে ঝলমল করছে শহরের উত্তর দিকে। মন্দিরের সোজা সোজা দেয়াল অবশ্য ইটের তৈরি, শাঁখের গুঁড়ো লেপে 'চুনকাম' করা। এই গৃহের পরিকল্পনা অনেকখানি স্থাপত্য প্রতিভার পরিচয় দেয়, এর সৃষ্টি যৌথ প্রয়াসের উজ্জ্বল নিদর্শন। এখানে কত পূজারীর আনাগোনা, কত রকম তাদের সাংকেতিক ক্রিয়া কলাপ। সামনে প্রশস্ত চত্বর—উত্তর কালের সাক্ষ্য থেকে মনে হয় শুধু পূজা পার্বণে নয়, হাট বাজারে কিংবা সভায় উৎসবে নিতান্ত অকাজে তা সাধারণের মিলন ক্ষেত্র। হয়তো বিশেষ উপলক্ষে এবং বিপদে আপদে সেখানে শহরবাসীদের ডাক পড়ে, গণ্যমান্য ব্যক্তিরা বক্তৃতা করেন ;—কারুকার্যখচিত রাজদণ্ডের মত জিনিস পাওয়া গিয়েছে এরিদুতে, কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার এই প্রতীকটি বোধহয় অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের ব্যবহার্য ছিল। এই আভিজাত্য ও সম্ভ্রমের কারণ হয়ে থাকতে পারে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা, ধন, উচ্চ বংশ, প্রবীণ বয়স বা বিদ্যা বুদ্ধি।

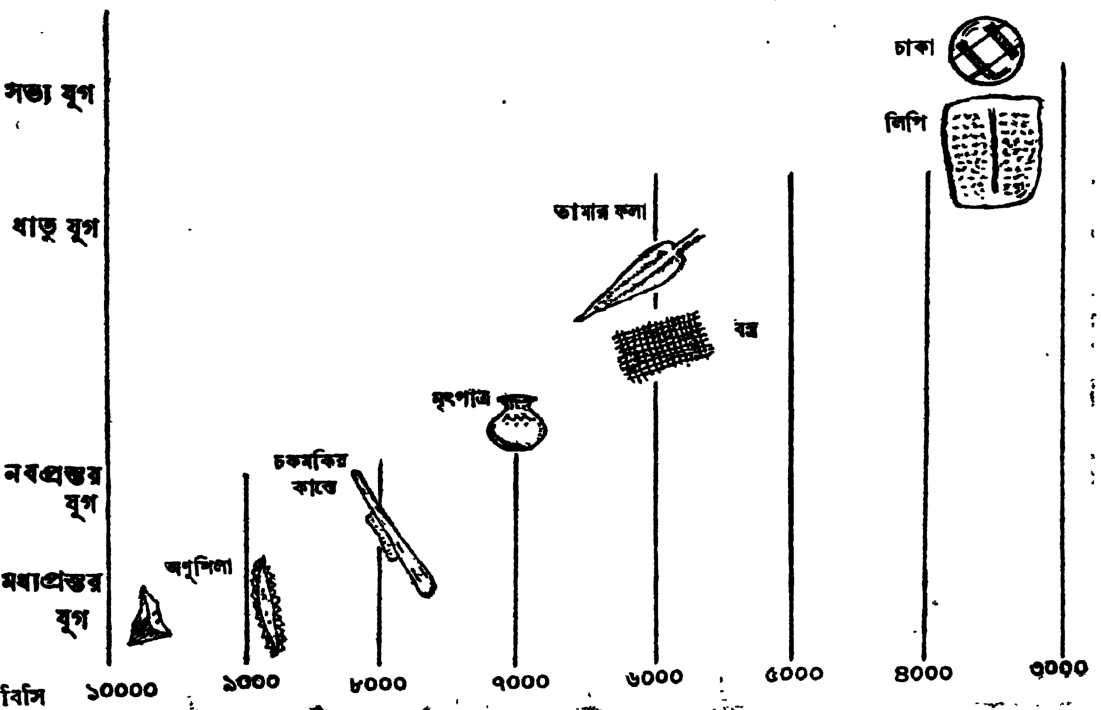
এরিদুর লোকে যে চাষ, বাজার, কারিগরী কাজ বা অদৃশ্য দেবতা ইত্যাদি প্রয়োজনীয় ব্যাপারের চর্চা ছাড়া আর কিছু জানত না তা নয়, তারা যে হাসত খেলত শিল্প চর্চা করত তার প্রমাণ আছে, অথবা অনুমান সম্ভব। হয়তো মন্দিরের প্রাঙ্গণেই দাবা বা ঐ জাতীয় কোনও রকম অক্ষক্রীড়ার ছক কাটা ছিল— বিবিধ নবপ্রস্তর ঘুঁটির মত বস্তু বহু উদঘাটিত হয়েছে। সংগীতের এক আদিম উপকরণও এরিদুতে পাওয়া গিয়েছে—এ কালের বাঁশের বাঁশীর মত ফুটো করা হাড়ের তৈরি বায়ু-যন্ত্র। ভাস্কর্য যে মানুষকে বহু পুরা কালেই আকৃষ্ট করেছে তা আমরা দেখেছি, এ সময়েও এ শিল্প অনাদৃত ছিল না, তবে দুটি বিষয়ে বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয়। যেমন ইতিপূর্বে হাসিলারে ও চাটাল হুয়ুকে, তেমনি কিছু কিছু মৃন্ময়ী স্ত্রী-মূর্তি তৈরি হয়েছে যারা আগের তুলনায় যৌনপ্রকৃতিসর্বস্ব নয়, শ্রোণী ভারে স্তন ভারে অতি মাত্রায় বিড়ম্বিত নয়, এদের তনুদেহের শীর্ষে চুল চুড়ো করে বাঁধা (সিন্ধু উপত্যকায়ও এই ধরনের কেশ বিন্যাস দেখা যায়), একমাত্র অস্বাভাবিকতা অদ্ভুত অমানুষিক ছুঁচালো মুখ বা মুখোস—কিন্তু তার হয়তো কোনও ধর্মগত কারণ ছিল। দ্বিতীয়ত, এরিদুতে পুরুষ দেহের পূর্ণাঙ্গ মূর্তি পাওয়া গিয়েছে—কোনও কারণে পুরুষের দেহ বা অঙ্গ ভাস্করর‍া এ যাবৎ অবজ্ঞা করে এসেছে। এখানে পালবাহী নৌকার ২৫ সেনটিমিটার লম্বা এক মাটির প্রতিকৃতিও পাওয়া গিয়েছে—পাঁচ সহস্রাধিক বছর আগের কোনও ইরাকী শিশুর খেলনা সম্ভবত।

অন্যান্য বাড়ি ঘরের তুলনায় মন্দিরটি এত চমকপ্রদ যে শহরের আত্মাটি যে সেখানেই অধিষ্ঠিত ছিল, তাকে ঘিরেই যে সাধারণের জীবন ধারা বয়ে যেত তাতে সন্দেহ থাকে না। শুধু তাই নয়, উত্তর কালে বহু শতাব্দী ধরে যে ঠিক একই জায়গায় বারে বারে মন্দির গড়া হয়েছে অতীতের ধ্বংসের উপর তাতে মনে হয় যেন একই দেবতা প্রতিষ্ঠিত থেকেছে। প্রাগৈতিহাসিক কালেই এখানে বিগ্রহ, বলি সাংকেতিক রং মন্ত্র ক্রিয়া ইত্যাদির প্রচলন হয়েছিল হয়তো। ঐতিহাসিক যুগের উষায় এরিদুর মন্দিরে ছিল এক জলদেবতার অধিষ্ঠান, তার নাম এন্‌কি। 4000 বিসিতেও কি এরই প্রভুত্ব ছিল? সে কালে মানুষের ভাগ্য জলের উপর এত বেশী নির্ভর করত যে তা আশ্চর্য নয়। অধিষ্ঠাতা বাস্তুদেবতা যেই হয়ে থাকুক, তার জন্য যে ঘর বানাতে হবে তা সামান্য মানুষের ঘরের তুলনায় যে অনেক বড় অনেক সুন্দর হবে তাতে এরিদুবাসীর মনে কোনও সন্দেহ ছিল না। কেবল এরিদু কেন, সর্বত্র সর্ব

কালে মানুষ তার স্থাপত্য প্রতিভার শ্রেষ্ঠ যত্ন ও প্রয়াস উৎসর্গ করেছে মন্দির সৃষ্টিতে। শুধু স্থাপত্যে নয়, এই রকম ব্যবহারিক প্রেরণাই যে পুরা কালে মানুষকে শিল্পী বানিয়েছে তা আমরা আগেও দেখেছি।

আদি ঐতিহাসিক কালে রাজা রাজড়াদের উপকরণ সৃষ্টিতে স্বর্ণকার ও অন্যান্য কর্মকারের নৈপুণ্য ও সৌন্দর্যবোধ দেখলে অনেক সময়ে বিস্মিত হতে হয়, যেমন সুমেরে, মিশরে বা চীনের শাং রাজ্যে। মহেনজোদারো হরপ্পার অলংকার সম্বন্ধে সার জন মার্শালের মত বিশেষজ্ঞ মন্তব্য করেছেন যে সেগুলির সৌন্দর্য ও সৃষ্টি কৌশল দেখলে মনে হয় আধুনিক লনডনের সেরা শিল্পীদের কাজ। প্রস্তর যুগের পূর্বপুরুষরাই এ সব ঐতিহ্যের সূচনা করেছে। প্রাচীন মানুষের কাজ সর্বদা রুক্ষ ও নিকৃষ্ট এমন ধারণা দূর করতে অনুসন্ধানী মন নিয়ে যাওয়া দরকার কোনও সুযোগ্য সংগ্রহশালায়, যেমন ব্রিটিশ মিউজিয়ামে ; তেমন জায়গায় পৌরাণিক ঘর-গুলিতে ঘুরে ঘুরে আদি কালের মিস্ত্রীর মনোরম সৃষ্টি আবিষ্কার করা অতি রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। নানা কালের ও নানা উপাদানের মধ্যে বিস্ময়কর কৃতিত্ব চোখে পড়বে—প্রথম কাংস্যশিল্পীদের গড়া ঢালের গায়ে কারুকাজ, নবপ্রস্তর যুগে ঘটের গায়ে আঁকা আলপনা কিংবা আরও আগের সৃষ্টি সামান্য পাথুরে হাতুড়ির মার্জিত সৌষ্ঠব দেখে মনে হবে যেন এ যুগের কাজ, প্রাচীনতর মধ্যপ্রস্তর মানুষ তার রুক্ষ চকমকির ছুরি দিয়ে বলগা হরিণের শিং কেটে বানিয়েছে যে মাছ ধরবার কাঁটা তার সূক্ষ্ম পরিপাটি গঠনের প্রতি আবদ্ধ হবে সপ্রশংস দৃষ্টি।

এই সব সৃষ্টির পিছনে ব্যবহারিক উদ্দেশ্য নিশ্চয় ছিল, কিন্তু নিঃস্বার্থ শিল্প প্রেরণাও মানুষকে অস্থির করেছে, আজ যেমন করে। বিশ্বাস করা শক্ত যে বাঁশী আবিষ্কারের আড়ালে আছে কোনও দেবতার প্রতি ভয় বা ভক্তি, শুধু তাকে খুশী করতেই এরিদুর বাতাসে সুর বেজে উঠেছিল। পুরাপ্রস্তর গুহাশিল্পীর হয়তো সময় ছিল না নিজের খেয়ালে ছবি আঁকবার, কিন্তু নবপ্রস্তর বিপ্লবের পরে জীবন সংগ্রাম আর এত কঠিন ছিল না। এরই ফলে, অবসর বিনোদনের চেষ্টাকে আশ্রয় করে মানুষের স্বাভাবিক শিল্প প্রতিভা এবং শিল্প সৃষ্টির বিবিধ সম্ভাবনা তার মনে উজ্জীবিত হয়ে উঠল। জনৈক নৃতত্ত্ববিৎ মন্তব্য করেছেন যে মানুষের সাংস্কৃতিক প্রগতির মূলে আছে সময়ের ভারে ক্লান্তি বোধ করবার একান্ত মানবিক ক্ষমতা। সভ্যতা শুধু বস্তুগত সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের বৃদ্ধি নয় যে মানসিক বিকাশ ও সৃষ্টিতে মানুষের চরম পরিচয় ও পরম তৃপ্তি তাই সভ্যতার প্রাণবস্তু।



চিত্র ২৪। মধ্যপ্রস্তর যুগের পরে মধ্যপ্রাচ্যে অগ্রগতির বিভিন্ন ধাপ।

এ বার ভারতীয় উপমহাদেশে নবপ্রস্তর ও ধাতু যুগের উপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে নেওয়া যেতে পারে। কিছু দিন আগেও বিশেষজ্ঞদের সাধারণ ধারণা ছিল যে দক্ষিণ এশিয়ায় নবপ্রস্তর বলে পৃথক কিছু নেই, ধাতু যুগের সঙ্গেই তার শুরু, কিন্তু এখন কোনও কোনও অঞ্চলে স্বতন্ত্র নবপ্রস্তর উদঘাটিত হয়েছে। যথা, বেলুচিস্থান, কাশ্মীর ও দক্ষিণ মহারাষ্ট্র এলাকায় এক পর্ব দেখা যায় যখন স্থায়ী বসবাস, পশু-পালন এবং কোনও প্রকার কৃষির সঙ্গে শুধু মাত্র পাথরের ব্যবহার চলেছে। কিন্তু এ দেশে এ সম্বন্ধে গবেষণায় এখনও যথেষ্ট ফাঁক. বিশেষত তারিখ অনেক ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নয়। আমাদের বর্ণনাও সামগ্রিক নয় বরং দৃষ্টান্তমূলক।

যে ঘষা পাথরের যন্ত্রপাতি থেকে নবপ্রস্তর আখ্যা তা পাওয়া গিয়েছে কাশ্মীর থেকে আসাম ও পূর্বাঞ্চলের অন্যত্র, এবং উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে। অবশ্য তার পাশাপাশি পুরাপ্রস্তর যুগের পাথুরে পাত শিল্প প্রায়ই উপস্থিত, তা ছাড়া কোথাও কোথাও দেখা যায় অণুশিলা, অর্থাৎ নানা জ্যামিতিক আকারের ছোট ছোট পাথরের ফলক, মধ্যপ্রস্তর যুগে তা কাঠ বা হাড়ের গায়ে জুড়ে অস্ত্র যন্ত্র তৈরি হত (চিত্র ৬ক দ্রষ্টব্য)। মহারাষ্ট্রে এবং উপদ্বীপীয় ভারতের কোথাও কোথাও বেড়াতে বেড়াতে ঘষা কুড়াল বা কুড়ালি আবিষ্কার করা কিছু আশ্চর্য নয়। পুরা কালের এ বস্তুটি আজ পর্যন্ত পূজায় ব্যবহার হয় কোনও কোনও অঞ্চলে. যেমন দক্ষিণ ভারতের পল্লী মন্দিরাদিতে তা উৎসর্গ বা প্রতীক রূপে নিবেদিত দেখা যায়।

বেলুচিস্থান ও দক্ষিণ আফগানিস্থানে দক্ষিণ এশিয়ার আদিতম স্থায়ী বসতি-গুলি চিহ্নিত হয়েছে প্রায় নিঃসন্দেহে তা পশ্চিম এশিয়ার প্রাচীনতর ঐতিহ্যের সম্প্রসারণ। পরে, সম্ভবত খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রকের শুরুতে এক বিশিষ্ট সামাজিক ধারা ও বাস ব্যবস্থা দেখা দেয় দক্ষিণ-পূর্ব বেলুচিস্থানে, তাম্র ও অবিলম্বে কাংস্য শিল্পের সহযোগে তার থেকে সিন্ধু তীরে মহেনজোদারো হরপ্পার উদ্ভব। এই কেন্দ্র থেকে নবপ্রস্তর শিল্পাবলী ও ধাতু বিদ্যা পূবে ও দক্ষিণে ছড়িয়েছে, সিন্ধু সভ্যতার অবসানের পরেও। অপর দিকে আসাম ও উত্তর-পূর্ব ভারতের পার্বত্য অঞ্চলে

বহুসংখ্যক পাথুরে কুড়াল উদ্ধার হয়েছে, তাদের তারিখ অনিশ্চিত এবং সঙ্গে ধাতু বস্তু নেই, এই যন্ত্রপাতি এবং সংশ্লিষ্ট মৃৎপাত্রের চেহারায় চীন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রাচীনতর ধারার সঙ্গে সাদৃশ্য দেখা যায়. ধানের আমদানিও অবশ্য সে দিক থেকে ঘটে থাকা সম্ভব। গোদাবরীর দক্ষিণে কর্নাটকের কৃষ্ণা নদীর অববাহিকায় ঘষা পাথুরে কুড়ালের প্রাচুর্য দেখে মনে হয় আদিতম স্থায়ী বাসিন্দাদের তা এক প্রধান শিল্প ছিল। তারা গরু ছাগল ভেড়া পুষেছে. ঘষবার পিষবার শিল শস্য উৎপাদন নির্দেশ করে, তারিখ প্রায় ২৩০০-১৮০০ বিসি ; তখনও মৃৎপাত্র কেবল হাতে তৈরি, তা ছাড়া তারা মাটি দিয়ে গড়েছে ছোট ছোট বৃষ মূর্তি, প্রধানত ষাঁড়ের, এবং পাথরের গায়ে পশুর ছবি এঁকেছে। পরবর্তী ৩০০ বছরে এখানে গোল গোল কুটির তৈরি হয়েছে কাঠের কাঠামোর গায়ে মাটি ও ডালপালা দিয়ে. তামা ও কাঁসা দেখা যায় এই পর্বের শেষ দিকে।

উত্তর কর্নাটকে ব্রহ্মগিরি এক প্রসিদ্ধ নবপ্রস্তর ঘাঁটি, ধাতুর আগে এখানে বসতি ছিল মোটামুটি স্থায়ী কৃষিজ্ঞানী সম্প্রদায়ের। এরা বাস করত কাঠের ঘরে, তার কোনও কোনওটার দেয়াল পাথর দিয়ে মজবুত করা। চার পাশে জঙ্গল. কিন্তু ঘষা পাথরের কুড়াল দিয়ে কেটে এবং হয়তো আগুনে পুড়িয়ে তা সাফ করে চাষের জমি তৈরি করা কঠিন ছিল না। এদের জীবন ধারার সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের রেড্‌ডি আদিবাসী সম্প্রদায়ের তুলনা করা হয়েছে। গোদাবরীর পার্শ্ববর্তী পার্বত্য অঞ্চলে রেড্‌ডিরা যে জীবন কাটায় তা অনেকটা যাযাবর সংগ্রাহক ও স্থিতিশীল কৃষকের মাঝামাঝি, ঘর দুয়ারের স্থায়িত্ব সামান্যই. ভাঁড়ারে বুনো গাছ গাছড়া ও মূলের পাশাপাশি কিছুটা খাদ্য যোগায় চাষ ও গার্হস্থ্য পশু। চাষের রীতি আদিম, জঙ্গল কেটে বা পুড়িয়ে সেই ছাইতে এরা জোয়ার, বাজরা ও ডালের বীজ ছড়ায়, অথবা চোখা লাঠি দিয়ে জমি খুঁচিয়ে বীজ বোনে. কোদাল বলে কিছু নেই। মনে হয় ব্রহ্মগিরির প্রাগৈতিহাসিক অধিবাসীদের জীবন এর চেয়ে অগ্রসর ও স্থিতিশীল ছিল কিছুটা।

পশ্চিমে নর্মদা নদীর দক্ষিণে মহারাষ্ট্র অঞ্চলে খনন করে এইচ. ডি. সাংকালিয়া ও সহকর্মীরা বহু তাম্রপ্রস্তর ঘাঁটি উদঘাটন করেছেন। কয়েক জায়গায় শিশুদের হাড় মাটির কলসিতে ভরে মেঝের নিচে কবর দেওয়া হয়েছে, নানা সমাধি বস্তুর সঙ্গে। মধ্য ভারতে পার্বত্য ও বন্য ভূমির স্থানে স্থানে স্থায়ী কৃষিবাসী বসতি

গড়ে উঠেছিল, তেজস্ক্রিয় কারবন পদ্ধতি অনুসারে এরান নামক ঘাঁটির তাম্রপ্রস্তর ও লৌহ যুগীয় তারিখ উদ্ধৃত হয়েছে যথাক্রমে প্রায় ১৫০০-১২৮০ বিসি এবং ১০৪০ বিসি. কিন্তু অন্যান্য নজিরের সঙ্গে এই তারিখের কিছু অসংগতি আছে। নর্মদার দক্ষিণ তীরে নাবড়া তোলী আর এক প্রসিদ্ধ ঘাঁটি. প্রথম বসতির উল্লিখিত বয়স ১৬৬০-১৫৩০ বিসি। এখানে লোকে বাস করত চৌকোণ ও গোল কুটিরে. তা যথারীতি কাঠের খুঁটির উপর মাটি ও ডালপালা দিয়ে তৈরি, মেঝে মাটি ও গোবরের, দেয়াল ও মেঝের উপর কখনও চুনের প্রলেপ, ছাত সম্ভবত খড়ের। চতুষ্কোণ কুটিরগুলি বড়, একটির মাপ দৈর্ঘ্যে প্রস্থে প্রায় ১২ ও ছয় মিটার। গোল ঘরগুলি আড়াই মিটারের বেশী চওড়া নয়, ক্ষুদ্রতমগুলি সম্ভবত ছিল শস্য ও অন্যান্য বস্তুর গুদাম। গৃহগুলিতে পাশাপাশি তিন ভাগে বিভক্ত উনন, মাটির উপর চুনকাম করা, শস্য ভাঙবার শিল মেঝের সঙ্গে গাঁথা। ভাঁড়ার ঘরে সারি সারি ঘট, বৃহত্তরগুলি মাটির বেদীর উপর বসানো। অধিবাসীরা গরু ভেড়া ছাগল শুয়োর রেখেছে, গম মসুর ও তিসির মত তেলবীজের চাষ করেছে; তার থেকে মনে হয় খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রকেই এখানে লিনেন বস্ত্র তৈরি হয়ে থাকতে পারে। যন্ত্রপাতি গড়তে সুন্দর পাথরের পাত অনেক বানিয়েছে তারা, তা ছাড়া তামার বস্তুও।

পুবে উল্লেখযোগ্য তাম্রপ্রস্তর ঘাঁটি বর্ধমান জেলায় পাণ্ডু রাজার ঢিবি, সেখানে পুরাপ্রস্তর পাত শিল্প যথা পাথরের কুড়াল এবং তামার তৈরি বঁড়শি ও অন্যান্য বস্তু উদ্ধার হয়েছে, তা ছাড়া অনেক চিত্রিত মৃৎপাত্র এবং সরু ঠোঁটযুক্ত বাটি, উল্লিখিত তারিখ ১০০০ বিসির কাছাকাছি। নিকটবর্তী বীরভূম জেলায় মহিষাদলের খননেও পাথর ও তামার উপকরণ এবং উপরোক্ত ঢিবির অনুরূপ মৃৎপাত্র পাওয়া গিয়েছে, তাদের তারিখ ১৩৮০-৮৫৫ বিসি। লোহার আগমন ৬৯০ বিসির আগে।

উত্তর ভারতে গঙ্গা যমুনার অন্তর্বেদি দেশও তামা ও কাঁসার বিচিত্র অস্ত্র উপকরণে সমৃদ্ধ তার কিছু আগে উল্লেখ করা হয়েছে। নানা আকারের কুড়াল, ভারী বর্শা ফলক বা তলোয়ার, তাদের নিচের দিকে কাঁটা বসানো সম্ভবত হাতল আটকাবার জন্য তা ছাড়া এখানে তৈরি হয়েছে নিচে তিন জোড়া কাঁটা ও মুখে ত্রিকোণ ফলা যুক্ত বল্লম। কাঁটাদার বল্লম যে গণ্ডার শিকারে ব্যবহার হয়েছে তা এক গুহাচিত্রে প্রতীয়মান। এই সব অস্ত্র উপকরণের গঠনে কিছু সিন্ধু তীরের, কিছু বিদেশী (ইরান, ককেশাস) প্রভাব লক্ষ্য করেছেন বিশেষজ্ঞরা, অন্যগুলির হয়তো স্থানীয়

অভিব্যক্তি।

ভারতে লৌহ যুগ এসেছে সিন্ধু সভ্যতার পরে. সেই সভ্যতার অবসান কি করে হল তা নিয়ে আজও জল্পনার অভাব নেই। প্রথম দিকে শোনা গিয়েছে পলি জমে জমে নদী ফুলে উঠে প্রতি বছর বানের জল মহেনজোদারোর পথে ঘাটে ঢুকে পড়েছিল, প্রকৃতির সঙ্গে লড়তে লড়তে তার পর হঠাৎ দেখা দিল আর্যদের আক্রমণ। এক সাম্প্রতিক তত্ত্ব অনুসারে ভূগর্ভ থেকে আগ্নেয়গিরির মত গ্যাস নদী তল ঠেলে তুলে সাগরের দিকে জল প্রবাহ বন্ধ করে দিয়েছিল ফলে কর্দমাক্ত জল ক্রমশ গ্রাস করছিল শহরকে. তখন প্রাক্তন নির্মাণের উপর উঁচু করে নতুন ঘর বাড়ি তৈরি হয়েছে, অবশেষে অনিবার্য নির্দয় কর্দমের কাছে হার মেনে নাগরিকেরা পালিয়েছে পুবে ও দক্ষিণে। এ দিকে আর্যরাও পশ্চিম দিক থেকে উত্তর ভারতে ছড়িয়েছে—সেই ইতিহাসের প্রথম পর্বে উপমহাদেশীয় সীমান্তে দক্ষিণ ও মধ্য বেলুচিস্থানে এক অশ্বারোহী সম্প্রদায়ের বসবাসের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে, তারা হাতে গড়েছে মাটির পাত্র. যেমন ঠোঁট ও হাতল যুক্ত ঘট, এবং কাঁসা ও লোহা ব্যবহার করেছে, যেমন তীরের ফলায়। কবরের উপর পাথর জড়ো করে পিরামিডের মত স্মারক বানাত তারা।

অল্প কাল আগে পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন স্থানে আদিবাসীরা আকরিক থেকে লোহা নিষ্কাশন করেছে, তাদের আদিম পদ্ধতির সঙ্গে আফ্রিকার লৌহকর্মীদের ব্যবহৃত কৌশলের মিল দেখা যায়। ১৯৫০ দশকেও ভারত ও পাকিস্থানে আদি-তম লৌহের খোঁজে প্রত্নবিজ্ঞানীরা খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর আগে যেতে পারেন নি, সার মর্টিমার হুইলার ঐ শতাব্দীতে পারসীক আক্রমণের সঙ্গে লোহার প্রবেশ অনু-মান করেন, কিন্তু পরবর্তী নজির থেকে লৌহ যুগের প্রাচীনতা অনেকটা বেড়ে গিয়েছে। এ দেশে আর্যদের গতি বিধি ও ইতিহাস অনুসরণ করতে পণ্ডিতরা প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্যের সঙ্গে বৈদিক ও পৌরাণিক সাহিত্যের সমন্বয় খুঁজেছেন। এক বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় হল যে পরবর্তী রচনায় ভৌগোলিক কেন্দ্র স্থল পুবে সরে এসেছে, যজুঃ ও অথর্ব সংহিতার কালে তা অধিষ্ঠিত গঙ্গা যমুনার অন্তর্বর্তী কুরু-ক্ষেত্রে. আরও সাম্প্রতিক রচনায় পুবে মগধ (দক্ষিণ বিহার) পর্যন্ত। ঐ সময়ে পাঞ্জাব দূরে মিলিয়ে গিয়েছে, শতপথ ব্রাহ্মণে তার প্রতি বরং বিরাগ লক্ষিত হয়। পরিবর্তে আমরা শুনি কোশল (অযোধ্যা), কাশী. মগধ ইত্যাদি নাম। প্রত্নবৈজ্ঞানিক

আবিষ্কারের সমর্থন পাওয়ার অগেও সন্দেহ ছিল না যে এ সব আর্য গোষ্ঠীদের পূর্বমুখী সম্প্রসারণের নির্দেশক। শতপথ ব্রাহ্মণের এক কাহিনী বলে সরস্বতী নদী কূলে প্রাক্তন পাঞ্জাবনিবাসী এক রাজা অগ্নি বহন করে নিয়ে গিয়েছিল উত্তর বিহারের বিদেহতে সদানীর নদী (আধুনিক গণ্ডক) পর্যন্ত, তার আগে নদীর পুব পারে ব্রাহ্মণ কেউ ছিল না। তেমনি দক্ষিণ দিকেও আর্যদের সম্প্রসারণ ঘটেছে।

এই পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে মোটামুটি ১০০০ বিসি থেকে ৫০০ বছর পর্যন্ত ভারতীয় আর্যদের সম্বন্ধে অনেক খবর মেলে। হালকা রথে ক্ষিপ্র অশ্ব জুড়ে তারা দ্রুত ছুটেছে ধাতুর অস্ত্র হাতে নিয়ে। তামা কাঁসা সীসা টিন ছাড়াও লোহার উল্লেখ আছে বার বার। কৃষির কাজ, পশুপালন, নানা পেশা ও হস্তশিল্প, ধর্ম ও রাজনীতি সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। গরু ভেড়া ছাগল পালন এবং গম যব ও পরে ধান চাষ হয়েছে। মাটির কর্ষণে হাল ব্যবহার হত এবং অনুমান করা যায় যে গাঙ্গেয় সমভূমির জলা জঙ্গল সাফ করে ক্রমশ চাষের জমি বিস্তৃত হয়েছে। সোম-রসের মাদকতা, ইন্দ্র অগ্নি বরুণ মিত্র ইত্যাদি দেবতা, নানা অগ্নি-যজ্ঞ ও উৎসর্গ এ সব ছিল সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য। মৃতের সৎকারে দাহ ও সমাধি দুই রীতিই ছিল। জটিলতর সমাজ ও জাতি বিভাগের চিহ্ন দেখা যায়। জনসংখ্যা ও বসতির বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আদি উপজাতীয় গোষ্ঠীরা অপসৃত হল।

স্থান কাল পাত্র ভেদে চিত্রিত মৃৎভাণ্ডের বর্ণ ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য থেকে পুরা-বিজ্ঞানীরা নির্মাতা সম্প্রদায়কে চিনতে পারেন। আদিতম লৌহযুগীয় বসতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এক সুগঠিত ধূসর-চিত্রিত পাত্রাবলী আর্যাবর্তে পাঞ্জাব থেকে গঙ্গা যমুনার সংলগ্ন মহাভারত-প্রসিদ্ধ কুরুক্ষেত্র পর্যন্ত বিস্তৃত—পানিপথ, হস্তিনাপুর, ইন্দ্রপ্রস্থ (দিল্লীর পুরান কেল্লা), মথুরা ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ ঘাঁটিতে তা পাওয়া গিয়েছে। এক প্রস্তাব অনুসারে এই অঞ্চলে লৌহযুগ ১০৫০ থেকে ৪৫০ বিসি পর্যন্ত। খননে দেখা যায় প্রাচীন প্রস্তর ফলক শিল্প অনুপস্থিত এবং আদিতম স্তর থেকেই লোহা সাধারণত বর্তমান। এই ধাতুর তৈরি তীরের ফলা সবচেয়ে বেশী উল্লিখিত, এক জায়গায় কুড়াল ও একটি সাঁড়াশি পাওয়া গিয়েছে, যদিও এ সবের সঙ্গে হাড়ের তৈরি চোখা অস্ত্রাংশ (সম্ভবত তীরের মুখ) প্রায়ই দেখা যায়. তা ছাড়া কাচের পুঁতি ও বালা, পাথর, মাটির চাকতি (সম্ভবত আলংকারিক) ; হাড়ের তৈরি ঘুঁটি মহা-ভারতের প্রসিদ্ধ অক্ষ ক্রীড়ার স্মৃতি জাগায়। মৃৎপাত্র প্রধানত চাকে গড়া। বাস

ঘর সম্বন্ধে বেশী কিছু জানা নেই, সম্ভবত মাটির মেঝে ঘিরে কাঠের কাঠামোর সঙ্গে মাটি ও ডালপালা দিয়ে দেয়াল হয়েছে। খাদ্যের মধ্যে ছিল ভাত, তা ছাড়া গরু শুয়োর এবং শেষ দিকে ঘোড়ার হাড় উল্লেখ করেছেন অনুসন্ধানীরা।

ধূসর-চিত্রিত মৃৎভাণ্ডের পর কালো চকচকে পাত্র শিল্প নন্দ ও মৌর্য বংশের সমকালীন, বুদ্ধ ও মহাবীরের প্রভাব তখন। চিহ্নিত রুপার ও ঢালাই তামার প্রথম ভারতীয় মুদ্রা দেখা দিল এবং অনুমান করা হয় রাজা অশোকের প্রসিদ্ধ অনুশাসনে ব্যবহৃত ব্রাহ্মী লিপির সূচনাও এই সময়ে, যদিও এ যাবৎ প্রাপ্ত লিখনে আরও দুই শতাধিক বছরের আগে তার দেখা পাওয়া যায় না। ব্রাহ্মী লিপির পাঠোদ্ধার হয়েছে এ যুগে, করেছেন জেম্স প্রিন্সেপ (যার নামে কলকাতার প্রিনসেপ ঘাট)। লিপির আগে আর্য সাহিত্য যে মৌখিক ছিল তা আমরা দেখেছি।

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে দেখা যায় গাঙ্গেয় উপত্যকার প্রধান রাজ্য মগধের অভ্যুদয়, প্রাচীন উপজাতীয় সমাজের স্থানে নাগরিক সভ্যতা। নানা শহরে প্রতিরক্ষার জন্য কাঁচা ইটের তৈরি প্রাচীর ও উঁচু মাটির ঢিবি তুলে গঠিত বাঁধে এর নিদর্শন মেলে, তাদের তুলনায় হস্তিনাপুর ও অধিকাংশ আদি ধূসর-চিত্রিত পাত্র সংশ্লিষ্ট ঘাঁটিগুলি পল্লীগ্রাম মাত্র। বুদ্ধের আগেই রাজগীরকে ঘিরে মস্ত এক পাষাণ প্রাকার নির্মিত হয়েছে। কৌশাম্বী, উজ্জয়িনী ও এরানের প্রাচীর ও ঢিবির অনেকটা প্রাচীনতর তারিখ দাবি করা হয়েছে, আরও অনেক শহরে অনুরূপ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারিখ সুনির্দিষ্ট হয় নি। বর্তমান পাকিস্থানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে গান্ধার দেশেও সম্ভবত নাগরিক জীবন সূচিত হয়েছে ষষ্ঠ শতাব্দীতে পারস্য রাজ সাইরাস দেশ জয় করার পর। উত্তর-পশ্চিমে তক্ষশিলার পত্তন সেই সময়ে হয়ে থাকতে পারে।

আর্যাবর্তের তুলনায় দক্ষিণ ভারতের লৌহ যুগ সম্বন্ধে অনুসন্ধান বেশী হয় নি, তবে তৎকালীন কবর প্রথা উল্লেখযোগ্য। বসতির মধ্যেই মৃতের সমাধির পরিবর্তে এই সময়ে পৃথক কবরখানার ব্যবহার হয়েছে। এই সমাধিগুলিকে প্রায়ই মেগালিথ বলা হয়, যদিও সর্বদা বড় বা ছোট পাথর ব্যবহার হয় নি। কালক্রমে দক্ষিণাপথে এই জাতীয় সৎকারের নানা রীতি বৈচিত্র্য দেখা দিয়েছিল ; যেমন কখনও কখনও মনে হয় উন্মুক্ত সমাধি গহ্বরে কাষ্ঠ শয্যায় শব রাখা হয়েছে, হয়তো কঙ্কালকে মাংসমুক্ত করতে, সবটা ঘিরে গোল করে পাথর সাজানো ; অথবা গ্র্যানিট বা অন্য

পাথরের পাটা নানা ভাবে খাড়া করে এক বা একাধিক ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ তৈরি হয়েছিল দেহাবশেষ রাখতে, উপরে পাথর পাটা দিয়ে ঢাকা. কক্ষগুলি কখনও সম্পূর্ণ মাটির নিচে, কখনও উপরে, নয়তো আংশিক নিমজ্জিত ; এ ক্ষেত্রেও সমাধি স্থল পাথরের বৃত্ত দিয়ে ঘেরা, কখনও তিনটি পর্যন্ত। এই দুই প্রথাই ব্রহ্মগিরিতে দেখা যায়। অন্যত্র বড় বড় কলসিতে মাংসমুক্ত হাড় রেখে গর্তে গোর দেওয়া হয়েছে। কবরের অন্যান্য রীতিও ছিল এবং মৃতের সঙ্গে সাধারণত ব্যবহারের বস্তু রাখা হত।

উপসংহার

মানুষের জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত তার ইতিহাস সমগ্র ভাবে দেখতে গেলে যেন এক মিছিলের ছবি বার বার চোখের সামনে ফুটে ওঠে। যাত্রা যখন শুরু তখন বহু দূরে ঘনান্ধকার দিগন্তের গায়ে অল্প কয়েকটি খর্বকায় মূর্তির ছায়া — ভীরু, মন্থর তাদের পদক্ষেপ। সামনে অফুরন্ত পথের উপর দূরে দূরে এক একটি তোরণ, সে দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বহু লক্ষ বছর চলে গেল, তবু সেই গাঢ় তমসায় অতি ক্ষীণ আলো ফুটল মাত্র, শোভাযাত্রার রেখাটি বিশেষ প্রলম্বিত হল না। তার পর ক্রমে আকাশ উদভাসিত হয়ে উঠতে লাগল, যাত্রীদের পদক্ষেপ অনেকটা দ্রুত ও দৃঢ়, সামনের লোকে অনেকগুলি তোরণ পিছনে ফেলে এসেছে—কিন্তু জনরেখা এত দীর্ঘ যে অনেকে এখনও পশ্চাতের কোনও কোনওটা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে নি। চলার পথে এক সমুজ্জ্বল তোরণের কাছে যখন মিছিলের মুখ এসেছে সেই দিনটিতে আমরা শেষ করছি এই মানুষ পুরাণ—এই দ্বার অতিক্রম করে মানুষ আপন হাতে তার ইতিহাস লিখে গিয়েছে।

এই মহাকাহিনীর শেষ পর্যায়ে ইতিহাসের উষায় দাঁড়িয়ে আমরা দেখছি মানব সমাজে অনেক জটিলতা. জীবন ধারায় অনেক পরিবর্তন এসে গিয়েছে। বহু লক্ষ বছরের দিন আনি দিন খাই ব্যবস্থার মারাত্মক বন্ধন থেকে সে মুক্তি পেয়েছিল মাত্র হাজার পাঁচেক বছর আগে, তখন অন্ন চিন্তা ছাড়া অন্য চিন্তাও আছে, কারণ তার প্রয়োজন অনেক। এই চাহিদা মেটাতে নির্ভর করতে হয় অপরের শ্রমের উপর, পারিবারিক গণ্ডির বাইতে সমষ্টির সহযোগিতা ও যৌথ প্রচেষ্টাও অপরিহার্য, নতুবা যথেষ্ট উৎপাদন বা আত্মরক্ষা আর সম্ভব নয়। শুধু ঘরে ঘরে নয়, দেশে দেশেও যোগাযোগ ও নির্ভরতা বেড়েছে বাণিজ্যের প্রয়োজনে, যান বাহনের সাহায্যে জল ও স্থল পথে দূর দূরান্তরে চলা ফেরা শুরু হয়েছে। শ্রেণীবিভক্ত সমাজের শীর্ষে স্থান নিয়েছে ক্ষমতার অধিকারী ভর্তা ও পোষ্য, রাজা ও পুরোহিত। আবহমান কাল মনের কথা প্রকাশ পেয়েছে শুধু মুখের ভাষায় (এবং কিছুটা অঙ্গ

ভঙ্গিতে), তখন তা লিপিবদ্ধ হল। ভাবের জগতে অন্ধসংস্কার তখনও বদ্ধমূল, কিন্তু নানা বিদ্যা আয়ত্ত করতে তারই মধ্যে বিজ্ঞানের জ্ঞানও প্রবেশ করেছে, সৌন্দর্য প্রীতি মূর্ত হয়েছে হাতের কাজে।

এই সমাজে যেন আমরা বর্তমানের অঙ্কুর দেখতে পাই, আজকের জটিল সমাজ তাকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছে। কিন্তু আমাদের কাহিনী যেখানে শেষ তার পরে বহু দিন পর্যন্ত নতুন আবিষ্কার এক আঙুলে গোনা যায়, নবপ্রস্তর যুগের হাজার পাচেক বছর ধরে প্রায় ঊর্ধশ্বাস বিদ্যার্জনের পর মানুষ যেন বেশ কিছু কাল তার ফল উপভোগ করতে বসল। তার পর অবশ্য নব নব পরীক্ষা উদভাবন উদঘাটন আজ তাকে অনেক দূর এগিয়ে এনেছে, বিশেষত আধুনিক কালে নতুন আবিষ্কার বহু গুণ ত্বরান্বিত হয়েছে, ফলে সভ্যতার তরুটি এখন শাখা প্রশাখায় বিকশিত হয়ে বিশাল মহীরুহে পরিণত; এতে মানুষের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আরও অনেক বাড়লেও তার ফল কিন্তু সর্বতোভাবে কল্যাণজনক হয় নি, অনেকের ভয় তা বিষবৃক্ষের রূপ না নেয়।

খাদ্যোৎপাদন থেকে শুরু করে আমাদের এই কাহিনীর শেষে পৌঁছাতে যত কাল কেটেছে, তখন থেকে আজ পর্যন্ত বছর গণনায় আমরা ততটাই দূরে। এই সন্ধি ক্ষণে দাঁড়িয়ে মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যতের দিকে দ্রুত দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে। এই ৫০ শতাব্দীর মধ্যে দুটি পরিবর্তন বিশেষ চোখে পড়ে—পূর্বোক্ত শোভাযাত্রা দেখতে দেখতে বহু গুণ স্ফীত হয়ে উঠেছে, দ্বিতীয়ত সে দিন যারা ছিল পিছনে আজ তারা পুরোভাগে, যারা ছিল আগে তারা পিছিয়ে পড়েছে; পুবের লোকের স্থান দখল করেছে পশ্চিমীরা। বিজ্ঞানীরা একদা সন্দেহ করতেন এশিয়া হয়তো মানুষের জন্ম ক্ষেত্র, আজ আফ্রিকার কাছে সে সেই গৌরব হারাতে বসলেও মানুষের আদি পূর্বপুরুষরা যে এই মহাদেশ জুড়ে উপস্থিত ছিল ফসিলে তার প্রচুর প্রমাণ আছে। এশিয়ার মানুষ সর্বাগ্রে জীবিকার উপর কর্তৃত্ব অর্জন করে এক মহাবিপ্লব সাধন করেছে, পরে সেই অঞ্চলেই ঘটেছে সভ্যতার উন্মেষ। তার পর একদা এগিয়ে গেল নবীন য়োরোপ, কিন্তু হাজার দুই বছর পিছনে পড়ে থেকে আবার যেন এশিয়া মিছিলের সামনে আসছে, সেখানে ক্রমেই বেড়ে চলেছে হলদে কালো রঙের প্রাধান্য। কিন্তু কে এগিয়ে গেল কে পিছিয়ে পড়ল তা আজ আর বড় কথা নয়—আজ সমস্যা হল বেঁচে থাকার।

বসুন্ধরার মঞ্চে বহু প্রাণী এসেছে গিয়েছে, কয়েক কোটি বছর আধিপত্যের পর সরীসৃপ কুলের অতিকায় ডাইনোসররাও লোপ পেল। যে সব প্রাণী ইতিমধ্যেই পৃথিবীর পালা শেষ করেছে তাদের ফসিলের দলিল পরীক্ষা করে জীববিজ্ঞানীরা বলেন প্রজাতির আয়ু গড়ে ১০ লক্ষ বছর। কিন্তু সাধারণ প্রাণীর মানদণ্ডে মানুষের প্রজাতিগত আয়ু মাপা ভুল হবে কারণ প্রাণী কুলের দীর্ঘ ক্রমবিকাশের শেষে মানুষের মধ্যে এক বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়েছে যা তার সম্পূর্ণ স্বকীয়। অসাধারণ মনন শক্তির ফলে একমাত্র এই প্রাণীটিই নিজের চেতনা সম্বন্ধে সচেতন, অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সুসংবদ্ধ যুক্তিপূর্ণ চিন্তার অধিকারী। এই কারণেই দার্শনিকরা সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও তার মধ্যে মানুষের ভাগ্য গিয়ে মাথা ঘামায়, বিজ্ঞানী সব কিছুর ব্যাখ্যা খোঁজে—এই কারণেই প্রগতির পথে মানুষ আজ এত দূর এগিয়েছে। দেহে ক্ষুদ্র ও ভঙ্গুর মানুষই বিশ্বের জটিল রহস্য অনেকখানি উদঘাটন করেছে, সে পৃথিবীতে না এলে এই জ্ঞানও সৃষ্টি হত না।

চতুর্থ তুষার যুগের কৃচ্ছ্র সহ্য করেও আমাদের পূর্বপুরুষরা টিকে থেকেছে আগুন জ্বেলে, পশু চর্মে গা ঢেকে। আজ শীত নিবারণের আরও অনেক কার্যকর উপায় আবিষ্কার হয়েছে। তেমনি প্রতি ক্ষেত্রে মানুষ বিরুদ্ধ প্রকৃতিকে জয় করেছে, পরিবেশ বানিয়ে নিচ্ছে নিজের মত করে। সুতরাং যে সব কারণে অন্যান্য প্রাণী এরই মধ্যে পৃথিবীর থেকে বিদায় নিয়েছে তা মানুষের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ প্রযোজ্য নয়, অন্যরা খামখেয়ালী প্রাকৃতিক পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারে নি, মানুষ নিজের সুবিধা মত প্রকৃতিকে ঢেলে সাজাচ্ছে। সুতরাং সভ্য মানুষের ক্রম-বিবর্তন আর চিরাগত নিয়মে নির্ধারিত হবে না—বলা যেতে পারে তা নির্ধারণ করবে সে নিজে, তা হবে কৃত্রিম।

কিন্তু যুক্তিযুক্ত চিন্তা শক্তি একান্ত মানবিক ধর্ম হলেও তা যে সর্বদা কাজ করে নি তা প্রতীয়মান সুসভ্য আধুনিক মানুষের অবাধ অপরিণামদর্শী আচরণে। বর্ধিষ্ণু জনতার স্বাচ্ছন্দ্যের চাহিদা মেটাতে আধুনিক যন্ত্র সভ্যতা ক্রমেই জল স্থল বাতাস কলুষিত করছে, দেশে দেশে শহরাঞ্চলে লোকে নিঃশ্বাসের সঙ্গে অল্প বিস্তর বিষ টেনে নিচ্ছে, তাতে বাড়ছে নানা রোগের প্রকোপ। পশু পাখি তরু লতারও পরিত্রাণ নেই, যদিও পৃথিবী শুধু মানুষের জন্য সৃষ্ট হয় নি। প্রশ্ন উঠেছে শিল্পোন্নতির জন্য দিনে দিনে যে বাড়ন্ত দাম চুকিয়ে দিতে হচ্ছে তা কত দূর সহনীয়। সাম্প্রতিক

কাল পর্যন্ত এই বিপদ আমরা উপলব্ধি করি নি, আজ সামলানো দায়। তেমনি এখন অপেক্ষাকৃত দূর ভবিষ্যৎ নিয়েও ভাবনা ধরেছে। যথা কল কারখানা ও গাড়ির ধোঁয়া থেকে বিগত ১০০ বছরে প্রচুর পরিমাণ কারবন কণা ও নানা গ্যাসের মধ্যে ৩৬,০০০ কোটি টনের বেশী কারবন ডাইঅকসাইড জমেছে বাতাসে; এবং প্রায় ঐ পরিমাণ জমেছে বন জঙ্গল কাটার ফলে—কখনও চাষ বা বাসের জমির তাগিদে, কখনও জ্বালানির চাহিদা মেটাতে (আধুনিক কৃষির প্রসার ছাড়াও পৃথিবীর অনুন্নত অঞ্চলে এখনও ২৫ কোটি লোকের নির্ভর অস্থির কৃষি, শুধু এই 'কাটো ও পোড়াও' পদ্ধতির ফলে প্রতি বছর এক কোটি হেকটেআর জঙ্গল নষ্ট হয়)। বন্য জন্তুরা হারাচ্ছে তাদের বাস ভূমি ও শিকার, গাছের মৃত্যুতে কারবন ডাই-অকসাইড থেকে অকসিজেন সৃষ্টি হ্রাস পাচ্ছে, ভূমিক্ষয় বাড়ছে. বৃষ্টি কমছে (অবশ্য বনের সংকোচন ছাড়া অনির্দিষ্ট প্রাকৃতিক কারণেও বারিপাত কমে)। স্বল্প বৃষ্টির ফলে সাহারা মরু দক্ষিণে বিস্তৃত হচ্ছে, তাই গত কয়েক বছরে আফ্রিকায় লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত অনাহারে প্রাণ হারিয়েছে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন এই খরা প্রকৃতির সাময়িক খেয়াল না হয়ে জলবায়ুর স্থায়ী পরিবর্তনের সূচনা হতে পারে। ভারতও এই অল্প-বৃষ্টি অঞ্চলের অন্তর্গত।

কারখানা ও গাড়ির প্রসারে এবং বনের বিলোপে বায়ুমণ্ডলে কারবন ডাই-অকসাইডের পরিমাণ প্রায় ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই গ্যাস কম্বলের মত তাপ আটকায়, সুতরাং এরই মধ্যে পৃথিবীর তাপ সম্ভবত আধ ডিগ্রির বেশী চড়ে গিয়েছে। ২০০০ সালের মধ্যে কারখানাজাত গ্যাস এই তাপ বাড়িয়ে দিতে পারে দু ডিগ্রি, ৩০০০ সালে সাত ডিগ্রি। বিজ্ঞানীরা অনেকে আশঙ্কা করেন যে একদা মেরু অঞ্চলের ও পাহাড়ের বরফ গলে উপকূলবর্তী স্থল ভাসিয়ে নেবে। শিল্পজাত বস্তুর সংস্পর্শে ঊর্ধ্বাকাশে ওজোন গ্যাসের হ্রাস নিয়েও তাঁদের ভয় আছে, এই স্তরটি মারাত্মক অতিবেগনি রশ্মির বাধা, ওজোন কমে গেলে এই রশ্মি অবাধে প্রাণীর ক্ষতি করবে।

আজ রাজা পুরোহিত অনেকটা নখদন্তহীন. কিন্তু সভ্যতার সূচনায় তারা যে রীতি নীতি স্থাপন করেছিল তার প্রতিপত্তি এখনও অসংযত। ধাতুর অস্ত্র হাতে পেয়ে রাজারা দেশ দখল ও হত্যা কাণ্ডে মেতেছিল, আজও বিজাতি বিদ্বেষ বা বিধর্মী বিদ্বেষ নিয়ে যুদ্ধ ও হানাহানি চলে, বিজ্ঞানের দৌলতে নিত্য নতুন এমন

মারণাস্ত্র তৈরি হচ্ছে যে তৃতীয় মহাযুদ্ধে মানব প্রজাতি লোপ পাবে এমন আশঙ্কা এখন রূঢ় সত্য। ধর্মের নামে অনেক অধর্ম ঘটেছে, আজও ঘটছে, জনাথান সুইফ্‌ট লিখেছিলেন আমাদের ধর্ম যথেষ্ট রসদ যোগায় অপরকে ঘৃণা করবার, কিন্তু ভাল-বাসবার নয়। আমাদের কাহিনীর শেষে যদিও দেখেছি মানুষ যৌথ জীবন ও সহযোগিতার মূল্য বুঝেছে, তা এখনও অধিকাংশে পরিবার, গোষ্ঠী, বড়জোর স্বজাতি ও স্বদেশের সীমানার মধ্যে গণ্ডিবদ্ধ। দেশের ভিতরে ও দেশে দেশে ধনী দরিদ্রের পার্থক্য বর্ধিষ্ণু, তার থেকেও দ্বন্দ্ব ও সংঘাত। মানব মস্তিষ্কে কর্টেক্স অংশটি ক্রমবিবর্তনের সঙ্গে বৃদ্ধি পেয়েছে, তা তার যুক্তিসংগত মনন ও মহান সৃষ্টির উৎস, কিন্তু যে আদিম অংশ হীনতর প্রাণীদের অন্ধপ্রবৃত্তির কেন্দ্র তা আজও তার মস্তিষ্কে বর্তমান, বিজ্ঞানীরা অনেকে বলেন এই সনাতন শয়তানই এখনও তাকে স্বার্থ ও হিংসার পথে চালায়, ভবিষ্যৎ অভিব্যক্তি একদা এই দোটানার থেকে তাকে মুক্তি দেবে হয়তো।...

প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে অদ্যকার এই নানা সমস্যার ইন্ধন যোগাচ্ছে জনস্ফীতি, যেমন জনতার দাবি মেটাতে বন কেটে আবাদ, পরিমিত জ্বালানির অধিক ব্যয়ে কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি। রাষ্ট্রসংঘের পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় ১৯৮০ মার্চ মাসে পৃথিবীর জনসংখ্যা যখন ৪৫০ কোটি, তখন বাৎসরিক বৃদ্ধি নয় কোটি, প্রতি মিনিটে ১৭২। ১৯৮১ সালের জনগণনায় ভারতের লোক সংখ্যা ছিল ৬৮ কোটি ৩০ লক্ষ, মাসিক বৃদ্ধি প্রায় ১০ লক্ষ। মার্কিন সরকারের এক সমীক্ষা অনুসারে ২000 খ্রীষ্টাব্দে ধরণী ৬৩৫ কোটি লোকের ভার বহন করবে, বর্ধিত জনতার ক্ষুধা মেটাতে অনাহারে ব্যাপক মৃত্যু রোধ করতে তার মধ্যে কৃষির উৎপাদন বাড়াতে হবে অন্তত দেড় গুণ। অধিকাংশ বৃদ্ধি ঘটবে এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার দরিদ্র দেশগুলিতে, কলকাতায় প্রায় দু কোটি, বম্বেতে দেড় কোটির বেশী লোক বাস করবে।

আমাদের কাহিনীর আরম্ভে লক্ষিত হয়েছে যে কৃষি আবিষ্কারের পর পেটের ভাবনা যখন কমল তখন মানুষ দ্রুত সংখ্যায় বাড়ল। পরবর্তী ইতিহাসেও একই ধারা দেখা গিয়েছে যখন নতুন আবিষ্কার উদভাবনে জীবন যাত্রা সহজ হয়েছে, যেমন বাষ্পচালিত যন্ত্রের উদভাবন ও কলে কাপড় তৈরি দিয়ে সূচিত শিল্প বিপ্লবের পর ইংল্যানডে ৫০ বছরে (১৮০১-৫১) জনসংখ্যা ১,৬৩,৪৫,৬৪৬ থেকে বেড়ে

হল ২,৭৪,৩৩,৭৫৫। পৃথিবীর লোকসংখ্যা যে যে সালে দ্বিগুণ হয়েছে তার থেকে সাম্প্রতিক কালে মানুষের দ্রুত বংশ বৃদ্ধি আরও স্পষ্ট হয়ে ঠেকে. খ্রীষ্টাব্দ এক থেকে শুরু করে এই সালগুলি হল ১৬০০, ১৮০০, ১৯০০, ১৯৬০ এবং ২০০০ (অনুমান)। অথবা, ১৮৫০ সালের সংখ্যা ১০০ কোটি দ্বিগুণিত হতে লেগেছে ৮০ বছর, কিন্তু তার সঙ্গে আরও ১০০ কোটি যোগ হল মাত্র ৩০ বছরে।

কয়েক বছর আগে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের এডোআর্ড ডীভি আদি মানব বা পূর্ববর্তী মানবোপম দ্বিপদ প্রাণী থেকে জনসংখ্যার হিসাব করেছেন এই রকম (দূরকালীন অনুমানগুলির নির্দেশ দিয়েছে ফসিল বা কবরের সংখ্যা, পরে অবশ্য আরও কিছু ফসিল আবিষ্কার হয়েছে):

২০,০০,০০০ বছর আগে	জনসংখ্যা ১ ২৫.০০০
(প্রাক্-হোমো ইরেকটাস)	
৩.০০,০০০ বছর আগে	১০,০০,০০০
(অন্তিম হোমো ইরেকটাস)	
২৭,০০০ বছর আগে	৩৩,৪০,০০০
(আধুনিক ক্রোমানীয় মানুষ)	
৮,০০০ বছর আগে	৮,৬৫,০০,০০০
(নবপ্রস্তর যুগ)	
১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ	৭২,৮০,০০,০০০
১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ	২৪০,০০,০০,০০০
২০০০ খ্রীষ্টাব্দ	৬২৭,০০,০০,০০০ (অনুমান)

সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে অবশ্য বেড়েছে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে মানুষের ঘনতা এবং তার আয়ু। নবপ্রস্তর যুগে আয়ু বৃদ্ধি আমরা আগে লক্ষ্য করেছি. সাম্প্রতিক কালে তা আরও ত্বরান্বিত হয়েছে। অনুমান করা হয় লক্ষ বছর আগে নেআনডার্টাল মানুষ গড়ে ২৯½ বছর বাঁচত, আজ উন্নত দেশগুলিতে লোকের আয়ু তার দ্বিগুণের বেশী। দীর্ঘতর জীবন কাম্য হলেও তা জনতার ভার বাড়ায়, কারণ জন্ম হার বৃদ্ধি ও মৃত্যু হার হ্রাসের একই পরিণাম। তা ছাড়া চিকিৎসা বিদ্যা ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে যেমন আয়ু বাড়ছে, তেমন জন্মগত রোগ দোষ টিকে থাকছে. বংশ পরম্পরায় হস্তান্তরিত হচ্ছে, উপরন্তু স্ত্রীলোকের গর্ভ ধারণের কাল বাড়ে।

সুতরাং বিজ্ঞানের প্রগতি এক দিকে যেমন সমস্যা মোচন করে, অন্য দিকে আবার সমস্যা বাড়াতে পারে। তা বলে চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতি, নতুন ওষুধের আবিষ্কার বা উৎপাদন শিল্পের অগ্রগতিকে আণবিক অস্ত্রের মত বিজ্ঞানের অপ-প্রয়োগ বলা চলে না। ভবিষ্যৎ সংকট উত্তীর্ণ হতে বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করতেই হবে, কিন্তু তার সঙ্গে অবশ্য প্রয়োজন আরও এক সহায় আরও এক শক্তি যাকে এক কথায় বলা যায় জ্ঞান—নতুবা মানুষের হীন প্রবৃত্তি ও অপরিণামদর্শিতা তার যে সব বিপদের সৃষ্টি করে তার থেকে নিস্তার নেই।

সভ্যতার দিকে দ্রুত আবিষ্কারের ধাপে ধাপে যে মহান অগ্রগতি হয়েছিল তার পরিণাম কি সভ্যতার সমাপ্তিতে তাই আজ বড় প্রশ্ন। মানব ইতিহাসের বহু লক্ষ বছরে এত বড় সংকট আর দেখা দিয়েছে কিনা সন্দেহ। এই সংকট উত্তীর্ণ হতে পারলে তবেই মানুষের মিছিল আরও এগিয়ে যাবে পৃথিবীর লীলা ক্ষেত্রে, আরও আশ্চর্য কীর্তি সাধন করবে শিল্পে বিজ্ঞানে দর্শনে, যার অঙ্কুর সেই আদিম তিমিরে প্রথম দেখা দিয়েছিল অন্ধবিশ্বাস আর কুহকে। নতুবা রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায়ের ডাক আসবে অকালে, তাকেও যেতে হবে ডাইনোসরদের পথে, কারণ আবহমানকালীন ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসে দেখা যায় নতুন অবস্থায় যে মানিয়ে নিতে পারে নি সেই তলিয়ে গিয়েছে অবলুপ্তির অন্ধকারে, তার প্রতি দয়া দাক্ষিণ্য করে নি প্রকৃতি। মানুষ তার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হলেও এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার দার্শনিক স্পিনোজার উক্তি: মানুষের সুবিধা অনুযায়ী এ জগৎ তৈরি হয় নি—যেমন আমাদের হাত পা তৈরি হয় নি মশার দংশনের জন্য, বা নাক সৃষ্টি হয় নি চশমা ধারণ করতে।

নির্দেশিকা

(প্রধান বিষয়গুলির প্রধান উল্লেখ ; দ্র.=দ্রষ্টব্য)

পরিভাষা

অণুশিলা microlith
অপবস্তু impurity
অস্থির কৃষি shifting cultivation
আঙ্গারিক গ্যাস carbon dioxide
উপজাতি tribe
উপপ্রজাতি subspecies
উপরত্ন semi-precious stone
উর্বর অর্ধবৃত্ত fertile crescent
কন্দ tuber
ক্যালসিদনি chalcedony, carnelian
কৃত্রিম নির্বাচন artificial selection
কৃত্রিম প্রজনন artificial breeding
খনন দণ্ড digging stick
গণ genus
ঘাঁটি site
চিত্রলিপি pictograph
জননী দেবী mother goddess,
 Venus
জামীরা amethyst
ধাতুমল slag
নবপ্রস্তর যুগ Neolithic Age
নীলা sapphire
পিতৃতন্ত্র patriarchy
পুরাপ্রস্তর যুগ Palaeolithic Age
প্রজনন breeding
প্রজাতি species
ফিরোজা tourquoise
বংশকণিকা gene
বাজরা millet
বিগলন smelting
বেলন cylinder
মধ্যপ্রস্তর যুগ Mesolithic Age
মরকত emerald
মরা সাগর Dead Sea
মাতৃতন্ত্র matriarchy
লাজাবর্দ lapis lazuli
লুপ্ত মোম lost wax
শঙ্কু cone
সংকর hybird
সংকরণ hybridization
সংকর ধাতু alloy
সংগ্রাহক gatherer
সন্ধিত fermented

ভ্রম সংশোধন

পৃষ্ঠা	পংক্তি	আছে	হবে
১২	৩	কারন	কারণ
২১	২৬	ভুট্রা	ভুট্টা
৪০	১৮	মতুন	নতুন
৬০	২৫	নাটুকীর	নাটুকীয়
১০০	১০	সাজিরে	সাজিয়ে
১০৪	১৭	পারে	পারে